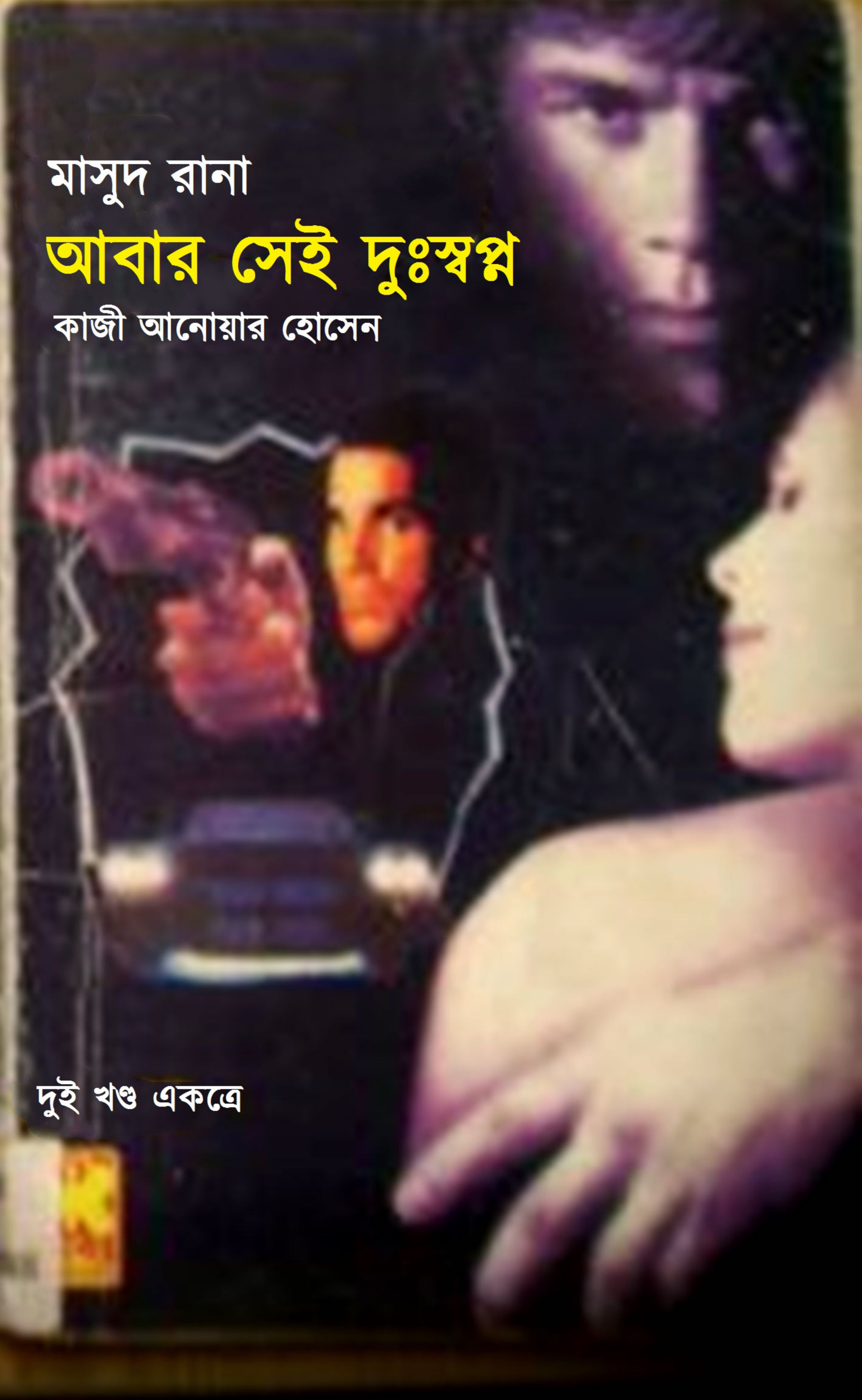
মাসুদ রানা
আবার সেই দুঃস্বপ্ন
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুই খণ্ড একত্রে

আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১

এক

বিস্তীর্ণ পতিতভূমির দূর কোনো প্রান্তে মেশিনগান গর্জে উঠলো। অকস্মাৎ এবং ভীতিকর; বিকেলের গরম রোদ, আর থমকে থাকা বাতাসের ভেতর কেমন ভোঁতা শোনালো আওয়াজটা। নিচে, খোলা পাথরখাদের ভেতর, নিস্তব্ধতা নামলো, স্থির হয়ে গেল কয়েদীদের হাত। খালি গা, ঘামে চকচক করছে, চোখে আগ্রহ আর প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

খাদের উত্তর পাঁচিল ঘেঁষে, ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাজ করছে রিড কোয়েন। তার চারপাশে প্রকাণ্ড সব স্লেট পাথর। দশ পাউণ্ড ওজনের হাতুড়িটা মাথার ওপর তুলে একটা পাথরের চিড়ে আটকানো ক্রো-বারের ওপর লক্ষ্য স্থির করলো সে, ঠিক তখুনি তার কানে ঢুকলো আওয়াজটা। ধীরে ধীরে মাথার ওপর থেকে হাতুড়িটা নামালো, চোখ চলে গেল দূর পাহাড়ের দিকে, কপালে একটা হাত তুলে আলো ঠেকালো।

লোকটা ছোটোখাটো, কিন্তু শক্তসমর্থ। বয়স হবে আঠাশ

কি ত্রিশ। শরীরের তুলনায় কাঁধ দুটো একটু বেশি চওড়া, মোটাসোটা হাতে পাকানো রশির মতো পেশী। মাথার চুল ঠিক কালো নয়, লালচে কালো, জুলফির কাছে অকালে সাদা হয়ে গেছে কয়েক গাছি। চোখ জোড়া তার চারপাশের পাথরের মতোই ঠাণ্ডা আর কঠিন। চেহারায় এই মুহূর্তে চাপা উত্তেজনার একটা ভাব রয়েছে। লাঞ্চের পর থেকে বিরতিহীন পাথর ভাঙছে সে। তার সঙ্গী, বাচ, একজন আইরিশ, চেহারায় গোঁয়ার-গোবিন্দ ভাব; দু'হাতে ধরা ক্রো-বারটা পাথরের চিড় থেকে অনায়াস ভঙ্গিতে বের করে নিলো, ধীরে ধীরে সিধে হলো। ঘাম চকচকে কপালে খাড়া রেখা ফুটলো তিনটে।

'ও কিসের আওয়াজ? কোত্থেকে এলো?'

'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা,' বললো কোয়েন। 'ফিল্ড আর্টিলারি।'

সঙ্গীর দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকালো বাচ। 'ঠাট্টা করছো?'

'গ্রীষ্মকালীন মহড়া—রুটিন। মহড়ার আয়োজন যদি দেখতে! ফি বছর এই সময়টায় সাজ সাজ রব পড়ে যায় আর্মিতে।'

দূরে, পাহাড়-চূড়া ছুঁই ছুঁই করে উড়ে গেল তিনটে ট্রান্সপোর্ট প্লেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো বাচ, কিন্তু প্লেনগুলোর পেট থেকে সাদা মতো কি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাজ্জব বনে গেল সে। প্রথমে মনে হলো পোঁটলা বা বস্তা হবে। তারপর ওগুলোর আকৃতি বদলালো। খুলে গেল প্যারাশ্যুট, প্রত্যেক-টার সাথে একজন করে সৈনিক। বিকেলের থমকানো বাতাসে ফুলে-ফেঁপে উঠলো প্যারাশ্যুট, রোদ লেগে ঝলসে উঠলো সাদা সিল্ক। নীল আকাশে, শূন্যে, ভাসছে লোকগুলো। স্বাধীন

আর মুক্ত ওরা। খাঁচায় বন্দী পাখির মতো করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো কয়েদীরা। স্বাধীনতা কি জিনিস, মুক্তি কাকে বলে, ওদের চোখে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো প্যারাট্রুপাররা। হঠাৎ তলপেটে একটা শূন্যতা অনুভব করলো বাচ, জোরালো একটা ঝাঁকির সাথে ক্রো-বারের হাতলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো সে।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো কোয়েন। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু তীক্ত হাসি। 'উপায় নেই, হে, উপায় নেই। পাঁচ মাইলও যেতে পারবে না।'

ক্রো-বারটা ছেড়ে দিলো বাচ। ঠকাস করে পাথরের ওপর পড়লো সেটা। তার ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। 'জানি,' নিচু গলায় বললো। 'তবু মন মানে না!'

'প্রথম পাঁচ বছর সত্যি কঠিন—স্রেফ নরকযন্ত্রণা,' বললো কোয়েন, নির্লিপ্ত চেহারা। বাচের দিকে তাকাচ্ছে না।

'আমার তো মনে হয়…,' থেমে গেল বাচ, পিছনে আলগা পাথরে পায়ের আওয়াজ। কাঁধের ওপর দিয়ে দ্রুত একবার পিছনটা দেখে নিলো সে। ক্রো-বারটা তোলার জন্যে ঝুঁকলো, ফিসফিস করে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করলো, 'সিলভার।'

বাচ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেও, কোয়েনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। পাহাড়ের আড়ালে এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে প্যারা-ট্রুপাররা, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে। মনে মনে হিসেব করলো, প্রায় চার মাইল দূরে নামছে ওরা। পায়ের

আওয়াজ ঠিক তার পিছনে থামলো।

দাপট দেখানো যাদের নেশা, প্রিজন অফিসার মাইক সিলভার তাদের একজন। সুদর্শন, দীর্ঘদেহী তরুণ, অল্প কিছুদিন হলো অফিসার হয়েছে। তার মুখে থমথমে গাম্ভীর্য, আর চোখে কঠিন দৃষ্টি, অল্প বয়েসী চেহারায় দুটোই বেমানান। এই গরমেও পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছে সে। কড়া মাড় দেয়া খাকি শার্টের সামনে আর দু'পাশে নানা আকৃতির ব্যাজ আর ফিতে, সামরিক একটা ভাব এনে দিয়েছে। একই রঙের ট্রাউজার আর ক্যাপ, ক্যাপটা একটু তেরছা করে পরেছে, প্রায় ঢাকা পড়ে আছে চোখ দুটো।

ওদের থেকে এক গজ দূরে থামলো সে। চকচকে রুলারটা কোনো কারণ ছাড়াই ঘন ঘন হাতবদল করছে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে ধাঁই করে কারো পিঠে বসিয়ে দেবে। 'অ্যাই, বদমাশ! হচ্ছেটা কি শুনি!' গা জ্বালানো কর্কশ কণ্ঠস্বর, মুখ-ভঙ্গি দেখে মনে হবে ভেংচাচ্ছে। 'বাপের টাকায় পিকনিক করতে এসেছো, অ্যা? কাজ ফেলে তামাশা দেখা হচ্ছে!'

যেমন ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলো কোয়েন, পিছন ফিরে তাকানো তো দূরের কথা এক চুল নড়লো না পর্যন্ত। আচমকা পাথর খাদের ভেতর জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো, সবাই যে যার কাজ থামিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। কোয়েনের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, সিলভার সেটা দেখতে পেলো না।

'শালা দেখছি তবু নড়ে না!' রাগে পাথরের ওপর পা ঠুকলো

সিলভার, রুলারটা বাগিয়ে ধরলো শক্ত করে। 'অ্যাই, কোয়েন, কানে পানি ঢুকেছে, নাকি দু'এক ঘা লাগবে?'

কথা বললো না, তবে নড়ে উঠলো কোয়েন। থো থো করে হাতের তালুতে থুথু ছিটালো সে, এক ঝটকায় মাথার ওপর তুললো হাতুড়ি, তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে ক্রো-বারের ওপর নামালো সেটা। স্লেট পাথরের বড়সড় টুকরোটা নিখুঁতভাবে দু'ভাগ হয়ে গেল। 'মন্দনয়, কি বলো, বাচ?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো সে। 'এসো, আরেকটা ভাঙি।' ভুলেও সে প্রিজন অফিসার সিলভারের দিকে তাকালো না, লোকটার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই।

আরো কয়েক সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সিলভার, রাগে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গট গট করে চলে গেল সে।

'তোমার কিন্তু সাবধান থাকা উচিত, কোয়েন,' নিচু গলায় বললো বাচ। 'ও শালা এক নম্বর হাড়ে-বজ্জাত। সুযোগ পেলে ও তোমাকে ছাড়বে না।'

হাসতে হাসতে কোয়েন বললো, 'সেই সুযোগটাই ওকে আমি দিতে চাই।' বাচের চেহারায় বিস্ময় এবং অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখলো সে, কিন্তু প্রসঙ্গটা নিয়ে আর কোনো কথা বললো না। মাথার ওপর আবার হাতুড়িটা তুললো, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলো ক্রো-বারের ওপর। অব্যর্থ লক্ষ্য, সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল স্লেট পাথর।

পাথরখাদ থেকে উঠে আসা রাস্তার মাথায় একটা ল্যাণ্ড-রোভা-রের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিন্সিপাল অফিসার ওয়েন ফোর-সাইথ। দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, পায়ের কাছে বসে আছে কালো একটা অ্যালসেশিয়ান। লম্বা এবং মোটা মানুষ, অবসর পাবার সময় ঘনিয়ে এলেও প্রাণ-চাঞ্চল্যে এতোটুকু ভাটা পড়েনি। জেল বিভাগে ত্রিশ বছর চাকরি করলেও প্রকৃতির দান কোমল ভাবটুকু আজও চেহারা থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। কয়েদীদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন বলে তাঁর সুনাম আছে, কিন্তু আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে নির্মম হতেও জানেন তিনি। গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে, চোখে গভীর অনু-সন্ধিৎসু দৃষ্টি। মানব চরিত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ রয়েছে তাঁর, প্রায় প্রত্যেককেই তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন।

সিগারেটে টান দিতে যাচ্ছিলেন, পাথরখাদ থেকে সিলভারকে উঠে আসতে দেখে হাতটা মুখের কাছে থেমে গেল। প্রিজন অফিসারের কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে আছে, প্রচণ্ড রাগে ফুলে আছে মুখ। সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফোরসাইথ। তিনি জানেন, কিছু লোক নিজেরাই নিজেদের বেঁচে থাকাটা যন্ত্রণাময় করে তোলে, সিলভার সম্ভবত তাদেরই একজন।

সিলভার কাছে আসতে তিনি জানতে চাইলেন, 'আবার কি হলো?'

'কোয়েন!' বাঁ হাতের তালুতে ঠাস করে রুলারের বাড়ি মারলো সিলভার। 'বজ্জাতটা শুধু শুধু আমাকে উত্তেজিত করছে!'

'কি রকম?'

'গার্ডস রেজিমেন্টে এ-ধরনের ব্যবহারকে আমরা মৌন অবহেলা বলতাম।'

প্রিন্সিপাল অফিসার নির্লিপ্ত। বললেন, 'ওটা তো একটা আমি চার্জ—এখানে খাটবে না।'

'খাটবে যে না সে আমিও জানি!' ল্যাণ্ড-রোভারের বনেটে হেলান দিলো সিলভার। তার বাঁ কপালের একটা রগ তিড়িক তিড়িক করে বার কয়েক লাফালো। 'কিন্তু এই বেয়াদবির শাস্তি যা হোক একটা কিছু থাকা দরকার। ডাকি, শোনে না। হুকুম করি, নড়ে না। অথচ সবাই ওকে এমন খাতির করে, আকাশ থেকে যেন অবতার নেমে এসেছেন। লাই পেয়ে মাথায় চড়ে গেছে লোকটা।'

'সে কথা যদি বলো, লোকে তাকে খাতির করবে না কেন?' প্রশ্ন করলেন ফোরসাইথ। 'কোয়েনই একমাত্র কয়েদী, কাজে কখনো ফাঁকি দেয় না। ভয়ানক রাগী মানুষ, কিন্তু কেউ না চটালে তার মতো মাটির মানুষ তুমি আর পাবে না। লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। শুধু কয়েদীরা নয়, সেপাইরা পর্যন্ত তাকে সমীহ করে—নিশ্চয় তার কারণ আছে।'

'কুখ্যাত একজন কয়েদী, তাকে সমীহ করতে হবে কেন? যার যা খুশি ভাবতে পারে, আমার দৃষ্টিতে সন্ত্রাদরের গুণ্ডা ছাড়া কিছু নয় সে।'

'সন্ত্রাদরের?' প্রিন্সিপাল অফিসার মৃদু শব্দে হাসলেন। 'কথাটা ঠিক বললে না। কতো টাকা ডাকাতি করেছিল, ভুলে গেছো? বিশ লাখ পাউণ্ড। একটা ডলারও উদ্ধার করা যায়নি।

আর যাই বলো, ওর দর কম ধরো না।'

'আপনারা শুধু অংকটাকেই বড় করে দেখেন,' ঝাঁঝের সাথে বললো সিলভার। 'বিশ লাখ পাউণ্ড, তাই না? তা, বিশ লাখ পাউণ্ড কোথায় নিয়ে এলো তাকে? পাঁচ বছর চোদ্দ শিকের ভেতর কাটিয়েছে, আরো পনেরো বছর কাটাতে হবে। সস্তা-দরের লোক বলেই তো এই হাল।'

'বেচারা কোয়েন!' নিঃশব্দে হাসলেন ফোরসাইথ। 'একটা মেয়েকে বড় বেশি বিশ্বাস করেছিল ও। ওটা বাদ দিলে, গোটা কাজটায় আর কোনো খুঁত ছিলো না। ডাকাতি করার সময় তো ধরা পড়েইনি, টাকাগুলো নিরাপদ জায়গায় সরাতেও পেরে-ছিল। মেয়েটা শুধু ওদেরকে ধরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু টাকার সন্ধান দিতে পারেনি।'

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হলো সিলভার। 'এবার আপনিও তার প্রশংসা শুরু করছেন, ফর গডস সেক!'

ফোরসাইথের মুখের হাসি দপ্‌ করে নিভে গেল। তাঁর চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো। কঠিন সুরে তিনি বললেন, 'তুমি ভুল করছো, সিলভার। কোয়েনের আমি প্রশংসা করছি না। তবে ওকে আমি বোঝার চেষ্টা করি, কারণ সেটা আমার দায়িত্বের একটা অংশ—তোমারও। কিন্তু তুমি ব্যাপারটা মনে রাখো না।' তরুণ প্রিজন অফিসার কিছু বলতে চেষ্টা করলেও, ফোরসাইথ একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। 'তিনটে বাজে। এখন চা। ওদের তুমি ডাকতে পারো, প্লিজ, মিঃ সিল-ভার।' কথাগুলো বলে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, কয়েক পা

এগোলেন, তাঁর ছায়াকে অনুসরণ করলো অ্যালসেশিয়ানটা।

তাঁর পিঠের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলো সিলভার। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সে। দু'এক মুহূর্ত পর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিতে পারলো, পকেট থেকে হুইসেল বের করে লম্বা একটা ফুঁ দিলো, তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠলো বাঁশি।

পাথরখাদের ভেতর হাতুড়িটা ফেলে দিলো কোয়েন। সিধে হলো বাচ।

'সময়ের আগে নয়,' বললো কোয়েন।

'হুইসেলের আওয়াজটা শুনলে?' গম্ভীর হলো বাচ। 'সিলভার আজ খেপে আছে।'

'বাদ দাও ওর কথা,' নরম সুরে বললো কোয়েন।

ভুরু কুঁচকে কোয়েনের দিকে তাকালো বাচ। কিন্তু কোয়েনের চেহারায় ভালো-মন্দ কোনো ভাব নেই। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো বাচ, ভাবলো, লোকটাকে বোঝা যায় না।

পাথরখাদের সব অংশ থেকে রাস্তার মাথায়, ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে উঠে এলো কয়েদীরা। একটা হাফ-টনী ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিলভার, ট্রাকের খোলা পাটাতনে প্রকাণ্ড একটা চায়ের কেটলি। এক ধারে স্তূপ করা রয়েছে টিনের মগ, কয়েদীরা এক এক করে এগিয়ে এসে একটা করে মগ তুলে নিলো, তারপর সিলভারের সামনে দাঁড়ালো। কেটলি কাত করে প্রত্যেকের মগে চা ঢাললো সিলভার। আরেকধারে দুয়জন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রিন্সিপাল

অফিসার ফোরসাইথ। নতুন একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। কুকুরটা পায়ের কাছে বসে রয়েছে।

নিজের মগ তোলার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো কোয়েন। দিগন্ত রেখার কাছে একজোড়া হেলিকপ্টার। ঘাড় বাঁকা করে সেদিকে তাকিয়ে থেকেই সিলভারের সামনে দাঁড়ালো সে। সিলভার তার মগে বেশি করে চা ঢেলে দিলো, ফলে উপচে পড়লো চা। আঙুলগুলোয় গরম চায়ের ছ্যাঁকা খেয়েও কিছু বললো না কোয়েন। নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে এসে বাচের পাশে দাঁড়ালো সে। শুনতে পেলো, প্রিন্সিপাল অফিসার বললেন, 'সাবধানে চা ঢালো, সিলভার।'

বাচও জোড়া হেলিকপ্টারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাশে কোয়েনের উপস্থিতি টের পেয়ে তিক্ত একটু হাসলো সে। বললো, 'কেমন হয়, ওগুলোর একটা যদি এখানে নেমে এসে আমাদেরকে তুলে নিয়ে যায়?'

দূর পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে আপনমনে মাথা নাড়লো কোয়েন। 'কপ্টার জোড়া এইমাত্র পাহাড় চূড়ার আড়ালে হারিয়ে গেছে। 'মিছে আশা, বাচ। ওরা আর্মি এয়ার কোর-এর লোক। আগাস্টা-বেল স্কাউট 'কপ্টার। জায়গাই হবে না, শুধু পাইলট আর একজন প্যাসেঞ্জার বসতে পারে। আমাদের নিতে হলে আরো বড় কিছু লাগবে।'

মগে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকালো বাচ।

'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইলো কোয়েন।

'চা, নাকি কেরোসিন? খেয়ে দেখো, বিচ্ছিরি একটা দুর্গন্ধ।'

কোয়েন কোনো উত্তর দিলো না। পাহাড়ের আড়াল থেকে আরো দুটো হেলিকপ্টার বেরিয়ে এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকলো সে। তারপর হঠাৎ, চোখ নামিয়ে ফোরসাইথের দিকে তাকালো। কয়েক গজ দূরে একজন অফিসারের সাথে কথা বলছেন তিনি।

'ক'টা বাজলো জানতে পারি, মিঃ ফোরসাইথ?' জিজ্ঞেস করলো কোয়েন।

'কোথাও যাবার কথা ভাবছো নাকি, রিড?' সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করলেন প্রিন্সিপাল অফিসার ফোরসাইথ, আশপাশের সবাই হেসে উঠলো, শুধু সিলভার বাদে।

'কেউ বলতে পারে না—যেতেও তো পারি।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন ফোরসাইথ। 'তিনটে পনেরো।'

'ধন্যবাদ,' বলে মাথা ঝাঁকালো কোয়েন। ডান হাতে ধরা টিনের মগটা চোখের সামনে তুললো সে, গভীর দৃষ্টিতে ভেতরে তাকিয়ে কি যেন দেখলো। তারপর ধীর পায়ে সিলভারের দিকে এগোলো।

কোয়েনকে এগিয়ে আসতে দেখে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালো সিলভার। একটা হাত বাড়িয়ে কেটলির পাশ থেকে তুলে নিলো চকচকে রুলারটা। বাঁ হাতের তালুতে মৃদু বাড়ি মারছে, বার-বার।

সিলভারের সামনে দাঁড়ালো কোয়েন, হাতের মগটা বাড়িয়ে দিলো সামনে। 'মগের ভেতর এটা কি জিনিস, দয়া করে আমা-

কে জানাবেন, মিঃ সিলভার, স্যার ?' নরম সুরে প্রশ্ন করলো সে।

তার পিছনে কথাবার্তার আওয়াজ থেমে গেল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ফোরসাইথ জানতে চাইলেন, 'এসব কি, কোয়েন ?'

সিলভারের চোখে চোখ রেখে জবাব দিলো কোয়েন, 'সহজ একটা প্রশ্ন, মিঃ ফোরসাইথ।' মগটা সিলভারের মুখের দিকে আরো একটু বাড়িয়ে ধরলো সে। 'আপনি কি খেয়ে দেখেছেন, মিঃ সিলভার, স্যার ?'

'এই চা কয়েদীরা খাবে,' গম্ভীর স্বরে জানালো সিলভার। 'অফিসাররা মুখে দেবে না।' তার রুলার ধরা হাতের আঙুল সাদা হয়ে গেছে।

'দিতে হবে,' শান্তভাবে বললো কোয়েন, তারপর মগের চা-টুকু ছুঁড়ে দিলো সিলভারের মুখ লক্ষ্য করে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে এক চুল নড়লো না কেউ। এক সেকেণ্ড কোনো আওয়াজ নেই। পরমুহূর্তে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। হিংস্র একটা আওয়াজ ছেড়ে কোয়েনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সিলভার, মোটা রুলারটা তার মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনলো সে। সরে না গিয়ে সিলভারের গা ঘেঁষে এলো কোয়েন, কুঁজো হলো, মাথা দিয়ে গুঁতো দিলো প্রিজন অফিসারের পেটে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল সিলভার, তার নেমে আসা মুখে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারলো কোয়েন।

ওদের পিছনে আর সব কয়েদীরা উত্তেজনায় ছুটফট করে উঠলো। কারো কথা বোঝা যাচ্ছে না, সবাই একযোগে চিৎকার

করছে। চারজন পুলিশ অফিসার লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো, চোখের পলকে কোয়েনকে মাটিতে পেড়ে ফেললো তারা। রুলার হাতে ছুটে গেল বাকি অফিসাররা, উত্তেজিত কয়েদীরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। মাটিতে পড়েও খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করলো কোয়েন। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো তাকে। সাথে সাথে হাত দুটো সামনে এনে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।

সঙ্গী অফিসাররা সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে সিলভার। নিজের চেষ্টায় উঠে বসেছে। কোয়েনের হাঁটুর সাথে ধাক্কা লাগায় ওপর-সারির একটা দাঁত হারিয়েছে সে। আর নাকটা ভেঙে গেছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে।

স্টীল চেইনের শেষ মাথায় ঘেউ ঘেউ করছে অ্যালসেশিয়ানটা, আরো পিছিয়ে দিচ্ছে কয়েদীদের। শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্যে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বারবার আদেশ করছেন প্রিন্সিপাল অফিসার ফোরসাইথ। তাঁর চেহারায় উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে আছেন। একটু পরই পরিবেশটা শান্ত হয়ে এলো। কোয়েনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন ফোরসাইথ। তাঁর মন খুঁতখুঁত করছে। চোখে দেখেও ঘটনাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন। কোয়েনের মতো চালাক চতুর কয়েদী এভাবে নিজের সর্বনাশ করবে না! নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো রহস্য আছে।

দৃঢ় ভঙ্গিতে কোয়েনের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। চাপা কণ্ঠে

বললেন, 'ইউ ব্লাডি ফুল! কি হারালে বুঝতে পারছো?'

চেহারায় কঠিন জেদ নিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকলো কোয়েন। 'আমাকে গাল দেবেন না, মিঃ ফোরসাইথ,' শান্ত সুরে বললো সে। পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে, চোখে পলক নেই।

'ছ'মাসের রেমিশন হারালে, কিন্তু কিসের বিনিময়ে, কোয়েন?' আবার জিজ্ঞেস করলেন ফোরসাইথ। কিন্তু কোয়েনের চোখের দৃষ্টি নড়লো না, আগের মতোই দূরে তাকিয়ে থাকলো সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিলভারের দিকে ফিরলেন প্রিন্সিপাল অফিসার। ল্যাণ্ড-রোভারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিলভার, রুমাল দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে। 'নাক ছাড়া আর কোথাও লেগেছে?'

ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভেতরটা দেখালো সিলভার। 'একটা দাঁত পড়ে গেছে।'

'গাড়ি চালাতে পারবে বলে মনে করো?'

মুখে রুমাল চেপে ধরে মাথা ঝাঁকালো সিলভার, ভোঁতা গলায় বললো, 'পারবো।'

অপর একজন অফিসারের দিকে ফিরলেন ফোরসাইথ: 'তোমাকে চার্জ দিয়ে যাচ্ছি, মিঃ গ্রাহাম। কোনো রকম হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করবো না। ফিরে এসে যেন ওদের গায়ে ঘাম দেখতে পাই।'

'ইয়েস, স্যার!' মাথা ঝাঁকালো গ্রাহাম। কয়েদীদের দিকে ফিরলো সে। হুংকার ছাড়লো, 'অ্যাটেনশন!'

সিধে হয়ে দাঁড়ালো কয়েদীরা।

'কুইক মার্চ!' মার্চ করে পাথরখাদের দিকে নেমে গেল কয়েদীরা।

হাত লম্বা করে কুকুরের চেইনে ঢিল দিলেন ফোরসাইথ, কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে কোয়েনের বুট শুঁকলো। ফোরসাইথ গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাহলে ফেরা যাক। সবুজ ল্যাণ্ড-রোভারে উঠে পড়ো। বোকার মতো কিছু করতে দেখলেই কুকুর লেলিয়ে দেবো, মনে থাকে যেন।'

কথা না বলে ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে এগোলো কোয়েন, মাটি শুঁকতে শুঁকতে তার পিছু নিলো অ্যালসেশিয়ান। গাড়িতে উঠে একটা বেঞ্চে বসলো কোয়েন। কয়েক মুহূর্ত পর ফোরসাইথ উঠলেন। পিছনের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ছোট্ট একটা জানালা দিয়ে ক্যাব-এর ভেতরটা দেখা যায়। মুহূর্তের জন্যে জানালায় সিলভারের মুখ দেখা গেল। বিষ মেশানো দৃষ্টিতে কোয়েনকে একবার দেখলো সে। তারপর ফোরসাইথের দিকে তাকালো। ফোরসাইথ মাথা ঝাঁকালেন। এক মুহূর্ত পর জ্যান্ত হয়ে উঠলো ইঞ্জিন। ল্যাণ্ড-রোভার চলতে শুরু করলো।

ঢালের ওপর দিয়ে রাস্তা, কখনো নেমে গেছে, কখনো উঠে গেছে। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো গাড়ি। কবাটের চিকণ ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছায়া দেখতে পেলেন ফোরসাইথ। তারমানে একটা পাহাড়কে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। চোখ ফিরিয়ে কোয়েনের দিকে তাকালেন তিনি। সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন। দুই ভুরুর মাঝখানে দুটো রেখা ফুটলো। 'এবার বলো

দেখি, কোয়েন, আসলে ব্যাপারটা কি ?'

ফোরসাইথকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলো কোয়েন। পাশের জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বিস্তীর্ণ পতিতভূমির দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। তার চেহারা শান্ত এবং নির্লিপ্ত। ফোরসাইথের মনে হলো, কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে কোয়েন।

'কোয়েন ?' আবার ডাকলেন ফোরসাইথ।

এবারও সাড়া দিলো না কোয়েন। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন ফোরসাইথ। মনে মনে বললেন, 'মরুকগে !'

দুই

ওদের পুবে কোথাও আবার. কড়াৎ কড়াৎ করে রাইফেল গর্জে উঠলো, তারপরই একনাগাড় জবাব শোনা গেল মেশিনগানের কট-কট, কট-কট-কট। পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ফোরসাইথ। দুই কি তিন মাইল দূরে লাল বেরেট পরা প্যারা-ট্রুপারদের দেখা গেল, একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে। দিগন্ত রেখার নিচ থেকে উঠে এলো আরেকটা হেলিকপ্টার, যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনে গলার ভেতর ঘরঘর আওয়াজ করলো অ্যাল-সেশিয়ানটা। সেটার পাঁজরে হাত বুলালেন ফোরসাইথ। 'ও কিছু না, বাছা, ও কিছু না।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো কোয়েন। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন ফোরসাইথ। কোয়েন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, আগের মতোই। তবে সামরিক বাহিনীর মহড়া সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু কিছুই যেন দেখছে না।

কুকুরটা শান্ত হলো। হঠাৎ পশ্চিম থেকে যান্ত্রিক গর্জন ভেসে এলো। কাছের একটা পাহাড় চূড়ার মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে এলো আরো একটা হেলিকপ্টার। দ্রুত বেগে রাস্তার ওপর চলে এলো সেটা, ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ল্যাণ্ড-রোভারের সাথে সাথে খানিকক্ষণ উড়লো সেটা। এতো কাছে যে 'কপ্টারের গায়ে লেখা সাদা অক্ষরগুলো পরিষ্কার পড়তে পারলেন ফোরসাইথ। হ্যাচ খোলা রয়েছে, বাইরের দিকে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে রয়েছে একজন সৈনিক, রোদ লেগে জ্বলজ্বল করছে তার সবুজ বেরেট।

'মনে হচ্ছে কমাণ্ডো,' মন্তব্য করলেন ফোরসাইথ।

তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে কোয়েন বললো, 'সিকি-মারটিন ট্রুপ ক্যারিয়ার। দশ জন লোক ছাড়াও ইকুইপমেন্ট বইতে পারে। এক সময় বোর্ণিওতে ব্যবহার করা হয়েছিলো ওগুলো।'

কমাণ্ডো হাত নাড়লো, ল্যাণ্ড-রোভারকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল হেলিকপ্টার। একটা ঢালের আড়ালে হারিয়ে গেল সেটা।

ঘাড় ফিরিয়ে কোয়েনের দিকে তাকালেন ফোরসাইথ। 'অনেক খবরই তুমি রাখো দেখছি।'

'গতমাসের গ্লোব ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে,' এখনো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কোয়েন। 'লাইব্রেরীতে আছে।'

আপনমনে মাথা নাড়লেন ফোরসাইথ। 'তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ, রিড। স্বীকার করছি, তোমাকে আমি বুঝতে পারি না।'

অপ্রত্যাশিতভাবে হাসলো কোয়েন। ফোরসাইথের দিকে তাকালো সে। ফোরসাইথের মনে হলো, হাসলে দশ বছর ছোটো দেখায় কোয়েনকে। 'আমার বাবাও ঠিক এই কথা বলতো,' কোয়েনের মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও নিজের কাছে দুর্বোধ্য।' ফোঁস করে আবার একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। 'এখন আর চরিত্র বিশ্লেষণ করে লাভ কি। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'তা ঠিক। অনেক দেরি হয়ে গেছে।' সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত ভরলেন ফোরসাইথ। ঢালের মাথায় উঠে এলো ল্যাণ্ড-রোভার। ঢালের দু'পাশে ঘন জঙ্গল, দ্রুত বেগে নামতে শুরু করলো গাড়ি। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন ফোরসাইথ। হঠাৎ বিস্ময়বোধক একটা শব্দ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। ফাঁকা একটা জায়গায় ল্যাণ্ড করেছে হেলিকপ্টারটা, জঙ্গলের কিনারায়। দু'জন কমাণ্ডোকে দেখা গেল, রাস্তার ওপর উঠে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যাব-এর জানালা খুলে গেল, মুহূর্তের জন্যে সিলভারের ফোলা মুখ দেখা গেল সেখানে। ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করলো সে, 'এর মানে কি, স্যার?'

'গড নোজ,' বললেন ফোরসাইথ। 'ওরা হয়তো আমাদের প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছে।'

ল্যাণ্ড রোভারের গতি কমিয়ে আনলো সিলভার। প্রায় থেমে গেল গাড়ি। তরুণ একজন কমাণ্ডো অফিসার সামনে এগিয়ে এলো। সঙ্গীদের মতোই, তার পরনেও কমব্যাট জ্যাকেট, ঘন

ক্যামোফ্লেজ ক্রিম মেখে থাকায় কালো হয়ে আছে মুখ।

গাড়ি পুরোপুরি থামতেই বাকি কমাণ্ডোরা ছুটে এলো। বলিষ্ঠ, কঠোর চেহারার লোক সবাই। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মেশিন পিস্তল, কোমরের কাছে ধরে আছে। ইউনিফর্মের বোতাম লাগানো পকেটগুলো বেঢপভাবে ফুলে আছে, ভেতরে গ্রেনেড।

ক্যাব-এর দরজা খুললো সিলভার, বাইরের দিকে ঝুঁকে বিরক্তির সাথে জানতে চাইলো, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

সামনে কি ঘটছে দেখতে পাচ্ছেন না ফোরসাইথ। শুধু শুনতে পেলেন সিলভার দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে উঠলো, অনেকটা গোঙানির মতো। তারপর ধস্তাধস্তির আওয়াজ। থ্যাচ করে বিশ্রী একটা শব্দ হলো, সম্ভবত সিলভারের ভাঙা নাকে মোক্ষম একটা ঘুসি পড়লো। তারপর নিস্তব্ধতা।

কাঁকর ছড়ানো রাস্তায় ভারি বুটের আওয়াজ, গাড়ির পাশ ঘুরে কে যেন এগিয়ে আসছে। পিছনের দরজার গায়ে, ছোট্ট জানালাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ফোরসাইথ। জানা-লার কাঁচ ঝন ঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল, তরুণ কমাণ্ডো অফি-সার উঁকি দিলো ভেতরে। 'বেরিয়ে এসো, খোকারা,' সহাস্যে, আদুরে গলায় বললো সে। 'তোমাদের রাস্তা এখানেই শেষ।'

ফোরসাইথ চট্ করে একবার কোয়েনের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের ওপর হাসলো কোয়েন। বিদ্যুৎ চমকের মতো ফোর-সাইথের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। গোটা ব্যাপারটাই, একেবারে প্রথম থেকে, একটা পরিকল্পনার অংশ। কোয়েনের উদ্ভট আচরণ তাঁকে বিস্মিত করলেও, ঘুণাক্ষরেও তিনি ভাবেননি

এ-ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ গর্জে উঠে ভাঙা জানালা লক্ষ্য করে লাফ দিলো অ্যালসেশিয়ান। জানালার মাঝখানে এক মুহূর্ত আটকে থাকলো কুকুরটা, গাড়ির মেঝেতে পিছনের পা ছুঁড়ে ফাঁকটা গলে বেরিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। হঠাৎ ওটার খুলি বিস্ফোরিত হলো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো রক্ত আর টুকরো হাড়—কেউ ওটার মাথায় গুলি করেছে।

বস্তার মতো ধপাস করে মেঝেতে পড়লো কুকুরটা, ভাঙা জানালায় আবার দেখা গেল তরুণ অফিসারের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। পয়েন্ট থারটি-এইট অটোমেটিকের ব্যারেল দিয়ে ডান গালটা চুলকাচ্ছে। 'আশা করি আর কোনো ঝামেলা করবে না, বুড়ো খোকা।' মিটি মিটি হাসলো সে। 'এমনিতেই সময়ের খুব অভাব।'

কোয়েনের দিকে ফিরলেন ফোরসাইথ। যতোটা না রেগেছেন তারচেয়ে বেশি আহত হয়েছেন তিনি। 'তুমি ভুল করছো, রিড। ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। মাঝখান থেকে শুধু শুধু দশ বছরের সাজা বাড়লো।'

'আয়োজনটা কেমন তাই বলুন,' উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কোয়েন। 'একেবারে নিখুঁত, তাই না? এবং রাজকীয়। আপনি ওদের দক্ষতার প্রশংসা করবেন, তা না...'

'এখনো হয়তো সময় আছে, রিড,' গম্ভীর সুরে বললেন ফোরসাইথ। 'তুমি যেতে না চাইলে তোমাকে ওরা নিশ্চয় জোর করে নিয়ে যাবে না। আমার কথা শোনো... ।'

সশব্দে হেসে উঠলো কোয়েন। তারপর বললো, 'আপনি আমার ভালো চান, সেজন্যে ধন্যবাদ, মিঃ ফোরসাইথ। কিন্তু ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, সেটাকে আর ফেরাবার সাধ্য আমার নেই। ইচ্ছেও নেই। নিরাপদ হেফাজতে বিশ লাখ পাউণ্ড পড়ে রয়েছে, তারপরও আমি কিভাবে জেলখানায় থাকতে পারি, বলুন?'

'তোমার বুঝি ধারণা, সত্যি তুমি পালাতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? সব দিক ভালো করে ভেবেই ঝুঁকিটা নিয়েছি।' কোয়েনের চেহারা থেকে হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল। 'আপনি বরং নিজের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা করুন, মিঃ ফোরসাইথ। এরা লোক কিন্তু ভয়ংকর।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন ফোরসাইথ। সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ঠিক আছে—নিজের মরণ ডেকে আনলে আমার কি করার আছে!'

'বুড়ো খোকা,' জানালা থেকে জানতে চাইলো তরুণ অফিসার, 'তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কতো ভাগ ফলে?'

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করলেন ফোরসাইথ। দরজার দিকে ঝুঁকে তালা খুললেন। দু'জোড়া হাত ভেতরে ঢুকলো, হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিচে নামানো হলো তাঁকে। পিছু পিছু নামলো কোয়েন।

গাড়ির পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, সিলভার, হাতকড়া পরানো হাত দুটো পিঠের ওপর।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রতিটি কাজে, সুশৃংখল সামরিক

দক্ষতার পরিচয় দিলো লোকগুলো। ওদের একজন কোয়েনের হাতকড়া খুলে ফোরসাইথের হাতে পরিয়ে দিলো, অপর একজন তাঁর মুখে তুলো ভরে সার্জিক্যাল টেপ লাগিয়ে দিলো। এরই মধ্যে অজ্ঞান দেহটাকে ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে তোলা হয়েছে। তারই পাশে ঠাঁই পেলেন প্রিন্সিপাল অফিসার। বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা, বাইরে থেকে চাবি ঘুরলো তালায়।

মরা কুকুরের রক্ত লাগলো ফোরসাইথের মুখে। গড়িয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছেন, এই সময় ল্যাণ্ড-রোভার চলতে শুরু করলো। বমিটাকে ঢোক গিলে গলা থেকে নামিয়ে দিলেন তিনি। ঝাঁকি খেয়ে টের পেলেন, রাস্তা থেকে নেমে এসেছে গাড়ি। মাথার ওপর পাশের জানালা, বাইরে গাছপালার মগডালগুলো দেখতে পেলেন। ঝোপ-ঝাড়ের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে ল্যাণ্ড-রোভার। সংঘর্ষের জন্যে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করলেন তিনি। ঢালের মাথা থেকে নিচে পড়বে গাড়ি, নাকি কোনো খাদের দিকে এগোচ্ছে?

আচমকা ব্রেক করলো ড্রাইভার। দেয়ালের সাথে ফোরসাইথের মাথা ঠুকে গেল। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার, ঘাম আর রক্তের গন্ধে তাঁর দম বন্ধ হয়ে এলো। কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে।

একটু পর তিনি উপলব্ধি করলেন, ভোঁ ভোঁ আওয়াজটা আসলে হেলিকপ্টারের। আবার ওটা টেক-অফ করছে। কুকুরটার পেটে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি, দেয়ালে হাত রেখে

বেঞ্চের ওপর উঠে বসলেন।

এরই মধ্যে হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেছে।

পনেরো মিনিট পর ত্রিশ মাইল দূরে নির্জন উপত্যকায় ল্যাণ্ড করলো হেলিকপ্টার। চারদিকে গভীর বন, মাঝখানে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা। প্রথমে তরুণ অফিসার, তারপর কোয়েন লাফ দিয়ে ঘাসের ওপর নামলো। ওরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই আবার আকাশে উঠলো হেলিকপ্টার, দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে চলে গেল সেটা।

চারদিক নিস্তব্ধ। মিটি মিটি হাসছে তরুণ অফিসার। কোয়েন ভাবলো, এটা একটা অসুখ নাকি? হাসিটা যেন কেউ ওর মুখে সেলাই করে দিয়েছে। এমন একটা হাসি, যার কোনো অর্থ করা যায় না। কখনো মনে হয়, সরলতার প্রকাশ। আবার কখনো মনে হয়, বেয়াদবি করছে।

কোয়েনকে খুঁটিয়ে দেখলো তরুণ অফিসার, পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

ডেনিম প্যাণ্ট আর সবুজ শার্ট পরেছে কোয়েন, কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা রাকস্যাক। এ-ধরনের পোশাক সাধারণত যারা পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়, সেই সব সৌখিন ভবঘুরেরা পরে। পাল্টা দৃষ্টি হেনে কোয়েনও তরুণ অফিসারকে খুঁটিয়ে দেখলো। লম্বা, একহারা স্বাস্থ্য, পরনে ধূসর রঙা ফ্লানেল স্যুট। ক্যামোফ্লেজ ক্রিম না থাকলে চেহারাটা কেমন দেখাবে কল্পনা

করার চেষ্টা করলো কোয়েন। মুখের আকৃতি একটু লম্বাটে, তীক্ষ্ণ চেহারা, অভিজাত একটা ভাব আছে। মিটি মিটি হাসিটা বলে দেয়, অনেক দিন আগেই জীবনটাকে একটা বাজে কৌতুক বলে ধরে নিয়েছে সে, এ জীবনকে গুরুত্বের সাথে নেয়ার যেন কোনো মানে হয় না।

কথা বলার সময় চেহারায় এবং কণ্ঠস্বরে খানিকটা কর্তৃত্বের ভাব আনার চেষ্টা করলো কোয়েন, 'কি রকম সময় পাবো আমরা ?'

তরুণ অফিসার কাঁধ ঝাঁকালো। 'ভাগ্য যদি ভালো হয়, এক ঘণ্টা। নির্ভর করছে পাথরখাদে ওরা প্রিন্সিপাল অফিসারের জন্যে কতোক্ষণ অপেক্ষা করবে তার ওপর। অফিসারের ফিরতে দেরি হলে ওরা খোঁজ নেবে···।'

'এক ঘণ্টা কি যথেষ্ট সময় ?'

'অবশ্যই। তবে এখানে যদি খোশ গল্পে মেতে থাকি···,' কথা শেষ না করে মিটি মিটি হাসতে লাগলো তরুণ অফিসার।

বলতে গেলে প্রায় অকারণেই, গা জ্বালা করে উঠলো কোয়েনের। মনের ভাব প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে আমি কি বলে ডাকবো ?'

'তোমার যা খুশি, বুড়ো খোকা,' বললো তরুণ অফিসার। 'জনি হলে কেমন হয় ? মন্দ নয়, কি বলো ? জনি, বেশ শ্রুতিমধুর, তাই না ? আমার অনেক দিনের ইচ্ছে কেউ আমাকে জনি বলে ডাকুক।'

'ভাবছি কাউন্ট তোমাকে যোগাড় করলো কোত্থেকে!'

'বুড়ো খোকা, সে-কথা শুনলে ভিরমি খাবে তুমি, সত্যি বলছি।' কি যেন স্মরণ করে মিটি মিটি হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, শুধু চোখ বাদে।

অন্য দিকে তাকিয়ে কোয়েন জানতে চাইলো, 'এখান থেকে কোথায় যাবো আমরা?'

'আমরা নই, তুমি,' বললো সে। 'তবে খানিকটা এগিয়ে দিই তোমাকে, এসো।'

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকলো ওরা, গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথ ধরে এগোলো। মিনিট পাঁচেক পর চওড়া মেটো পথে উঠে এলো দু'জন। দুশো গজ এগিয়ে থামলো তরুণ, রাস্তার পাশে একটা ঝর্ণা, ঝর্ণার পাশে একটা ওয়াটার-মিল দেখা গেল। আরো সামনে ভাঙা পাঁচিলের ভেতর মাঝারি একটা উঠন, উঠনের একধারে দাঁড়িয়ে আছে কালো একটা জোডিয়াক গাড়ি।

গাড়িটার দৈন্য দশা দেখে মুখ বাঁকালো কোয়েন। 'স্টার্ট দিলে নাট-বল্টু খুলে পড়বে না তো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাবো, বুড়ো খোকা,' সকৌতুকে বললো তরুণ।

গাড়িতে ওঠার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিলো তরুণ। উঁচু-নিচু পথ, বিষম ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলো কোয়েন। এঞ্জিনের

আওয়াজ সম্ভবত দশ মাইল দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে।

মেঠো পথ ছেড়ে সরু একটা পাকা রাস্তায় উঠে এলো গাড়ি। গিয়ার বদলে স্পীড বাড়িয়ে দিলো তরুণ। 'একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার,' বললো সে। 'এই গাড়িতে চল্লিশ মিনিটের মতো একসাথে থাকবো আমরা। কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যদি ঘটে, তোমাকে আমি লিফট দিচ্ছি—জীবনে কখনো দেখিনি, চিনি না। ঠিক আছে?'

'ঠিকাছে,' বললো কোয়েন। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

কোনো উত্তর নেই।

প্রশ্নটা আবার করলো কোয়েন।

'সব প্রশ্ন আমি আবার শুনতে পাই না,' বললো তরুণ। 'বিশেষ করে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না।'

'কি আশ্চর্য!' চটে উঠলো কোয়েন। 'কোথায় যাচ্ছি জানতে হবে না আমাকে?'

'অবশ্যই জানবে। ঠিক যখন সময় হবে। তার আগে কয়েকটা ব্যাপার ফয়সালা হওয়া দরকার।' সেই হাসি নিয়ে কোয়েনের দিকে তাকালো তরুণ।

এবার কোয়েনও মুচকি একটু হাসলো। 'ভাবছিলাম, প্রসঙ্গটা তুলতে তুমি দেরি করছো কেন।'

'ভুলে গেছি তা ভেবো না। এ-ধরনের প্রসঙ্গ কেউ কখনো ভোলে না। ঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম আর কি।'

'কি জানতে চাও, বলো।'

'পিটারফোর্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতিতে তোমরা চারজন ছিলে,'

বললো তরুণ। 'তোমার ভাগে বিশ লাখ পাউণ্ড পড়ে। টাকা-গুলো কোথায়?'

সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো কোয়েন, 'বলার পর আমার সাথে বেঈমানী করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কি?'

চোখ কপালে তুললো তরুণ। 'আমি হাসবো, না কাঁদবো? একদম বোকার মতো কথা বললে। আমাদের কাউণ্ট খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক একেবারে পছন্দ করেন না।'

'না, মানে…।'

কোয়েনকে থামিয়ে দিয়ে আবার বললো সে, 'আমরা আমাদের কথা রেখেছি, তাই না? তুমি এখন মুক্ত, স্বাধীন; তোমাকে আর জেলখানায় ফেরত যেতে হচ্ছে না। এবার তোমার পালা। টাকা কোথায় আছে বলো, তাহলেই অপারেশনের প্রথম পর্ব শেষ হবে। নগদ নারায়ণ হাতে এলেই শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব।'

'দ্বিতীয় পর্বে কি আমাকে দেশের বাইরে পৌঁছে দেয়া হবে?'

মাথা ঝাঁকালো তরুণ। 'সাথে নতুন কাগজ-পত্র থাকবে, আরো থাকবে অর্ধেক টাকা। পনেরো বছর জেল না খাটার বিনিময়ে দশ লাখ পাউণ্ড কম ফেরত পাচ্ছো তুমি। দশ লাখ পাউণ্ড, স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে তেমন কিছুই না। সমস্ত খরচ যখন আমাদের।'

'কিন্তু আমাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে না?' ভুরু কুঁচকে আবার জানতে চাইলো কোয়েন। 'অন্তত তোমাদের আয়োজন সম্পর্কে বলো আমাকে। কি করে বুঝবো, পুলিশ আমাকে ধরতে পারবে না?'

'তোমাকে তো আগেই জানানো হয়েছে, খেললে আমাদের নিয়মে খেলতে হবে,' বললো তরুণ। 'সময়ের আগে কিছুই তোমাকে আমি জানাতে পারি না। ইচ্ছে করলে,' মিটিমিটি হাসিটুকু তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, 'তুমি একা যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। তবে খুব বেশি দূর যেতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'সেটা একটা কথা বটে,' থমথমে মুখে বললো কোয়েন। 'ঠিকাছে। টাকাগুলো একটা স্টিমার ট্রাংকে আছে, নাইস ফার্ণিচার রিপজিটরি-তে, পিমলিকো-য়, মাইকেল হাইনম্যান-এর নামে।'

এই প্রথম তরুণের চেহারায় হাসি দেখা গেল না। 'বুড়ো খোকা, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছো!'

মুচকি হাসলো কোয়েন। 'আরে না! কোম্পানিটার বিশেষত্ব জানো না তাই এ-কথা বলছো। ওদের মক্কেল কারা জানো? যারা অনেক দিনের জন্যে সাগরে থাকে। আমি পাঁচ বছরের ফি অগ্রিম দিয়েছি। নির্দিষ্ট সময়ে যদি ট্রাংকটা না-ও নিয়ে আসা হয়, তবু ওটা নিরাপদে থাকবে। দশ বছর না পেরুলে ওটায় ওরা হাত দেবে না—সেটাই আইন।'

'মাই গড!' মিটিমিটি হাসিটা আবার তরুণের মুখে ফিরে এলো। 'জীবনে কতো কিছুই না দেখবো! তোমার কাছে রসিদ আছে?'

'রসিদ ছাড়া ডাল গলবে না।'

'কার কাছে আছে সেটা?'

'উহুঁ, কারো কাছে নেই। কেন্টিশ শহরে আমার মার বাড়ি। ওখানে আমার কিছু জিনিস-পত্র আছে, তার ভেতর একটা পুরনো স্যালভেশন আর্মি বাইবেল পাবে। বইটার মেরুদণ্ডে রসিদটা লুকানো আছে। খুশি?'

'আমি? আমার খুশি হওয়াতে বা অখুশি হওয়াতে কিছু যায় আসে? তথ্যটা আমি জায়গামতো পৌঁছে দেবো।'

'আর আমি? আমার কি হবে?'

'তোমার দায়িত্ব নেয়ার লোক আছে, বুড়ো খোকা। সব যদি ঠিকঠাক মতো ঘটে, ওরা তাহলে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে দেরি করবে না। তবে তার আগে কাউন্ট তোমার টাকার রঙ দেখতে চাইবেন।'

'আচ্ছা, এই কাউন্ট আসলে কে বলো তো?' নিচু গলায়, খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো কোয়েন। 'আমি চিনি এমন কেউ?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন স্বাস্থ্যকর নয়, বুড়ো খোকা,' আবার একবার তার চেহারা থেকে অদৃশ্য হলো হাসি। 'শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁর সাথে তোমার দেখা হবে, আবার না-ও হতে পারে। আমি আসলে জানি না।'

কিন্তু কোয়েন নাছোড়বান্দা। 'তুমি তাকে দেখেছো?'

উত্তর নেই।

'শুনেছি, উনি নাকি মিশরীয়,' বললো কোয়েন। 'আবার কেউ কেউ বলে, না, কাউন্ট আসলে ভারতীয় এক মহারাজা, রাজ্য হারিয়ে ছদ্ম-পরিচয় নিয়ে আছেন··· ।'

'গুজবে কান দিয়ো না,' বিড়বিড় করে বললো জনি।

'এখানে তো আর কেউ নেই, আমি কাউকে কিছু বলতেও যাচ্ছি না,' আবদারের সুরে বললো কোয়েন। 'আমার কৌতূহল ...।'

'অতি চালাকের গলায় দড়ি!'

এরপর একদম বোবা বনে গেল কোয়েন। বুঝে নিয়েছে, জনি মুখ খুলবে না।

পরবর্তী বিশ মিনিট চুপচাপ কাটলো। একটা তেমাথায় পৌঁছুলো গাড়ি। ব্রেক করলো জনি। নাট-বল্টুর খটাখট আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো জোডিয়াক। 'এখানেই তোমার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি, বুড়ো খোকা।'

তিনটে দিকই অনেক দূর পর্যন্ত, প্রায় মাইলখানেক, পরিষ্কার দেখা গেল। দু'পাশে উঁচু-নিচু, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পতিতভূমি, মাঝখানে সরু ফিতের মতো মসৃণ রাস্তা। তিন দিকের কোথাও প্রাণের কোনো ছায়া পর্যন্ত নেই। নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে উঠলো কোয়েনের। 'ছাড়াছাড়ি মানে? তুমি আমাকে একা ফেলে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ। কেন, তোমার ভয় করবে?'

'বাজে কথা বলো না!' ধমকে উঠলো কোয়েন। 'এরপর কি ঘটবে তাই বলো।'

'আরে-আরে, বুড়ো খোকা দেখি রেগে যায়!' মিটিমিটি হাসছে জনি। 'তিন রাস্তার মাথায় ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকো, যেন লিফট পাবার আশায় অপেক্ষা করছো। দশ মিনিটের মধ্যে

লিফট পাবে তুমি, দু'চার মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে। আমাদের লোক সাধারণত দেরি করে না, তবে গাড়ি আর রাস্তার কথা জোর করে কিছু বলা যায় কি?'

'কি গাড়ি নিয়ে আসবে সে?'

'তা তো জানি না।'

'যদি অন্য কারো গাড়ি আগে আসে? আমাকে যদি লিফট দিতে চায়?'

'যাহোক একটা কিছু বলে এড়িয়ে যাবে। প্রথমে জিজ্ঞেস করবে, কোন দিকে যাচ্ছেন? শোনার পর বলবে, না, আমি উল্টো দিকে যাবো।'

'তোমার লোককে আমি চিনবো কিভাবে?'

'তোমাকে দেখে গাড়ি থামাবে সে,' বললো জনি। 'তোমাকে বলবে, কোথায় যেতে চাও বলো তোমাকে আমি পৌঁছে দিই। তোমার উত্তর হবে—ব্যাবিলন।'

'ফর গডস সেক, এসব কি!' রেগে গেল কোয়েন। 'সিরিয়াস একটা ব্যাপারকে তোমরা··· ।'

'আমার কথা শেষ হয়নি,' মিটিমিটি হাসছে জনি।

'ব্যাপারটাকে তোমরা একটা ছেলেমানুষি খেলা ধরে নিয়েছো··· ।'

'নির্ভর করে তুমি কোন্ দৃষ্টিতে দেখছো তার ওপর। সে তোমাকে বলবে, ব্যাবিলন তার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাকে এগিয়ে দিতে পারে।'

'তারপর?' মুখ ব্যাজার করে জানতে চাইলো কোয়েন।

'তা তো জানি না।' ঝুঁকে গাড়ির দরজা খুলে দিলো জনি। 'বিদায়, বুড়ো খোকা। আমাদের দেখা না-ও হতে পারে। সহ-যোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। ভাগ্য তোমার সহায় হোক। ভুলে যেয়ো না, তাহলে লিফট পাবে না—ব্যাবিলন। গুডলাক।'

তিন

নিজেকে বোকা বোকা লাগলো কোয়েনের। নির্জন রাস্তার তেমাথায় মিনিট পাঁচেক হলো একাকী দাঁড়িয়ে আছে সে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, আমার হয়েছে সেই দশা, নিজেকে তিরস্কার করলো মনে মনে। জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে বলে দিলাম, কাজটা কি উচিত হয়েছে ? কাউন্টকে নাহয় বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তার লোককে কতোটুকু বিশ্বাস করা চলে ? জনি যদি তথ্যগুলো কাউন্টকে না জানায় ? সে নিজেই যদি পিমলিকো-য় গিয়ে রসিদটা উদ্ধার করে ? কি করে জানবে সে, জনি নিজেই টাকাটা মেরে দেয়ার তাল করেনি ?

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো কোয়েন। বারবার হাত-ঘড়ির ওপর চোখ বুলালো, হেলিকপ্টারে থাকতে জনি তাকে দিয়েছে এটা। এক ঘন্টা দশ মিনিট হয়েছে পালিয়েছে সে। এখন থেকে যে-কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, অথচ কপালে চিটচিটে ঘাম দেখা দিলো। হাতের উল্টো

পিঠটা কপালে ঘষলো সে।

সাত মিনিট হলো। কোথায় জনির লোক?

তিনটে রাস্তা যে-কোনো একটা দিয়ে আসতে পারে গাড়িটা। তিন দিকের শেষ মাথায় উঁচু পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কালো একটা মেঘে ঢাকা পড়লো সূর্য, শীতে হি হি করে উঠলো কোয়েন। পুলিশই যদি এসে পড়ে, কি করবে সে? জেলখানায় ফিরে যাবার চেয়ে লড়াই করে মরে যাওয়া ভালো। কিন্তু লড়াইটা করবে কি দিয়ে? জনির কাছ থেকে একটা পিস্তল চাইলে হতো। অবশ্য···দিতো বলে মনে হয় না।

মুশকিল হলো কি ধরনের গাড়ি নিয়ে আসবে লোকটা তাও জানা নেই। তাহলে অন্য কোনো গাড়ি আসতে দেখলে ঝোপের আড়ালে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়া যেতো।

পায়চারি থামিয়ে ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলো কোয়েন। গুমর ফাঁস করে দিয়ে এখন আর হায় হায় করে লাভ কি? জনিকে টাকার সন্ধান দেয়া মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। শর্ত দেয়া উচিত ছিলো, টাকার কথা আমি কাউন্টকে বলবো। কিন্তু জনি কি তা মেনে নিতো? মনে হয় না।

সত্যিই কি কেউ আসবে না? জনি তাকে ফাঁকি দিয়েছে?

হঠাৎ পুব দিক থেকে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এলো। প্রায় চমকে উঠলো কোয়েন। ঝট্ করে তাকাতেই যা দেখলো তাতে চোখ কপালে উঠে গেল তার। ইচ্ছে হলো দৌড়ে পালায়। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় নড়ার শক্তি পেলো না সে। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসছে একটা—গাড়ি নয়, ট্যাংকার।

একটা কথা মনে হতে পালাবার ইচ্ছেটা দূর হলো। পুলিশ ট্যাংকার নিয়ে আসবে না। প্রকাণ্ড আকারের ছয়টা চাকা, ট্যাংকারের গা উজ্জ্বল লাল রঙে রাঙানো। ঠিক ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা।

ক্যাব থেকে ঝুঁকে নিচে তাকালো ড্রাইভার। ষাটের কম নয় বয়স, মুখের ভাঁজগুলো যেন মাকড়সার জাল। ময়লা একটা ক্লাইং জ্যাকেট পরে আছে। সুতী ক্যাপ। গলায় মাফলার। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না। নিস্তব্ধতা ভাঙলো বুড়োই। তার কথার টান শুনে কোয়েনের মনে হলো, লোকটা বোধহয় স্কটল্যাণ্ডের। 'কোথায় যেতে চাও বলো তোমাকে আমি পৌঁছে দিই।'

পরম স্বস্তির পরশ অনুভব করলো কোয়েন, প্রায় পুলকের মতো। 'ব্যাবিলন।'

'ব্যাবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাকে আমি এগিয়ে দিতে পারি।'

মাথা ঝাঁকালো কোয়েন।

দরজা খুলে একটা লোহার মইয়ে পা রাখলো ড্রাইভার। ফিলিং পয়েণ্টটা ট্যাংকারের মাথায়, মই বেয়ে সেখানে ওঠা যায়। একপাশে একটা ইস্পাতের প্লেট, চৌকো, আকারে প্রায় দুই বর্গ ফিট, কালো রঙ করা। গোটা গোটা লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে: ডেঞ্জার—হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। প্লেটের গোড়ায় আঙুল বুলিয়ে লুকানো একটা বোতামের স্পর্শ নিলো সে, চাপ দিতেই সঁ্যাৎ করে খুলে গেল

ঢাকনি।

মই বেয়ে উঠে ভেতরে উঁকি দিলো কোয়েন। তিন ফিট চওড়া, আট ফিট লম্বা একটা কমপার্টমেন্ট, মেঝেতে মোটা একটা কম্বল বিছানো রয়েছে। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সে, জানতে চাইলো, 'কতোক্ষণ?'

'ছ'ঘণ্টা,' বললো ড্রাইভার। 'দুঃখিত, ভেতরে আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই। সিগারেটও খেতে পারবে না। তবে ফ্লাস্কে চা আছে, আর একটা টিনে কয়েকটা স্যাণ্ড-উইচ পাবে।'

'জানতে পারি, কোথায় যাবো আমরা?'

মাথা নাড়লো ড্রাইভার, থমথমে চেহারা। 'চুক্তির মধ্যে বলা আছে, তুমি আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না, আমিও তোমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবো না।'

কাঁধ ঝাঁকালো কোয়েন। 'বেশ, চলো কোথায় নিয়ে যাবে,' বলে হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে দিলো সে। ভেতরে ঢুকে মুখ তুলে আলোর দিকে তাকাতে যাবে, ঘটাং আওয়াজের সাথে প্লেটটা জায়গামতো বসলো, গাঢ় অন্ধকারে কোয়েনের মনে ভয় ধরে গেল।

অনেক কষ্টে গলায় উঠে আসা চিৎকারটা থামালো সে। বারবার ঢোক গিলেও শুকনো খসখসে ভাবটা রয়ে গেল গলায়। নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। একটু পরই গড়াতে শুরু করলো ট্যাংকার, ভয়ের অনুভূতিটা ধীরে ধীরে ছেড়ে গেল তাকে। কম্বলের ওপর শুলো সে, হাত দুটোকে বালিশ বানালো। শরীরটা দোল খেতে শুরু করলো। চোখ বুঁজে এলো। একটু পর

ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ঠিক ওই সময়, মাইল দশেক দূরে, জনি নামের সেই লোকটা হঠাৎ ব্রেক কষে মেইন রোডের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো। রাস্তার পাশেই গ্রাম, তার আসার পথে এটাই প্রথম।

গাড়িতে বসে গ্রামটাকে ভালো করে দেখে নিলো সে। ছোটো গ্রাম, প্রায় ফাঁকা রাস্তা। দু'একজন লোক কাজ থেকে ফিরছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রামের সরু পথে নামলো সে। খানিক দূর যেতেই পাবলিক টেলিফোন বুদ চোখে পড়লো। গাড়ি থামালো সে, কোনো দিকে না তাকিয়ে বুদে ঢুকলো। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে লণ্ডনের একটা নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিলো একটি মেয়ে। নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। 'ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট লিমিটেড।'

'রবার্ট পিয়ারসন, ওয়েস্ট কান্ট্রি থেকে বলছি।'

গলার স্বর একই রকম থাকলো। 'খুশি হলাম তুমি যোগাযোগ করলে। ওদিকের খবর সব ভালো তো?'

'এর বেশি ভালো কিছু হতে পারে না। আমাদের মক্কেল তার পথে রওনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে খবরে কিছু বললো?'

'না, একদম চুপ।'

'ঝড়ের আগে থমথমে ভাব। নগদ নারায়ণের সবটুকুই তুমি নাইস ফর্ণিচার রিপজিটরিতে পাবে, একটা স্টিমার ট্রাংকে। ওটা পিমলিকো-য়। ট্রাংকটা মাইকেল হাইনম্যানের নামে আছে।'

'রসিদ ?'

জনি ওরফে রবার্ট পিয়ারসন মিটিমিটি হাসছে। 'কেন্টিশ টাউনে ওর মার বাড়ি। ওর জিনিস-পত্রের মধ্যে পুরনো একটা স্যালভেশন আর্মি বাইবেল আছে, রসিদটা ওটার মেরুদণ্ডে পাবে।'

'তারমানে···।'

'হ্যাঁ,' কথা কেড়ে নিয়ে জনি বললো, 'তারমানে সুন্দরী একজন ওয়েলফেয়ার অফিসার বুড়ি মার কাছ থেকে অনায়াসে ওটা আদায় করে আনতে পারবে।'

'ভাবছি কাজটা আমি নিজেই করবো।'

'তুমি সুন্দরী এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলছো।'

'এবং আমার দাবি তুমি অস্বীকার করছো না।'

হাসিটা জনির সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, শুধু চোখ বাদে। 'সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। এরইমধ্যে প্রায় পাঁচটা বাজে। ফার্ণিচার রিপজিটরি সম্ভবত ছ'টায় বন্ধ হয়ে যাবে। বুদ্ধিমতীর কাজ হবে তুমি যদি রওনা হবার আগে ওদেরকে একটা টেলিফোন করো। তোমার জন্যে তাহলে খোলা থাকবে ওরা।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও। খুব ভালো হয়েছে তোমার কাজ। উনি খুশি হবেন।'

'তাঁর খুশিতেই আমার খুশি, বুড়ি মেয়ে।' রিসিভার রেখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো জনি, চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, যেন বহুদূরে তাকিয়ে আছে। 'সুন্দরী, যদি জানতে তোমাকে নিয়ে কি করতে চাই আমি!' মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করলো সে। বুদ

থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো। হাত দুটো নিশপিশ করছে, যেন কারো গলা টিপে ধরতে চায়। কি যেন কল্পনা করে তার সারা শরীরে পুলক খেলে গেল। ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসিটা এখন কেউ যদি দেখে আঁতকে উঠবে সে। কারো চেহারায় এমন উজ্জ্বল আর নগ্ন নিষ্ঠুর ভাব ফুটতে পারে, না দেখলে ভাবা যায় না।

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙলো কোয়েনের। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো সে, আন্দাজ করার চেষ্টা করলো কোথায় রয়েছে। তারপর ঝট্ করে সব মনে পড়ে গেল। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুললো সে। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলালো। সোয়া দশটা বাজে, তারমানে পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি গাড়িতে রয়েছে ওরা। কোথাও নিশ্চয় পৌঁছুবে সে, তার বোধ-হয় খুব বেশি দেরিও নেই। হাতের ওপর মাথা দিয়ে আবার শুলো সে। কতো কি চিন্তা এসে ভিড় জমালো মনে।

বিশেষ করে একটা চিন্তা বারবার ফিরে এলো। কিভাবে জীবন কাটাবে সে। কোথায়।

রোদ ঝলমলে সুন্দর একটা জায়গা, অবশ্যই সৈকত থাকতে হবে। একটা ছোটো, একটা বড়, দুটো গাড়ি থাকবে তার। আর থাকবে একটা বোট। সেখানে সব মেয়েরাই সুন্দরী আর মিশুক।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলো কোয়েন। ড্রাই-ভার ব্রেক করছে, ধীরে ধীরে ট্যাংকারের গতি কমে আসছে। থামলো, কিন্তু এঞ্জিন বন্ধ হলো না। হ্যাচটা খুলে গেল, ফাঁকে

ড্রাইভারের মুখ। রাতের আকাশের গায়ে ম্লান একটা মুখোশ। 'বেরিয়ে এসো।'

একেবারে সেই দিগন্তরেখা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তারাগুলো, তবে আকাশের কোথাও চাঁদ নেই। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়েচেড়ে আড়ষ্ট ভাব দূর করলো কোয়েন। হ্যাচ বন্ধ করে ক্যাবে ফিরে এলো ড্রাইভার। ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালো।

স্থির হয়ে গেল কোয়েন। 'এরপর?'

'রাস্তা পেরিয়ে খানিকদূর গেলে সরু একটা পায়ে চলা পথ পাবেন,' বললো ড্রাইভার। 'পথটা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। পথের মোড়ে অপেক্ষা করুন। আপনাকে তুলে নেয়া হবে।'

কোয়েন কিছু বলার আগেই ক্যাবের দরজা বন্ধ করে দিলো ড্রাইভার। হিস করে তীব্র একটা আওয়াজের সাথে রিলিজ হলো ব্রেক, অন্ধকারে গড়াতে শুরু করলো ছ'টা চাকা। বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো কোয়েন, ট্যাংকারের টেইল লাইট ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। বহুদূর···শেষ প্রান্তে এক সময় হারিয়ে গেল লাল আলো। রাকস্যাকটা তুলে নিয়ে রাস্তা পেরুলো সে।

আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলছে কোয়েন। ভালো লোকদের পাল্লায় পড়া গেছে। তবে ঘাবড়াবার তেমন কিছু নেই, এদের আয়োজন হাস্যকর হলেও, তাতে কাজ উদ্ধার হয়। এভাবে ভালোয় ভালোয় দেশের বাইরে চলে যেতে পারলে আর চিন্তা কি।

মেটো পথটা পেতে কোনো অসুবিধা হলো না। আঁকাবাঁকা পথ, হুশো গজের মতো হেঁটে এসে মোড়ে থামলো সে। সরু পথটা চওড়া পথে মিশেছে। দু'দিকে তাকিয়ে খুব বেশি দূর দেখা গেল না, কোনো দিকেই আলো নেই। তবু অন্ধকারের ভেতর চোখ জ্বালার চেষ্টা করলো কোয়েন। আওয়াজটা শুনে এমন ভয় পেলো, আঁতকে উঠে প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো।

'কোথায় যেতে চাও বলো, তোমাকে আমি পৌঁছে দিই।'

মিষ্টি, মেয়েলি কণ্ঠ। ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো কোয়েন। ইচ্ছে হলো বলে, খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, কিন্তু বললো না। 'ব্যাবিলন।' আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে।

'ব্যাবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাকে আমি এগিয়ে দিতে পারি।'

মেয়েটা কাছে সরে এলো, তারার আলোয় এবার তার কাঠামো দেখতে পেলো কোয়েন। দেখা দেয়ার জন্যেই কাছে এসেছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো মেয়েটা। তাড়াতাড়ি পিছু নিলো কোয়েন, যেন হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। ওদের পায়ের চাপে মুট মুট আওয়াজ করছে কাঁকর। পাঁচ ঘণ্টা ঘুমালেও ক্লান্তি বোধ করলো কোয়েন। শরীরের আর দোষ কি, সারাটা দিন ধকল তো আর কম যায়নি। কল্পনার চোখে সুস্বাদ খাবারদাবার আর নরম একটা বিছানা দেখতে পেলো সে। আর পাশে যদি একটা মে···

আচ্ছা, এই মেয়েটা দেখতে কেমন? বয়স কতো?

'একটু দাঁড়াবে ?'

মেয়েটা কিন্তু থামলো না। 'কেন ?'

'সিগারেট ধরাবো।'

'উচিত হবে না।'

কেন উচিত হবে না তা আর জিজ্ঞেস করলো না কোয়েন। মনে মনে ভাবলো, আলোর মধ্যে যাই চলো, দেখবো কেমন তুমি।

সারাক্ষণ ঢাল বেয়ে উঠলো ওরা। প্রায় আধ মাইল পেরিয়ে এসে কোয়েন টের পেলো, ওদের দু'ধারেই পাহাড়। হুল ফোটানো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শীতে একটু একটু কাঁপছে সে। বাঁক নিয়ে পাহাড়ের কাঁধে পৌঁছুলো পথটা, নিচের খাদে একটা ঝর্ণা, পাশে ফার্মহাউসটাকে আবছামতো দেখা গেল, নিচের তলার একটা জানালায় আলো জ্বলছে।

ঠেলা দিয়ে গেট খুললো মেয়েটা, দূরে কোথাও একটা কুকুর ফাঁপা গলায় ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। পুরনো লোহার গেট, বন্ধ করার জন্যে ভেতর দিকে পাঁচটা মোটা বার রয়েছে। উঠনের ওপর দিয়ে পথ দেখিয়ে এগোলো সে।

সামনের দরজার কাছাকাছি পৌঁচেছে ওরা, বিস্ফোরিত হলো কবাট। পিছনে আলো নিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ালো এক লোক, হাতে একটা শটগান। 'ওকে নিয়ে এসেছো তাহলে, রোয়েনা ? সব ঠিক আছে তো ?'

মেয়েটা শুধু মাথা ঝাঁকালো, কথা বললো না। এক চিলতে আলোয় তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল কোয়েন। এতো কম

বয়স, টেনেটুনে আঠারো কি উনিশ হবে। অথচ এই বয়সেই চোখের নিচে কালি, মুখটা শুকনো, দৃষ্টিতে রাজ্যের বিষাদ। মেয়েটা হাসতে জানে কিনা সন্দেহ হলো কোয়েনের। মুখের দু'পাশে হাড়গুলো বেঢপভাবে ঠেলে বেরিয়ে আছে, কদর্য একটা ভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। কিন্তু ময়লা কোটে উথলানো যৌবন ঢাকা পড়েনি। পাঁচ বছর কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি, কোয়েনের সারা শরীরে রক্তের বান ডাকলো। ঘন ঘন ঢোক গিললো সে।

সম্বিত ফিরলো মেয়েটার কথায়। লোকটাকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কোনো কাজ আছে আমার?' নিষ্প্রভ, বেসুরো কণ্ঠ।

'না, লক্ষ্মী সোনা, না। যাও, মায়ের বিছানায় গিয়ে আরাম করো। তোমার মা তোমাকে খুঁজছিলো।'

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল রোয়েনা। দেয়ালের গায়ে শটগানটা ঠেস দিয়ে রেখে সামনে এগোলো লোকটা, ডান হাত বাড়িয়ে দিলো। 'আপনাকে মেহমান হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি, মিঃ কোয়েন। আমি হোফার টুইড।'

'আমি কে আপনি তাহলে জানেন?'

'রেডিও তো সারারাত ধরে আপনার গানই গাইছে।'

'আমি কোথায় ওদের জানার কোনো সম্ভাবনা আছে?' জিজ্ঞেস করলো কোয়েন।

খিক খিক করে হাসলো হোফার টুইড। চল্লিশের মতো বয়স হবে, রোগা-পাতলা, নড়াচড়ার মধ্যে অদ্ভুত দ্রুত একটা গতি

আছে। 'রওনা হবার পর সাড়ে তিনশো মাইল দূরে চলে এসে-ছেন আপনি, মিঃ কোয়েন। আর যেখানেই খুঁজুক, এখানে কেউ আপনাকে খুঁজবে না।'

'আপনার কথায় স্বস্তি পেলাম,' বললো কোয়েন। 'এখন কি ঘটবে ? কখন শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব ?'

'এক ঘণ্টাও হয়নি লণ্ডন থেকে ফোন এসেছিল। সব কিছুই ঠিকঠাক মতো ঘটছে। কর্তৃপক্ষ আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।' ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালো হোফার টুইড। 'ডুগান—হঠাৎ গেলে কোথায়, ডুগান ? এসো, চেহারাটা দেখাও একবার।'

উঠন থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো লোকটা, দেখার মতোই একখানা চেহারা বটে। কম করেও ছয় ফিট চার ইঞ্চি লম্বা হবে, হাতির মতো পা, বন মানুষের মতো হাত। এই মুখ কোনো গরিলার কাঁধে বসিয়ে দিলেও মানিয়ে যাবে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয় না, অনেকটা যেন আধপাগলা গোছের। কোনো কারণ ছাড়াই হাঁ করে হাসছে, মুখের কোণ থেকে মোটা সুতোর মতো লালা ঝরছে বুকে। হোফার টুইডের ঠিক পাশে নয়, একটু সামনে দাঁড়ালো সে, টুইড তার কাঁধ চাপড়ে দিলো। আদর পেয়ে ঔক ঔক করে দুর্বোধ্য আওয়াজ করলো সে।

'লক্ষ্মী ছেলে, ডুগান। যা বলি তাই শোনে। চলো, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। কাজটা শেষ করা দরকার।' কোয়েনের দিকে ফিরে হাসলো হোফার টুইড। 'কি করতে হবে ও জানে। এদিক

দিয়ে, মিঃ কোয়েন।'

উঠনের ওপর দিয়ে পথ দেখিয়ে এগোলো টুইড। মাঝখানে পড়ে গেল কোয়েন। পিছনে থাকলো ডুগান। অন্ধকার উঠন. একটা ছোটো গেটের সামনে থামলো টুইড। ঘটাং ঘটাং আও-য়াজের সাথে খুলে গেল সেটা। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে কোয়েন দেখলো, ছোটো একটা উঠনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। প্রায় ফাঁকাই বলা চলে, শুধু মাঝখানে একটা কুয়া রয়েছে, নিচু পাঁচিল দিয়ে গোল করে ঘেরা। ফিট তিনেক উঁচু হবে পাঁচিলটা।

অস্থিরভাবে এক পা সামনে এগিয়ে কোয়েন জানতে চাইলো, 'এখানে কি?'

গেটের পাশ থেকে আগেই ভারি শাবলটা তুলে নিয়েছে ডুগান। সেটা মাথার ওপর তুলে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। কোয়েনের প্রশ্নের জবাবে শাবলটা সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘাড়ের ওপর নামিয়ে আনলো। পচা পাটখড়ির মতো মট করে ভেঙে গেল কোয়েনের শিরদাঁড়া।

উঠনে পড়ে কোয়েনের শরীর মোচড় খেতে লাগলো। জুতোর ডগা দিয়ে তার পেটে আর পাঁজরে খোঁচা মারলো টুইড, অনেকটা কাতুকুতু দেয়ার ভঙ্গিতে। কাতর শরীরের এই মোচড় খাওয়া উপভোগ করছে সে, খোঁচা মারার কারণ হলো হঠাৎ যেন থেমে না যায়।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বের করলো ডুগান।

'ও, তর সইছে না।' আদুরে গলায় বললো টুইড। 'দাও

তাহলে ফেলে।'

কুয়ার মুখ থেকে নিচে নামার সময়ও বেঁচে রয়েছে কোয়েন। ইটের দেয়ালে দু'বার ধাক্কা খেলো সে, কিন্তু কোনো ব্যথা অনুভব করলো না। আশ্চর্যই বলতে হবে, তার শেষ সচেতন চিন্তাটা ছিলো, ফোরসাইথ ঠিকই বলেছিলেন—নিজের মরণ ডেকে আনলে আমার কি করার আছে। এমন একটা ভুল যা সংশোধন করার সুযোগ মেলে না। ঠাণ্ডা হিম পানি গ্রাস করলো তাকে। নাই হয়ে গেল দুনিয়া।

চার

দুপুরের হুইসেল বাজতেই রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রি থেকে পিল-পিল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো শ্রমিকরা। মেইন গেটের উল্টোদিকের কাফেতে বসে কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও কাপটা নামিয়ে রাখলো মাসুদ রানা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে বগলদাবা করে অলস পায়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঠিক এই সময়টার অপেক্ষাতেই ছিলো ও।

–রাস্তা পেরোবার সময় পিছন দিকে তাকালো একবার। না, কাফে থেকে আর কেউ বেরোয়নি। টেলিফোন বুদেও ঢোকেনি কেউ। লণ্ডনের এই মিল-কারখানা এলাকায় উপমহাদেশের প্রচুর লোক কাজ করে, কাজেই ওকে দেখে কারো মনে কোনো রকম সন্দেহ না হবারই কথা।

রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রির প্রধান ফটকে একটা সুইংবার রয়েছে। কোনো গাড়ি মিল থেকে বাইরে বেরুবার আগে ইউনিফর্ম পরা গার্ডরা সেটাকে চেক করে, তারপর বার সরানো হয়।

ফটকের পাশেই ছোটো একটা গেট, সেটাই ব্যবহার করে শ্রমিক আর কর্মচারীরা। গেটটা সরু, ফলে বিরতিহীন মিছিলটা বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে আসছে বাইরে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি চলছে, তারই সাথে চলছে হাস্য-কৌতুক।

জনসমুদ্রে ঢুকে গিয়ে স্রোতের উল্টো দিকে এগোলো রানা, আশপাশে হুবহু একই পোশাক পরা বহু লোক কিলবিল করছে—খয়েরি ওভারঅল আর সুতী ক্যাপ। গেটের কাছে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে গায়ের জোর খাটাতে হলো, দু'একজনকে কনুই দিয়ে গুঁতোও মারতে হলো। তবে হাড়ে হাড়ে টের পেলো, কনুই চালানো ইংরেজদের কাছ থেকে শিখতে হবে বাঙালীদের। বঙ্গসন্তান হিসেবে রানা অবশ্য দুর্লভ একটা গুণের পরিচয় দিলো—সারা শরীরে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ব্যথা নিয়েও মুখে অম্লান হাসি ফুটিয়ে রাখলো।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার পর যুদ্ধজয়ের আনন্দ অনুভব করলো রানা। ভেতরেও প্রচুর লোকজন, তবে টিন-ভর্তি মুড়ির মতো নয়। বাঁ দিকে গেট হাউস, পাশ কাটাবার সময় চট্ করে জানালা দিয়ে ভেতরটা দেখে নিলো ও। টেবিলের সামনে তিনজন ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ড, তাদের সামনে স্যাণ্ডউইচ আর কফি, এক কোণে আধ হাত জিভ বের করে বসে রয়েছে একটা অ্যালসেশিয়ান।

লোকজন ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগোচ্ছে, উঠন পেরিয়ে মেইন ব্লক-এ ঢুকে পড়লো রানা, সেখান থেকে চলে এলো বেসমেন্ট গ্যারেজে। কাল রাতে বিল্ডিংটার প্ল্যান দেখার সুযোগ

হয়েছিলো ওর। গোটা লে-আউট মনে গেঁথে আছে, চোখ বুজে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

আশপাশে এখনো জনা কয়েক মেকানিক ঘুর ঘুর করছে, তাদের গ্রাহ্য না করে র‍্যাম্প বেয়ে উঠলো রানা, লোডিং বে-তে পার্ক করা অপেক্ষারত যানবাহনগুলোর পিছন দিক ঘুরে সার্ভিস লিফটের কাছে চলে এলো। বোতাম টিপে দাঁড়িয়ে থাকলো, আশপাশে কাউকে দেখলো না। লিফট নামলো।

চারতালায় উঠলো রানা। লিফট থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ও। চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। স্বাভাবিক, শান্ত ভাবে করিডর ধরে এগোলো ও। ওয়েজ অফিসের দরজায় 'প্রাইভেট' লেখা রয়েছে, করিডরের শেষ মাথা পর্যন্ত আরো দুটো দরজা দেখা গেল। বন্ধ ওয়েজ অফিসকে পাশ কাটালো রানা, বাঁক নিয়ে ফায়ার এগজিট লেখা দরজাটা খুলে ফেললো। কংক্রিটের সিঁড়ি অন্ধকার কুয়ার ভেতর নেমে গেছে, ওর বাঁ পাশের দেয়ালে সার সার ফিউজ বক্স।

প্রতিটি বক্সের গায়ে সাদা রঙ দিয়ে নম্বর লেখা। দশ নম্বরের হাতল ধরে টানলো ও, অফ পজিশনে এনে ছেড়ে দিলো। দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো করিডরে।

ওয়েজ অফিসের দরজায় নক করলো রানা। এটাই বিপজ্জনক মুহূর্ত। ওর জানামতে, বারোটা থেকে একটার মধ্যে লাঞ্চ খেতে যায় স্টাফরা, থাকে শুধু একা চীফ ক্যাশিয়ার। কিন্তু রোজই যে একই ঘটনা ঘটবে তার কোনো মানে নেই। নিয়মের ব্যত্যয় হতেই পারে কেউ হয়তো ক্লান্ত বোধ করছে, পিয়নকে দিয়ে

স্যাণ্ডউইচ আনিয়ে টেবিলেই বসে পড়েছে। দু'জন হলে সাম-লাতে পারবে, তার বেশি হলেই বিপদ। যদিও, বিপদ ঘটলেও কিছু এসে যায় না, কারণ শেষ পর্যন্ত ফলাফল সেই একই হবে। আপনমনে হাসলো রানা। তবে, এই সুযোগে দেখাই যাক না, আসলে কতো দূরে যেতে পারে ও।

কবাটের গায়ে স্পাই-হোলের ঢাকনি সরে গেল, একটা চোখের ঝিলিক দেখতে পেলো রানা। 'মিঃ বেকার?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'আমি মেইন্টেন্যান্স থেকে আসছি।'

'ইয়েস?'

'এই তলার কোথাও কোথাও নাকি বিদ্যুৎ নেই, গোলযোগটা কোথায় জানার জন্যে প্রতিটি অফিস চেক করছি আমি। এখানে সব ঠিক আছে তো, স্যার?'

'এক মিনিট।' স্পাইহোলের ঢাকনি জায়গামতো নেমে এলো। এক মুহূর্ত পর চেইন নাড়াচাড়ার আওয়াজ শুনলো রানা। দরজা খুলে গেল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একমাথা পাকা চুল নিয়ে ছোটোখাটো চেহারার এক প্রৌঢ়। 'দেখুন কি কাণ্ড, কোনো আলোই তো জ্বলছে না!' সরে গিয়ে রানাকে পথ ছেড়ে দিলো ক্যাশিয়ার। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকলো রানা, চট করে অফিসের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। স্টিফেন বেকার একাই রয়েছে। দর-জায় তালা লাগালো সে, তারপর চেইন আটকালো। বয়সের তুলনায় একটু যেন বেশি বুড়িয়ে গেছে লোকটা, সরু ফ্রেমের চশমা পরে আছে। চেইন লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই পয়েন্ট থ্রি-

এইট সেমি অটোমেটিকের মুখোমুখি হলো সে। চোখ জোড়া নিমেষে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। ঝুলে পড়লো কাঁধ। রানার চোখের সামনে আরো যেন ছোটো হয়ে গেল লোকটা।

একটু করুণা বোধ করলো রানা, অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলে লোকটার মুখের পাশে অটোমেটিকের ব্যারেল দিয়ে আস্তে করে টোকা দিলো। 'যা বলি শুনুন, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না— বুঝতে পারছেন?' আতংকিত বেকার যন্ত্রচালিতের মতো মাথা ঝাঁকালো। ওভারঅলের পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করলো রানা, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালো লোকটাকে। 'ওটায় বসে হাত দুটো পিছনে নিয়ে যান।'

লোকটার হাতে দ্রুত হাতকড়া পরালো রানা, এক প্রস্থ নাইলন কর্ড দিয়ে গোড়ালি জোড়া এক করে বাঁধলো। 'খুব বেশি ব্যথা লাগছে কি?'

বেশ দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে ক্যাশিয়ার। ক্ষীণ হাসলো সে, যদিও ঠোঁট জোড়া কাঁপতে লাগলো। বললো, 'ডাকাত, কিন্তু অতি ভদ্র। না—আর লাগলেই বা কি! আপনার কাজ তো আপনাকে করতেই হবে!'

'আমাদের পেশা আলাদা হতে পারে,' কৌতুক করে বললো রানা, 'কিন্তু কেউই তো আর জঙ্গল থেকে আসিনি। সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ বেকার।'

'এবার বোধহয় আমার মুখে টেপ লাগাবেন?'

'একটু পরে লাগাই, কেমন?' হাসলো রানা। 'তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন, প্লিজ। এখানে আপনার ওয়েজ বিল

হয় দেড় থেকে সোয়া দু'লাখ পাউণ্ড, নির্ভর করে ওভারটাইম কি পরিমাণ হলো তার ওপর। চলতি হপ্তার অংকটা কতো?'

'সোয়া দু'লাখ পাউণ্ড,' এতোটুকু ইতস্তত না করে জবাব দিলো ক্যাশিয়ার। 'আরেক হিসেবে, মাত্র এক টন ওজনের একটা বোঝা। কেন যেন আমার ধারণা হচ্ছে, টাকাগুলো নিয়ে বেশি দূর আপনি যেতে পারবেন না।'

'সে দেখা যাবে,' বললো রানা।

অফিসের যেদিকেই তাকালো রানা, শুধু টাকা আর টাকা। কোথাও স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে বাণ্ডিলগুলো, ব্যাংক থেকে আনার পর ওগুলোয় এখনো হাত দেয়া হয়নি। তবে বেশিরভাগ নোট এরইমধ্যে কাঠের ট্রে-র পকেটে জায়গা পেয়েছে। স্ট্রংরুমের দরজা খোলা, ভেতরে খুচরো পয়সা ভর্তি অনেকগুলো ক্যানভাস ব্যাগ। দ্রুত হাতে ব্যাগগুলো খালি করলো রানা। ট্রলি ঠেলে টেবিলের পাশে আনলো। ট্রে-র পকেট আর শেলফে রাখা টাকাগুলো তাড়াহুড়ো করে ভরে ফেললো ব্যাগগুলোয়। বেকার মিথ্যে বলেনি, বিরাট একটা বোঝাই বটে। সমস্ত টাকা ব্যাগে ভরতে তিন মিনিট লেগে গেল রানার।

ট্রলি ঠেলে দরজার দিকে এগোলো রানা।

পিছন থেকে ক্যাশিয়ার বললো, 'বন্ধুর একটা উপদেশ ছিলো।'

দরজার কাছে ট্রলি রেখে ফিরে এলো রানা। 'বলুন।'

'আপনি হয়তো জানেন না, রয়্যাল এয়ারফোর্সের প্রচুর

কাজ করি আমরা,' বললো ক্যাশিয়ার। 'আর তাই, আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম একটু বিশেষ ধরনের।'

'আমি কি ভেতরে ঢুকিনি?'

'ঢোকা আর বেরুনো কি এক কথা হলো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ক্যাশিয়ার। 'বিশেষ করে আপনি যখন এতগুলো ব্যাংক নোট ঠেলে নিয়ে যাবেন। তাছাড়া, গাড়ি পাবেন কোথায়? গাড়ি যদি পানও, গেট দিয়ে বেরুবেন কিভাবে? সশস্ত্র গার্ডদের দেখেননি ওখানে? চেক না করে কোনো গাড়িকে যেতে দেয় না ওরা।' মুখ বাঁকালো প্রৌঢ়। 'আপনার সমস্যা দেখে আমারই খারাপ লাগছে।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই বলে দুঃখিত,' বললো রানা। 'তবে, কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ কিনতে যেন ভুলবেন না। ওরা আমার হয়ে সমস্যার সমাধানটা ছেপে দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

'যদি বেরিয়ে যেতে পারেন তাহলে বলবো আপনি সত্যিই প্রতিভাবান,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো ক্যাশিয়ার। 'আর যদি প্রতিভাবান হন তাহলে জিজ্ঞেস করবো, এতো থাকতে এ-লাইনে কেন?'

ফোঁস করে সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রানা। 'এটাই আমার উত্তর।' পকেট থেকে বড় একটা প্লাস্টার বের করলো ও, ক্যাশিয়ারের মুখে লাগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিকমতো নিশ্বাস ফেলতে পারছেন তো?' মাথা ঝাঁকালো ক্যাশিয়ার, চেহারা কালচে হয়ে গেছে। সান্ত্বনাসূচক হাসি দেখা গেল

রানার ঠোঁটে। 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, একটু পরই কেউ না কেউ এসে পড়বে। সহযোগিতার জন্যে আরেকবার ধন্যবাদ।'

বেকারের পিছনে একটু পর বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ঘরে বা বাইরে, কোথাও কোনো শব্দ নেই। পঞ্চান্ন বছরের জীবনে এতোটা নিঃসঙ্গ আর কখনো বোধ করেনি সে। মনে হলো ডাকাতি হবার পর এক যুগ পেরিয়ে গেছে, এই সময় ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বাইরে। ঘন ঘন টোকা পড়লো কবাটে।

পাঁচ

সমস্যাটা বেশ পুরনো, এবং গুরুতর তো বটেই; কিন্তু ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের গোচরে এলো অনেক পরে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটার সাথে একা শুধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নয়, রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখাও জড়িয়ে পড়েছে।

বি-এস-এস চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেড রাতেই পুলিশ কমিশনারের টেলিফোন পেয়েছিলেন। সমস্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া হয়েছে তাঁকে। তবে ব্যাপারটা নিয়ে যেহেতু স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট জ্যাক মারভিন মাথা ঘামাচ্ছে, ঠিক হলো, সকাল দশটায় তার সাথে একবার বসবেন তিনি। তৃতীয় একটা পক্ষ হলো রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা, ওরা নাকি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চায়। উইলিয়াম ম্যানফ্রেড ওদেরকে সময় দিয়েছেন এক ঘন্টা পর অর্থাৎ এগারোটায়। পুলিশ কমিশনার ফোনেই তাঁকে আভাস দিয়ে রেখেছেন, এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা

লণ্ডনে রয়েছেন, তিনিই হয়তো তাঁর সাথে দেখা করতে আসবেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ইন্টারকমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন উইলিয়াম ম্যানফ্রেড। সাক্ষাৎপ্রার্থী ভদ্রলোক দু'জন কাজ সেরে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না।

ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট জ্যাক মারভিন কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় এলো। বাঘের মতো চেহারা লোকটার, গরিলা আকৃতির শরীর নিয়ে থপ থপ করে হাঁটে। সাদা পোশাকে এসেছে, কিন্তু তার হাবভাব আর চেহারাই বলে দেয় —জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। উইলিয়াম ম্যানফ্রেড চেয়ার ছাড়লেন না, হাতও বাড়ালেন না। মারভিনের গুড মর্ণিঙের জবাবে ছোটো করে মাথা ঝাঁকালেন শুধু। তারপর ইঙ্গিতে ডেস্কের ওধারের খালি একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'নিন, শুরু করুন।'

কাজের লোকদের সাথেই ওঠা-বসা মারভিনের, এ-ধরনের ব্যবহারের সাথে তার পরিচয় আছে। কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথাই পাড়লো সে, 'একেবারে প্রথম থেকে শুরু করি। সমস্যাটা হলো কয়েদীদের নিয়ে—যারা জেল থেকে পালায়। এটা একটা স্থায়ী সমস্যা, বরাবর ছিলো, ভবিষ্যতেও থাকবে। গড়পড়তায় বছরে, এই ধরুন, আড়াইশোর মতো পালাতো...'

'আড়াইশো?' মারভিনকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ম্যানফ্রেড, তাঁর পাকা ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'কি বছর এতো লোক

পালাচ্ছে? এবং আপনি বলছেন এই সংখ্যা ইদানীং আরো বেড়েছে?' ডেস্ক থেকে প্যাকেট তুলে তুর্কী সিগারেট বের করলেন তিনি। 'খুবই বিপজ্জনক বলতে হয়।'

লালমুখো বাঘের গোঁফের নিচে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল। 'বিপজ্জনক, হ্যাঁ। কিন্তু পালানোর এই হার অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'নয়?' ম্যানফ্রেডের শিরদাঁড়া প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে থাকলো।

'দেড়শোর মতো কয়েদী খোলা জেল থেকে স্রেফ হেঁটে চলে যায়, ঠেকাবার কোনো উপায় নেই,' বললো মারভিন। 'জেলখানার বাইরে কাজ করতে পাঠানো হয় বছরে লাখ খানেক কয়েদীকে, বাছাই করেই পাঠানো হয় তাদের। বড়জোর তর্ক করা যেতে পারে, বাছাইয়ে গলদ থাকে। বিয়ে, জন্মদিন, রোগ-শোক ইত্যাদি উপলক্ষ্যে প্যারোলে ছাড়া পায় যারা তাদের মধ্যে থেকে পালায় আরো পঞ্চাশ জন। একবার ছাড়া পেলে এই পঞ্চাশ জন আর ফিরে আসে না।'

'হলো দুশো।'

'বাকি পঞ্চাশজন আক্ষরিক অর্থেই জেল ভেঙে পালায়।'

'এদের সংখ্যাই কি ইদানীং বাড়ছে?'

'হ্বী। গত বছরখানেক ধরেই বাড়ছে। জেল ভেঙে পালানোর প্রায় প্রতিটি ঘটনাই চমকপ্রদ, দুঃসাহসিক সব ঝুঁকি নিতে দেখা যায়। ইদানীং যে-সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো আরো বেশি অর্থাৎ আগের চেয়েও চমকপ্রদ, কিন্তু ঝুঁকির মাত্রা কম। এখনকার

জেল ভাঙার প্ল্যানগুলো একেবারে নিখুঁত, পরিষ্কার বোঝা যায়, কোনো প্রতিভাবানের ছোঁয়া রয়েছে। অত্যাশ্চর্য ঘটনা গত ক'-মাসে অনেকগুলোই ঘটলো, একটাও আমরা ঠেকাতে পারিনি।'

'দুঃখজনক ব্যর্থতা।'

'ট্রেন ডাকাত উইলসনকে দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়,' বলে চললো মারভিন। 'ব্রিমিংহাম জেল থেকে তাকে বের করে নিয়ে গেলে সারা দেশ আঁতকে ওঠে। এই প্রথম একটা গ্যাং আক্ষরিক অর্থে জেল ভেঙে কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।'

'কমাণ্ডো স্টাইলে।'

'ওদের প্ল্যানটা ছিলো নিখুঁত, মিঃ ম্যানফ্রেড।'

'এই ঘটনাটার পরই তো কাউন্টের নাম প্রথম শোনা গেল, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ।

মাথা ঝাঁকালো মারভিন। 'আমাদের জানামতে, চলতি বছর আঠারোটা বড় ধরনের জেল ভাঙার জন্যে দায়ী সে।'

'তার আর সব কৃতিত্ব সম্পর্কে বলুন।'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে একটা পাইপলাইন তৈরি করে রেখেছে লোকটা, ফেরার আসামী বা গ্রেফতার হতে পারে এমন সব ক্রিমিনালদের এই পাইপলাইন দিয়ে দেশের বাইরে পাচার করে। দু'বার আমরা তার অর্গানাইজেশনের দু'জন লোককে গ্রেফতার করি—ওদের কাজ ছিলো ক্রিমিনালদের রিসিভ করে আরেক জায়গায় ডেলিভারি দেয়া।'

'নিংড়ে কিছু বের করা গেছে?'

'না, ওরা কিছু জানলে তো! পাইপলাইনটা কাউণ্ট কিভাবে

তৈরি করেছে, জানেন? এই সিস্টেমটা প্রথম চালু করে রেজিস্ট্যান্স, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে। একজন লোক শুধু তার নিজের নির্দিষ্ট কাজটুকু সম্পর্কে জানে। কাজের পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে জানলেও জানতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। এর মানে হলো, কেউ যদি ধরা পড়ে, তাহলেও গোটা অর্গানাইজেশনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না।

'তারমানে কেউ জানে না কাউন্ট লোকটা আসলে কে?'

'গোস্ট স্কোয়াড ন'মাস ধরে আদাজল খেয়ে লেগে আছে, কিছুই জানতে পারেনি। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সাধারণ কোনো ক্রিমিনাল নয় সে। হি ইজ সামথিং স্পেশাল। তবে...,' খানিক ইতস্তত করলো মারভিন, '... থাক, গুজব গুজবই, ও-সবে কান দিয়ে লাভ নেই।'

'গুজব জিনিসটা চাটনির মতো—টক-ঝাল-মিষ্টি।'

'সত্যি আপনি শুনতে চান?' বলার আগে বাথের চেহারা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। 'কারো কারো ধারণা, কাউন্টের নাকি কোনো অস্তিত্বই নেই। অর্গানাইজেশন চলে বোর্ড অভ ডিরেক্টরদের নির্দেশে। তবে ওদের নাকি একটা অত্যাধুনিক কমপিউটর আছে, সিদ্ধান্তগুলো সেটার কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। সাধারণ কোনো কমপিউটর নয়, দেখতেও নাকি মানুষ আকৃতির... ।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন? রোবট?'

'শুনে তো তাই মনে হয়,' ইতস্তত করে বললো মারভিন। 'সত্যি-মিথ্যে জানি না। কোনো প্রমাণ নেই। আগেই তো

বলেছি, মিঃ ম্যানফ্রেড, স্রেফ গুজব।'

'এতোক্ষণ আপনাদের ব্যর্থতার ইতিহাস শুনলাম,' ম্যানফ্রেড বললেন। 'এবার বলুন, এর সাথে রানা এজেন্সি জড়ালো কিভাবে।'

'তার আগে, মিঃ ম্যানফ্রেড, এই ফাইলটার ওপর একবার চোখ বুলাতে অনুরোধ করি,' বলে ব্রিফকেস খুলে একটা ফোল্ডার বের করে সিক্রেট সার্ভিস চীফের সামনে রাখলো মারভিন।

ফোল্ডারটা খুলে ম্যানফ্রেড দেখলেন, বারো পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট। সবটুকু পড়ার ধৈর্য হলো না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না। প্রথম, শেষ, আর মাঝখানে দেড় পৃষ্ঠার ওপর দ্রুত চোখ বুলালেন তিনি। তারপর মাথা নাড়লেন। 'রিপোর্টের উপসংহারে বলা হয়েছে, কাউন্ট সম্পর্কে কিছু জানার একমাত্র উপায় হলো তার একজন হবু মক্কেলের ওপর নজর রাখা—অর্থাৎ হয় সেই মক্কেলকে অনুসরণ করতে হবে, অথবা মক্কেলের ভূমিকায় নিজেদের একজন লোককে অভিনয় করাতে হবে। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এই মুহূর্তে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ লোক জেল খাটছে, কাউন্টের সম্ভাব্য মক্কেল কে হবে তা খুঁজে বের করার উপায় কি?'

নিজের অজান্তেই গোঁফে তা দিলো মারভিন। 'বাতিল করার সিস্টেম ধরে এগোলে কাজটা পানির মতো সহজ,' বললো সে। 'কি ধরনের কয়েদীর প্রতি তার আকর্ষণ, আমরা জানি। শুধু যাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়েছে, এবং যাদের কাছে মোটা

অংকের টাকা লুকানো আছে।' ব্রিফকেস থেকে এবার ছোট একটা ফোল্ডার বের করলো সে। ফোল্ডার থেকে বেরুলো টাইপ করা একটা কাগজ, আর তিনটে ফটোগ্রাফ। 'এটা একটা তালিকা, মিঃ ম্যানফ্রেড। শেষ নাম দুটো দেখুন, তারপর দেখুন ফটো তিনটে।'

দুটো নামের প্রথমটা পড়লেন ম্যানফ্রেড। 'রিড কোয়েন-এর কথা আমার মনে আছে। ক'মাস আগে ডার্টমুর থেকে পালিয়েছে লোকটা। রয়্যাল মেরিন কমাণ্ডোস-এর ছদ্মবেশ নিয়ে একটা গ্যাং প্রিজন ভেহিকেল অ্যামবুশ করে, ওখানে তখন সামরিক মহড়া চলছিল। তারপর লোকটার কোনো খবর পেয়েছেন?'

'না। রিড কোয়েন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পিটারফিল্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতিতে রিড কোয়েন সহ চারজন ছিলো, প্রত্যেকের বিশ বছর করে জেল হয়। ঘটনাটা আপনার মনে আছে কি?'

মাথা নাড়লেন ম্যানফ্রেড। ঠোঁটে চেপে ধরা সিগারেটে ছোটো ছোটো টান দিলেন কয়েকটা। ডেস্কে কোনো ছাইদানি নেই, কারণ ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। তবে অভ্যেসটা তাঁকে ছাড়েনি, তাই সিগারেট না ধরিয়ে টান দিয়ে শুধু তামাকের সুগন্ধ নেন।

'পাঁচ বছর আগের ঘটনা। নর্দার্ন এয়ারওয়েজের একটা ডাকোটা হাইজ্যাক করে ওরা। ডাকোটায় পুরনো নোট ছিলো আশি লাখ পাউণ্ডের—সেন্ট্রাল স্কটিশ ব্যাংক থেকে পাঠানো

হচ্ছিলো লণ্ডনের ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ডে। চমৎকার নিখুঁত একটা কাজ, স্বীকার করতেই হবে। দলে ওই চারজনই ছিলো ওরা, টাকাসহ নিরাপদে কেটে পড়ে।'

'অর্থাৎ ধরা পড়লো অনেক পরে?'

'হ্যাঁ। সেণ্ট্রাল ব্যাংক এক লাখ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। রিড কোয়েনের বান্ধবী লোভটা সামলাতে পারেনি।'

'কিন্তু টাকাগুলো আর উদ্ধার করা যায়নি।'

'না।'

'ধরা পড়লো ক'জন? একা রিড কোয়েন?'

'না, ধরা চারজনই পড়েছে।'

'পালিয়েছে একা রিড কোয়েন?'

মাথা নাড়লো মারভিন। 'প্রথমে পালায় জন হেরিক। তারপর রিড কোয়েন। বাকি থাকলো রিপ হটন, আর জো সলোমন।'

রিড কোয়েনের ফটোটা ডেস্কে নামিয়ে রাখলেন ম্যানফ্রেড। 'আমার হাতে বাকি দুটো ফটো তাহলে ওদের?'

'না,' বললো মারভিন। 'একটা, প্রথমটা, ওদের একজনের— রিপ হটনের। জো সলোমনের ফটো আপনার হাতে নেই।'

'তাহলে দ্বিতীয় ফটোটা কার?'

'ওটা মিঃ বদরুল হাসানের ফটো,' বললো মারভিন। 'বদরুল হাসান রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট, লণ্ডন শাখায় কাজ করে···মানে, করতো।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?' ঠোঁটে সিগারেট তুলতে গিয়ে থমকে

গেলেন ম্যানফ্রেড।

'রাতের অন্ধকারে, সবার অগোচরে, রিপ হটনকে তার সেল থেকে বের করে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেয়া হয়,' বললো মার্ভিন। 'তার বদলে সেলে ঢোকে বদরুল হাসান, রিপ হটনের ছদ্মবেশ নিয়ে। এটা তিন মাস আগের ঘটনা।'

রিপ হটনের ফটোর দিকে তাকালেন ম্যানফ্রেড, তারপর বদরুল হাসানের চেহারাটাও দেখলেন। রিপ হটন নিগ্রো, তাঁর ছদ্মবেশ নেয়া বদরুল হাসানের জন্যে কঠিন কোনো সমস্যা হয়নি—দু'জনের শারীরিক গঠন প্রায় একই রকম। 'কিন্তু কেন?'

'জন হেরিক আর রিড কোয়েন জেল থেকে পালাবার পর আমরা আন্দাজ করে নিই, এবার হয় রিপ হটন নাহয় জো সলোমনের পালা। তাই রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার সাহায্য চাই আমরা।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন ম্যানফ্রেড। 'একটা বেসরকারি ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের সাহায্য চাওয়ার দরকার পড়লো কেন? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যোগ্য লোকের অভাব দেখা দিয়েছে?'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, মিঃ ম্যানফ্রেড,' নরম সুরে বললো মারভিন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমরা যারা কাজ করি তাদের মস্ত একটা দুর্বলতা হলো চেহারা দেখে এক মাইল দূর থেকে পুলিশের লোক বলে চেনা যায়। অথচ রিপ হটনের ভূমিকায় নামানোর জন্যে এমন একজন লোক দরকার হলো আমাদের যাকে

কোনোমতেই পুলিশ বলে মনে হওয়া চলবে না। রিপ হটন একজন ক্রিমিনাল, তার ছদ্মবেশধারীকেও ক্রিমিনালের মতো দেখাতে হবে, তা না হলে পাঁচ মিনিটও টিকবে না সে। এই সব সমস্যার কথা ভেবে ওপর মহল থেকে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, কোনো ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের সাহায্য চাওয়া হবে…।'

'এবং তালিকার প্রথমেই ছিলো রানা এজেন্সির নাম…।'

'স্বভাবতই, মিঃ ম্যানফ্রেড। সারা পৃথিবীতে ওরাই তো সব-চেয়ে নাম করেছে, তাই না?'

'তারপর কি হলো বলুন,' জানতে চাইলেন ম্যানফ্রেড। 'বদরুল হাসান রিপ হটনের ভূমিকায় জেলে ঢুকলো। রিপ হটন গেল কোথায়?'

'তাকে অন্য এক জেলে পাঠানো হয়, এমন একটা সেলে যেখানে জেল সুপার ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। ব্যাপার-টা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়, কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া হয়নি।'

'তারপর? কাউন্টের লোকেরা রিপ হটন মনে করে বদরুল হাসানের সাথে যোগাযোগ করলো?'

'করলো,' মাথা ঝাঁকালো মারভিন। 'এবং জেল থেকে বের'ও করে নিয়ে গেল তাকে। কিন্তু…।'

'কিন্তু?'

'তারপর আর তার কোনো খবর নেই।'

'মানে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সিক্রেট সার্ভিস চীফের। 'আপনাদের সাথে তার গোপন যোগাযোগ ছিলো না?'

'না। জেলের ভেতর কাউন্টের লোক থাকাটা স্বাভাবিক, তাই

যোগাযোগ না রাখাটাই নিরাপদ মনে করা হয়েছিল। আমরা হাসানের নিরাপত্তার প্রশ্নও তুলেছিলাম, কিন্তু রানা এজেন্সির তরফ থেকে বলা হয়, কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয় হাসানের তা জানা আছে। মোট কথা ওরা ওদের পদ্ধতিতে কাজ করতে চাওয়ায় আমরা আর নাক গলাইনি।'

'কতোদিন আগের কথা?'

'বদরুলকে জেল থেকে বের করে নিয়ে গেছে…,' হিসেব করে মারভিন জানালো, 'আজ উনিশ দিন।'

'ঘটনাটার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'ঠিক যেভাবে উইলসনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,' বললো মারভিন। 'বারোজন সশস্ত্র লোক রাতের অন্ধকারে জেল ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। গ্রেনেড আর স্মোকবম ফাটিয়ে, রিভলভার ছুঁড়ে আতংক সৃষ্টি করে। সবাই মাস্ক পরেছিলো। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল একটা হেলিকপ্টার, সেটা থেকে টিয়ারগ্যাসের শেল ফেলা হয়। বাইরে গাড়ি ছিলো ওদের, কিন্তু বদরুলকে হেলিকপ্টারে তুলে দেয়া হয়। জেলখানার শৃংখলা ফিরে আসতে মিনিট পনের সময় লাগে, ইতিমধ্যে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায় ওরা। তারপর অনেক খুঁজেও কোনো হদিশ করা যায়নি। সেই থেকে বদরুল হাসানেরও কোনো খবর নেই। তিনি কোথায়—বেঁচে আছেন কিনা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'রিড কোয়েন আর জন হেরিকের মতো সে-ও তাহলে বাতাসে মিলিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ-ব্যাপারে রানা এজেন্সির প্রতিক্রিয়া কি?' জানতে চাইলেন ম্যানফ্রেড। দাঁত দিয়ে সিগারেটের ফিল্টার কামড়ে ধরলেন তিনি।

'এজেন্সির ডিরেক্টর মিঃ মাসুদ রানা তিন দিন হলো খবর পেয়ে লণ্ডনে পৌঁচেছেন,' বললো মারভিন। 'ছটো দিন ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করার পর কাল বিকেলে পুলিশ কমিশনারের সাথে দেখা করেন তিনি। কমিশনারকে তিনি জানান, এ-কেসে পুলিশ নাকি হালে পানি পাবে না, দায়িত্ব নিতে হবে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে। কাউন্ট নাকি এসপিওনাজের সাথেও জড়িত। সেজন্যেই তিনি আপনার সাথে-দেখা করতে চেয়েছেন। তাঁর কথায় নিশ্চয় যুক্তি আছে, তা না হলে কমিশনার আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন না।'

চোখ বুঁজে সমস্ত ঘটনা, যা যা শুনেছেন, সব একবার স্মরণ করলেন উইলিয়াম ম্যানফ্রেড। তারপর ঢুলুঢুলু চোখে তাকালেন তিনি। 'তাহলে হাতে থাকলো শুধু একজন, সবেধন নীলমণি জো সলোমন?'

'জী।'

'আপনাদের ধারণা, এরপর তার পালা?'

'জী।' মারভিন ক্লান্ত। চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

'লোকটাকে নিয়ে আপনাদের কোনো প্ল্যান আছে?'

'আমাদের নেই,' বললো মারভিন। 'মাসুদ রানার আছে। রিপোর্টটা পড়লেই জানতে পারবেন। কমিশনার তার প্ল্যান অনুমোদন করেছেন, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যও করা হবে

তাকে। তবে, কমিশনার চান, প্ল্যানটা যেন সিক্রেট সার্ভিসও অনুমোদন করে।'

'এবার, লোকটা সম্পর্কে কি জানেন বলুন।'

ব্রিফকেস থেকে আরেকটা ফোল্ডার বের করে বাড়িয়ে দিলো মারভিন। 'জো সলোমনের ডোশিয়ে।'

ফোল্ডার খুলে প্রথমে ফটোটা বের করলেন ম্যানফ্রেড, তাকিয়ে থাকলেন একদৃষ্টে। কারো চেহারা আর ভঙ্গির মধ্যে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তির সাথে পশু-শক্তির অস্থিরতা এভাবে মিশে থাকতে আগে কখনো দেখেননি তিনি। জো সলোমনের মুখের একটা কোণ ব্যঙ্গভরা হাসিতে বাঁকা হয়ে আছে। সাথে সাথে আকৃষ্ট হলেন ম্যানফ্রেড, ফোল্ডারের কাগজগুলো দ্রুত পড়ে ফেললেন।

জো সলোমনের বয়স বত্রিশ। সতেরো বছর বয়সে নেভীতে যোগ দিয়েছিল সে। ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে মটর টর্পেডো বোটে পেটি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, যুদ্ধের পর শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে চাকরি হারায়। চাকরি হারালেও সমুদ্রেই বাসা বাঁধে সলোমন, সেই বছরই চোরাচালানের মালামাল সহ ধরা পড়ে সে। ছ'মাস জেল খেটে বেরিয়ে পরের বছর আবার গ্রেফতার হয় ট্রেন ডাকাতির অভিযোগে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। সেই থেকে ডাকোটা হাইজ্যাক করার আগে আর কখনো তাকে জেল খাটতে হয়নি বটে, কিন্তু পুলিশ তাকে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহে মোট বত্রিশ বার ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

'চরিত্র বটে একখানা,' ম্যানফ্রেড বললেন। 'অপরাধের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে লোকটা নিজের কৃতিত্বের পরিচয় রাখার চেষ্টা করেনি।'

'আপনাকে মিথ্যে বলবো না,' বাঘের মতোই ঘড়ঘড়ে শোনালো মারভিনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'ভিলেনদের প্রতি আমার কোনো দরদ না থাকলেও, এই লোকটার প্রতি একেবারে নেই তা বলতে পারবো না। যুদ্ধের পর ওর যদি চাকরি না যেতো, তার বদলে ওর যদি পদোন্নতি হতো, নেভীর একটা রত্ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতো লোকটা।'

'এখন সে বিশ বছরের জেল খাটছে?'

'খাটছে। তবে বেশি দিন খাটবে বলে বিশ্বাস হয় না। জন হেরিক খাটছে না, রিড কোয়েন খাটছে না, সবাই জানে রিপ হুটনও খাটছে না।'

'কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?'

'ফ্রাইডেথর্প-এ। ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে, তাই না? তাছাড়া, একজন অসুস্থ লোকের সাথে কতো আর নিষ্ঠুর ব্যবহার করা যায়?'

'অসুস্থ?'

'মাস তিনেক আগে মৃদু একটা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিল সে।'

ম্যানফ্রেড ফটোটার ওপর আবার একবার চোখ বুলালেন। 'দেখে তো যথেষ্ট সুস্থ বলে মনে হচ্ছে। স্ট্রোক? নাকি ভান?'

'ইলেকট্রোএনকেফ্যালোগ্রাফ তো মিথ্যে বলবে না,' মারভিন

তিক্ত একটু হাসলো। 'ব্রেনের ওয়েভ প্যাটার্নেও গুরুতর গোল-যোগ ধরা পড়েছে। ড্রাগ ব্যবহার করে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ-গুলো আদায় করা সম্ভব, কিন্তু স্ট্রোকের লক্ষণ আদায় করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেক করা হয়েছে তাকে। তিন দিনের জন্যে ম্যানিংহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে রাখা হয়েছিল।'

'মারাত্মক একটা ঝুঁকি নয়? আমি হলে তো ভাবতাম সলো-মনকে ছিনিয়ে আনার এটা একটা মোক্ষম সুযোগ।'

মারভিন মাথা নাড়লো। 'বেশিরভাগ সময় অজ্ঞান ছিলো সে। সীল করা একটা ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল তাকে, বিছানার পাশে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো দু'জন প্রিজন অফিসার।'

'জেলখানার ভেতর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না?'

'না। সুযোগ-সুবিধের অভাব। আর সব জেলখানার মতো ফ্রাইডেথর্পে সিক বে, আর একজন ডাক্তার আছে, তবে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে লোকাল হসপিটালের সীল করা ওয়ার্ডে পাঠান হয়।'

'কিন্তু কেউ যদি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকে?'

'সেক্ষেত্রে তাকে ওয়ার্মউডের প্রিজন হসপিটালে পাঠানো হয়,' বললো মারভিন। 'তবে সলোমনের কেস এতোটা সিরি-য়াস নয় যে তাকে কোনো হাসপাতালে রাখার দরকার আছে। তাছাড়া, সিরিয়াস হলেই বা কি, হোম অফিস তার ট্রান্সফার অনুমোদন করবে না। কোনো হাসপাতালেই ম্যাক্সিমাম সিকিউ-রিটির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার মতো কয়েদীকে প্রিজন হসপি-

টালে পাঠানোর মানেই হবে লণ্ডন গ্যাং-গুলোকে সুযোগ করে দেয়া—যেভাবে হোক সলোমনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তারা।'

'হুম,' বলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন ম্যানফ্রেড। এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। 'ধন্যবাদ, মিঃ মারভিন। গোটা ব্যাপারটা আমি জানলাম। এবার দেখা যাক রানা এজেন্সির কি বলার আছে।'

ইঙ্গিত পেয়ে চেয়ার ছাড়লো মারভিন। দু'সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলো সে, কিন্তু ম্যানফ্রেড মুখ তুলে তাকালেন না—ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রিপোর্টটা পড়তে শুরু করেছেন গভীর মনোযোগের সাথে।

'গুডলাক, মিঃ ম্যানফ্রেড,' বলে থপ থপ পা ফেলে দরজার দিকে এগোলো মারভিন।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন ম্যানফ্রেড, দরজা খোলার এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনলেন।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় ডেস্কের ইন্টারকম বেজে উঠলো।

বোতাম টিপে ম্যানফ্রেড বললেন, 'ইয়েস ?'

প্রাইভেট সেক্রেটারি বললো, 'মিঃ মাসুদ রানা, স্যার।'

'আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।' রিপোর্টের শেষ কটা লাইনে চোখ বুলিয়ে ফোল্ডারে ভরে রাখলেন কাগজগুলো।

নক হলো দরজায়। ফোল্ডার ভাঁজ করে চোখ তুললেন ম্যানফ্রেড। খুলে গেল কবাট। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে খোলা একটা তলোয়ার। ম্লান, ধূসর রঙের জ্যাকেট পরেছে রানা, সাদা ট্রাউজার, সাদা শার্ট—তবু যেন অদৃশ্য একটা আভা

বেরিয়ে আসছে ওর সমগ্র অস্তিত্ব থেকে। চোখে মায়া, কিন্তু দৃষ্টিতে ক্ষুরের ধার। ক্ষিপ্রতা আর দ্রুতগতির লাগাম টেনে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন ম্যানফ্রেড। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গ্লাড টু মিট ইউ, মিঃ মাসুদ রানা। আপনি নিজে আসায় আমি খুব আনন্দিত।'

এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করলো রানা। 'আমার সৌভাগ্য।'

'বসুন, প্লিজ,' একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন ম্যানফ্রেড। রানা বসলো। সাথে সাথে কাজের কথা পাড়লেন তিনি, 'আপনার ধারণা কাউন্ট একটা ইন্টেলিজেন্স কেস। কারণটা কি বলুন তো?'

'ঘটনাটা আপনার মনে আছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'তিন বছর আগে চেস্টার কেইন, বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, রাশিয়ায় তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়? এ-বছরের প্রথম দিকে ফেলবারস্যাম জেলখানা থেকে পালিয়ে যায় সে।'

ম্যানফ্রেড মাথা ঝাঁকালেন। 'সত্যি কথা বলতে কি, খবরটা শোনার পর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কেইনকে কখনোই আমার দুরন্ত বলে মনে হয়নি।'

'গত আগস্টে তাকে মস্কোয় দেখা গেছে।'

বিস্ময়ে বোবা বনে গেলেন ম্যানফ্রেড। তারপর অস্ফুটে বললেন, 'মাই গড!' পরমুহূর্তে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তাঁর। 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

উত্তর না দিয়ে একের পর এক আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলো

রানা, 'বব হাডসন, যাকে আপনারা ডাবল এজেন্ট বলে সন্দেহ করছিলেন, হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেল—জানেন, এখন সে কোথায়? পার্লামেন্ট এম. পি., স্যার হামফ্রে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোপন ডকুমেন্টসহ নিখোঁজ হয়েছেন—জানেন, এখন তিনি কোথায়? অ্যাডমিরাল টয়েনবি, জাহাজ থেকে ইংলিশ চ্যানেলে পড়ে হারিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর লাশ পাওয়া গেল না—জানেন, তারপরও তাঁকে দেখা গেছে?'

'কো-কোথায়?'

'হাডসনকে বার্লিনের পুব দিকে, স্যার হামফ্রেকে তেল আবিবে, আর টয়েনবিকে ইরানে।'

রানার ওপর যেন রেগে উঠলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না, মিঃ রানা। যে চারজনের কথা বলছেন তাদের আমরা অনেক খুঁজেও কোনো হদিশ করতে পারিনি। আর আপনি মাত্র তিন দিন হলো লণ্ডনে এসে···।'

'তিন দিন নয়, তিন মাস আগে থেকেই এ-সব তথ্য জানি আমরা, মিঃ ম্যানফ্রেড,' বি-এস-এস চীফকে বাধা দিয়ে বললো রানা।

'তিন মাস আগে থেকে জানেন?' এবার পরিষ্কার বোঝা গেল ম্যানফ্রেড রেগে গেছেন। 'আমাদের তাহলে জানাননি কেন?'

বিনয়ের সাথে হাসলো রানা। 'সেরকম কোনো চুক্তি আছে বুঝি—আমরা যা জানবো সব আপনাদের জানাতে হবে?'

যেন একটা পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থমকে গেলেন ম্যানফ্রেড। পরমুহূর্তে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'এখন তাহলে জানাবার গরজ অনুভব করছেন কি কারণে?'

'আমাদেরও লেজে পা পড়েছে, তাই,' বললো রানা। 'ব্যাপারটা এখন আর কাউন্ট বনাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নেই। রানা এজেন্সিও জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বিদেশের মাটিতে রয়েছি আমরা, আমাদের সাহায্য দরকার। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড না পারলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস সাহায্য করতে পারবে। তথ্যগুলো জানাবার কারণ, আপনারা বুঝুন, আপনাদের চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা—কাজেই তদন্তের ভার আমাদের হাতেই থাকা দরকার।'

কথাগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেন ম্যানফ্রেড। আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন। রানা তাঁর পাকা ভুরু কুঁচকে থাকতে দেখলো। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'যে চারজনের কথা বললেন আপনি, আপনার ধারণা কাউন্টই ওদেরকে ইংল্যাণ্ড থেকে বের করে নিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, এ শুধু আমার ধারণা,' বললো রানা। 'তবে এ লাইনে কাউন্টের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলে তো শুনিনি।'

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ম্যানফ্রেড বললেন, 'কাউন্ট লোকটা কি রাশিয়ান স্পাই, আপনার কি মনে হয়?'

'আমার তা মনে হয় না। টাকার কাঙাল, এটুকু বলতে পারি। শুধু মোটা অংকের দিকে হাত বাড়ায়। লোভী এক

ব্যবসায়ী, যার নীতির কোনো বালাই নেই।'

'তার সম্পর্কে গুজবগুলো আপনারও নিশ্চয় কানে গেছে··· ।'

'গুজব তো অনেকগুলো, কোন্‌টার কথা বলছেন আপনি? ভারতীয় মহারাজা? মিশরীয় মাস্টার ক্রিমিনাল?'

'না, ওই যে সেটা—কাউন্টের নাকি কোনো অস্তিত্বই নেই, আছে একটা অত্যাধুনিক কমপিউটর, অনেকটা নাকি মানুষের মতোই দেখতে··· ?' হাঁ হয়ে গেছে রানা, ওর চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ লক্ষ্য করে ম্যানফ্রেড চুপ করে গেলেন।

'এটা এই প্রথম শুনলাম,' শান্ত গলায় বললো রানা, কিন্তু গম্ভীর। ম্যানফ্রেড বুঝতে পারলেন, ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, ধারণাটার মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে। রোবট, তাই না?' হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো ও। 'না, মিঃ ম্যানফ্রেড, গুজবটা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না।'

'কারণ?'

বিষাদের সাথে তিক্ততা মেশানো ক্ষীণ একটু হাসলো রানা। 'কোনো প্রশ্ন করবেন না, প্লিজ। আপাততঃ শুধু এইটুকু বলতে পারি, কাউন্টের কাজের প্যাটার্ন দেখে আমার পরিচিত একজন লোকের কথা মনে পড়ে যায়। লোকটা বেঁচে থাকলে আরো অনেক ক্রাইম করতো।'

'জানতে পারি, কে ছিলো সে? নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে যায়?'

'কে. সি.—নাম শোনেননি? প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কিন্তু

মিস-গাইডেড। জগত এবং মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু তার কর্মপদ্ধতি ছিলো সর্বনাশা, ফলে অমঙ্গলের প্রতীক হয়ে ওঠে লোকটা।'

'আমেরিকার ওপর খুব খ্যাপা ছিলো, তাই না? কবীর চৌধুরী?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু কিছু জানি বটে তার সম্পর্কে। লোকটা মারা গেছে, বলছেন? এমনও তো হতে পারে যে…।'

'না, পারে না,' বললো রানা। 'আমি তাকে ডুবে মরতে দেখেছি। হাঙরের দল তাকে ছিঁড়ে ফেলে।'

'মারা যাবার পর শুধু হিরোরাই ফিরে আসবে, এর কোনো মানে নেই, মিঃ রানা,' রসিকতা করে বললেন ম্যানফ্রেড। নাম উচ্চারণ না করলেও রানা বুঝলো, শার্লক হোমস প্রসঙ্গ টানলেন বি-এস-এস চীফ। 'ভিলেনরাও তো দু'একজন ফিরে আসতে পারে?'

রানা কোনো মন্তব্য করলো না।

ম্যানফ্রেডও প্রসঙ্গ বদল করলেন, 'বদরুল হাসানের ভাগ্যে কি ঘটেছে বলে আপনার ধারণা?'

'সেটা জানবো বলেই তো কেসটার দায়িত্ব নিচ্ছি,' বললো রানা। এক সেকেণ্ড চোখ বুঁজে থাকলো ও। মনে একটা প্রশ্ন জাগলো, হাসান কি বেঁচে আছে?

ফোল্ডারে টোকা দিয়ে ম্যানফ্রেড বললেন, 'রিপোর্টটা পড়েছি। আপনার প্ল্যানটা ভালোই বলতে হবে। জো সলোমনের সাথে

একই সেলে থাকতে চান আপনি।'

সামান্য একটু সামনে ঝুঁকলো রানা। 'ব্যবস্থা করা সম্ভব, মিঃ ম্যানফ্রেড?'

'তা সম্ভব,' বললেন ম্যানফ্রেড। 'কিন্তু ঝুঁকির কথা ভেবে দেখেছেন? আপনিও কিন্তু মিঃ হাসানের মতো একই ঝুঁকি নিতে চাইছেন।'

'জানি,' বললো রানা। 'কিন্তু আর কোনো বিকল্প আছে কি? সূত্র পাবার একমাত্র পথ, কাউন্টের সম্ভাব্য মক্কেলের সাথে আঠার মতো সেঁটে থাকা।'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যানফ্রেড। 'হ্যাঁ, সলোমনের সাথে একই সেলে থাকতে হবে আপনাকে। হোম অফিস সরাসরি প্রিজন গভর্ণরের সাথে কথা বলে সে-ব্যবস্থা করতে পারবে। গভর্ণর ব্যাপারটা পছন্দ না-ও করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে যা বলা হবে তা তিনি করতে বাধ্য। একমাত্র তিনিই জানবেন। আপনার পরিচয়, ইতিহাস, ইত্যাদি কি হবে?'

'কাগজ-পত্র সব তৈরি করা হয়েছে—অবশ্যই জাল। আমি একজন আফগান, নাম নাহিদ শাহ, নাগরিকত্ব পেয়েছি তিন বছর, ইংল্যাণ্ডে আছি সাত বছর।'

'ভাবছি, শুধু শুধু সময়ের অপচয় হচ্ছে না তো? যুক্তিতে আসে বটে এরপর সলোমনকেই জেল থেকে বের করা হবে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না।'

রানা মাথা নাড়লো। 'স্ট্রোকটা খুব সন্দেহজনক, যাই বলুন। আগের কোনো রেকর্ড নেই, স্বাস্থ্যটাও দারুণ ভালো।'

'কিন্তু রিপোর্টে বলা হয়েছে ওটা জেনুইন অ্যাটাক ছিলো।'

'জানি মিঃ জ্যাক মারভিন আপনাকে বলেছেন, ড্রাগের সাহায্যে কৃত্রিম স্ট্রোকের ঘটনা ঘটানো যায় না।'

'তার ধারণা ভুল ?'

'আমি বলবো, সমস্ত তথ্য তাঁর জানা নেই। অফিশিয়ালি কোনো ড্রাগ সত্যি নেই, কিন্তু প্রায় বছরখানেক হলো হল্যাণ্ডে এ-ধরনের একটা ড্রাগ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছে। ওষুধটার নাম মাবোফাইন। ইনসুলিন আর শক ট্রিটমেন্টের যে ক্ষমতা, এটারও সেই একই ক্ষমতা—ব্রেনের ওয়েভ প্যাটার্নে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ওষুধটা মানসিক রোগীদের ওপর ব্যবহার করা যাবে বলে আশা করছে ওরা।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, সলোমনকে জেল থেকে বের করার অপারেশন এরি মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ?'

'অপারেশন শুরু হয়নি, প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।'

'যদি এমন হয়, প্রস্তুতি শেষ করতে এক বছর বা ছ'মাস সময় নিলো ওরা ?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যানফ্রেড। 'হার ম্যাজেস্টি-র অতিথি হিসেবে এতোদিন থাকতে পারবেন ? আর সব কাজ বাদ দিয়ে ?'

'মনে আছে, বলেছি, আপনাদের সাহায্য লাগবে আমার ?'

ম্যানফ্রেড মাথা ঝাঁকালেন।

'একটা ডাকাতি করে ধরা পড়বো আমি,' বললো রানা। 'বিচারে আমার জেল হবে। ফ্রাইডেথর্প কারাগারে নয়, অন্য কোথাও রাখা হবে আমাকে—কাগজে কলমে। আসলে আমি

জেলের বাইরে থাকবো। ওদিকে ফ্রাইডেথর্পে থাকবে সলোমন, কিন্তু আমাদের লোকজন তার ওপর নজর রাখবে। কাউণ্টের লোকেরা যোগাযোগ করলে নিশ্চয়ই তার ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন আসবে, আমার লোকেরা ধরতে পারবে সেটা। তখনই হোম অফিস ফ্রাইডেথর্পে পাঠাবে আমাকে, সলোমনের সাথে একই সেলে থাকবো আমি। এবার বুঝতে পারছেন, কোথায় আপনার সাহায্য দরকার আমার?'

চিন্তিত হলেন ম্যানফ্রেড। 'এতো সব আয়োজন করা সম্ভব নয় তা বলছি না, তবে হোম অফিসকে রাজি করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'ঠিক আছে, এদিকটা দেখবো আমি। কিন্তু আপনি বললেন, ডাকাতি করে ধরা পড়বেন—অতো ঝামেলার মধ্যে গিয়ে দরকার কি? হোম অফিস ইচ্ছে করলে এমনিতেই ভুয়া কয়েদী হিসেবে দেখাতে পারে আপনাকে যদি···।'

একটা হাত তুলে ম্যানফ্রেডকে বাধা দিলো রানা। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা জো সলোমনের ডোশিয়ে-র দিকে তাকালো ও। 'ওটা পড়েও লোকটা সম্পর্কে কিছু বোঝেননি? ফটোর দিকে আরেকবার তাকান, চোখ দুটো দেখুন। খবরের কাগজে কি লিখেছে সে-সব ভুলে যান। প্রাক্তন বীরযোদ্ধা, আধুনিক রবিন হুড—ঘোড়ার ডিম! আমার চোখে লোকটা স্রেফ একটা নিষ্ঠুর কসাই, এক প্যাকেট সিগারেটের জন্যে প্রিয় বন্ধুকেও হাসতে হাসতে খুন করতে পারে। তার সেলে আমি থাকবো শুনলেই আমার সম্পর্কে সব জানার চেষ্টা করবে সে। জেল-

খানায় নিশ্চয়ই তার লোক আছে। আমি আসলে ডাকাতি না করেই জেল খাটছি এটা জানতে এক হপ্তার বেশি লাগবে না তার। জেলখানা ভয়ংকর জায়গা, অদ্ভুত সব দুর্ঘটনায় প্রায়ই মারা যাচ্ছে কয়েদীরা—তালিকায় আমার নামটা যোগ হতে অসুবিধে কি?'

'যুক্তির কথা,' মেনে নিয়ে বললেন ম্যানফ্রেড। 'বেশ, তাই হোক তাহলে। কিন্তু তারপর? একই সেলে দু'জন থাকলেন। কাউন্টের লোকেরা সলোমনকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে এলো। আপনি কি করবেন?'

'চেষ্টা করবো যাতে আমাকেও ওরা নিয়ে যায়,' বললো রানা।

'ভাবছেন এভাবে আপনি কাউন্টের কাছে পৌঁছুতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'হাসানের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা-ও আমাকে জানতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ছোট্ট একটা প্রশ্ন করলেন ম্যানফ্রেড, 'কোথায় ডাকাতি করবেন ভেবেছেন কিছু?'

'রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রি-তে।'

'ডাকাতি করার পর পালিয়ে না গিয়ে ধরা পড়তে হবে আপনাকে।'

হেসে ফেললো রানা। 'নির্ভর করছে টাকার পরিমাণের ওপর। টাকা খুব বেশি হলে...।'

'সম্ভবত অজ্ঞাতনামা এক লোক ফোন করে পুলিশকে জানাবে কোথায় পাওয়া যাবে আপনাকে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'আমি আপনার সাফল্য কামনা করি, মিঃ রানা।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ম্যানফ্রেড,' বললো রানা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। 'কিন্তু দুঃখিত, আপনি কোনো শেয়ার পাবেন না!'

হো হো করে হেসে উঠলেন ম্যানফ্রেড। যুবকটিকে তাঁর ভাল লাগলো।

ছয়

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো গার্ড, গেট হাউ-সের দিকে দু'পা এগোলো। সেই ভোর অন্ধকার থেকে ডিউটি দিচ্ছে সে, পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তবে পালাবদলের সময় হয়ে এসেছে, মাত্র দশ মিনিট বাকি। ঘুরলো সে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে লাল একটা ওয়ার্কস ভ্যান খ্যাপা ষাঁড়ের মতো বেরিয়ে এলো গ্যারেজ থেকে। উঠনের ওপর দিয়ে সগর্জনে এদিকেই আসছে।

আঁতকে উঠে সামনে লাফ দিলো গার্ড। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো ভ্যান, কংক্রিটে পিছলে গেল চাকা, খানিকটা এগিয়ে এসে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বনেটের কাছ থেকে গুইং-বার মাত্র এক গজ দূরে। ভ্যানের ক্যাব থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো এক তরুণ। এলোমেলো পা ফেলে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলো সে, মুখে তাজা রক্ত লেগে রয়েছে। তাল হারিয়ে ফেললো সে, ভাঁজ হয়ে গেল একটা হাঁটু। ছুটে এসে তাকে

ধরে ফেললো গার্ড। তরুণকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে সে, গেট হাউস থেকে তার অপর তিন সঙ্গী বেরিয়ে এলো।

তরুণ ড্রাইভার আতংকিত, কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না। গার্ডদের একজন তার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিলো বার কয়েক। চারজনই একসাথে কথা বলছে। কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলো না তরুণ। ঘন ঘন ঢোক গিললো সে, আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়লো, তারপর অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা হাত লম্বা করে দিয়ে মেইন বিল্ডিঙের দিকটা দেখালো ওদের। 'ওয়েজ অফিস!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

ঝট করে বিল্ডিঙের দিকে তাকালো গার্ডরা।

নিস্তেজ হয়ে ওদের হাত থেকে খসে পড়তে শুরু করলো তরুণ। খপ্ করে তাকে আবার ধরে ফেললো গেট গার্ড। 'ছুটে দেখো গিয়ে কি হচ্ছে ওখানে!' সঙ্গীদের বললো সে। 'একে আমি ভেতরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে ফোন করি।'

উঠন ধরে ছুটলো তিনজন। পিছু নিলো অ্যালসেশিয়ানটা। গেট গার্ড আরো শক্ত করে ধরলো তরুণ ড্রাইভারের কাঁধ, বললো, 'তোমার অবস্থা ভালো নয়। এসো, ভেতরে বসবে চলো।'

ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে ড্রাইভার, মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছলো। গার্ডের গায়ে হেলান দিয়ে গেটহাউসে ঢুকলো সে।

গেটহাউসে ঢোকার পর কি ঘটেছে তা আর পরে সঠিক মনে

করতে পারেনি গার্ড। তরুণকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ডেস্কের দিকে এগোয় সে। কোনো শব্দই তার কানে ঢোকেনি। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় খুলির গোড়ায় গর্দানে প্রচণ্ড এক রদ্দা খায় সে। ছিটকে পড়ে যায় মেঝেতে।

সাথে সাথে জ্ঞান হারায়নি গার্ড, তবে তার বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়, চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। একবার একটা আওয়াজ শুনতে পায় সে, মনে হয় সুইং বারটা সরানো হলো। তারপর ভ্যানের শব্দ পায়। শব্দটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। এরপর জ্ঞান হারায় গার্ড।

লণ্ডনের নির্জন পপলার এলাকা, আবাসিক এলাকা হলেও বাড়িঘর এদিকে খুবই কম। সাদা একটা ভ্যান-গাড়ি বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়লো সরু গলিতে। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে ড্রাইভার, জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাড়িগুলো দেখছে। ছোটো একটা দোতালা বাড়ির নম্বর দেখে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ভ্যান। উঠনের এক ধারে গ্যারেজ, সেটারও গেট খোলা।

গ্যারেজে ভ্যান রেখে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠলো তরুণ ড্রাইভার। সিঁড়ির মাথায় দরজাটা বন্ধ। কলিংবেল বাজালো সে।

দরজা খুললো না। আবার কলিং বেল বাজাতে যাবে, এই সময় ভেতর থেকে খসখসে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। পরমুহূর্তে খুলে গেল দরজা।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী। যুবতীর পরনে সাদা সিল্ক-ঘাগরা, ঝলমলে জরির কাজ করা গাঢ় নীল ব্লাউজ। ওড়নাটা হালকা নীল, মাথা ঢাকা দিয়ে ঝুলে আছে মুখের দু'পাশে। যুবতীর রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি-মধুর হাসি, চোখে কৌতুক, দৃষ্টিতে উষ্ণ আমন্ত্রণ।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো রানা। ওর চোখে পলক পড়ছে না।

'কাকে চাই?' যুবতী প্রশ্ন করলো, কণ্ঠ নয় যেন সুর-ঝংকার।

'এই, মানে,' আমতা আমতা করে বললো রানা, 'এটা তো সাতাশ নম্বর বাড়ি, তাই না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' আগন্তুক আড়ষ্টবোধ করছে বুঝতে পেরে উৎসাহ দিলো যুবতী, অভয় দিয়ে হাসলো আবার। 'বলুন কি চাই আপনার?'

তবু ইতস্তত করতে লাগলো রানা। 'মানে, যাকে আমার দরকার তাকেই বলবো··· এখানে একজন আফগান ভদ্রমহিলার থাকার কথা, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনিই তিনি কিনা··· আপনার নামটা জানাবেন কি, প্লিজ?'

'পিয়াসী গুলনার,' বললো যুবতী।

রানার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। 'তাহলে তো আপনিই! আপনার কাছেই এসেছি আমি। আমি···আমি নাহিদ শাহ!'

'ও,' গোলাপি ঠোঁট জোড়া গোল করে তুলে মধুর কটাক্ষ হানলো পিয়াসী গুলনার, 'আপনিই তাহলে নাহিদ শাহ। আগে

বলেননি কেন। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—আমি তো যুগ যুগ ধরে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো পিয়াসী, সসংকোচে ভেতরে ঢুকলো রানা। 'আপনি কি একা... ?'

'না।' জলতরঙ্গের শব্দ তুলে হাসলো পিয়াসী। 'ফ্ল্যাটে আরো একজন রয়েছেন—আপনি!' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকালো সে। 'দরজাটা বন্ধ করে দিন, প্লিজ।'

দরজা বন্ধ করে ঘুরলো রানা। সাজানো একটা ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। আরেক দরজা দিয়ে ভেতরের একটা কামরায় চলে যাচ্ছে পিয়াসী, দোরগোড়া থেকে পিছন দিকে একবার তাকিয়ে ডাকলো, 'এদিকে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোলো রানা। ড্রইংরুম থেকে চলে এলো বেডরুমে। অত্যন্ত রুচিসম্মত এবং বিলাসবহুল আসবাব দিয়ে সাজানো হয়েছে কামরাটা। জানালায় দামী পর্দা। মেঝেতে পুরু কার্পেট। ফোমের বিশাল বিছানায় মখমলের চাদর। চারটে বালিশ। বেশ বড়সড় কামরা, বিছানার উল্টোদিকে একটা সোফা সেট। ইঙ্গিতে সেদিকটা দেখিয়ে পিয়াসী রানাকে বললো, 'বসুন, মিঃ নাহিদ। তারপর বলুন, ঠাণ্ডা নাকি গরম? আপনার জন্যে সব ব্যবস্থাই করা আছে।'

'এক কাপ গরম কফি হলে ভালো হয়।'

নিচু তেপয়ের দিকে ইঙ্গিত করলো আফগান সুন্দরী। তেপয়ে একটা ফ্লাস্ক আর দুটো কাপ রয়েছে। 'হেলপ ইওর-সেলফ, মিঃ নাহিদ।'

নিজের কাপে কফি ঢাললো রানা, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি ?'

'ধন্যবাদ, এইমাত্র খেয়েছি,' বললো পিয়াসী। 'এবার বলুন, আপনার মুখে কি ওটা—রক্ত ?' রানার মুখোমুখি একটা সোফায় বসলো সে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের দাগটা মুছলো রানা। 'হ্বী-না, একেবারে অন্য জিনিস।'

'ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলেন ?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'দেখতেই পাচ্ছেন, বেরিয়েও আসতে পেরেছি।'

পিয়াসীর চোখ জোড়া বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো। 'টাকা নিয়ে ?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আজ সকালে যে পুরনো ফোর্ড ভ্যানটা কিনেছি তাতে আছে।'

'ভ্যানটা ?'

'নিচের গ্যারেজে।'

'আইনও বোধহয় খুব বেশি পিছিয়ে নেই, কি বলেন ? এলো বলে, তাই না ?'

সোফা ছেড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলো রানা, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘাড় মুছতে মুছতে নিচের রাস্তায় তাকালো ও। 'মনে হয় না। টেমসের ওপারে গাড়ি বদল করে এসেছি। সত্যি কথা বলতে কি, শুধু যদি একটা মুখোশ ব্যবহার করতাম, পুলিশের কোনো উপায় ছিলো না খুঁজে বের করে

আমাকে।'

'বিপজ্জনক কথাবার্তা।' ওড়নাটা ভালো করে মাথায় জড়ালো পিয়াসী। 'সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছি, ব্যাপারটা আপনি ম্যানেজ করলেন কিভাবে?'

'সব বলে দিলে কাগজ পড়ে মজা পাবেন না।'

পিয়াসী হাসলো। 'আপনি আমাকে তুমি বললেও পারেন— আমি কিছু মনে করবো না।'

'আমার সৌভাগ্য,' জানালার দিকে পিছন ফিরলো রানা, সারা মুখে শয়তানী হাসি।

'এবার তাহলে যাই,' সোফা ছেড়ে উঠলো পিয়াসী, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফোনটা করে আসি।'

চেহারায় আবেদন নিয়ে তাকালো রানা। 'প্লিজ, আরেকটু সময় দিন।' ফিরে এসে সোফায় বসলো ও। ফ্লাস্ক থেকে কাপে কফি ঢাললো আবার। 'একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না।'

'না, কি মনে করবো!' পিয়াসী মুক্তোর মতো দাঁত বের করে মৃদু হাসলো। তার চোখে ঝিক্ করে উঠলো কৌতূহল। ধীরে-ধীরে আবার সোফায় বসলো সে।

'আপনি না, মানে তুমি না··· ।'

'জানি,' বললো পিয়াসী, মুচকি হাসলো, তারপর হাতচাপা দিলো ঠোঁটে। 'আমি খুব সুন্দরী।'

'বুঝলাম সব পুরুষই এই কথাটা তোমাকে বলে, শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তোমার।' রানা গম্ভীর।

'কিন্তু কথাটা সত্যি—তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখেছি আমি।'

'কথাটা বোধহয় সব মেয়েকেই বলা হয়, তাই না?' রানাকে খোঁচা মেরে আনন্দ পাচ্ছে মেয়েটা।

'তুমি আমাকে অপমান করছো!' শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার।

'অপমান বোধ করায় প্রমাণ হয়ে গেল অভিযোগ মিথ্যে নয়!' পিয়াসী শব্দ করে হেসে উঠলো। আবার দাঁড়ালো সে।

'কি হলো?'

'ফোন করতে হবে না?'

কাতর চোখে তাকালো রানা। 'এখুনি না করলেই নয়?'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো পিয়াসী। 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, মানে, যদি অনুমতি পাই।'

দাঁড়িয়ে থেকেই মেয়েটা বললো, 'বলুন, অনুমতি দিলাম।'

'আপনাকে না—মানে, তোমাকে না আমি…।'

'জানি। ভালোবেসে ফেলেছেন।'

'যুগ-যুগান্ত ধরে শুধু তোমাকেই আমি স্বপ্নে…।'

রানার সামনে দিয়ে এগোলো আফগান সুন্দরী। খপ্ করে রানা তার একটা হাত ধরে ফেললো।

'আহ্ ছাড়ো, কী অসভ্যতা করছো!' বললো বটে, কিন্তু হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে তেমন জোর খাটালো না।

করুণ আবেদনের দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকালো রানা। 'তোমার বদলে এখানে কোনো পুরুষমানুষ বা কোনো অসুন্দরী

থাকলে সমস্যাটা দেখা দিতো না, পিয়াসী। ভেবে দেখো, কতো দিনের জন্যে বন্দী জীবন কাটাতে হবে আমাকে। আবার কবে বেরুতে পারবো জানি না। তুমি আমার মানসপ্রিয়া, বিদায় মুহূর্তে মনে রাখার মতো কিছু একটা দেবে না—তা যদি মধুর কোনো স্মৃতি হয়, জেলখানায় বসে স্মরণ করে পুলকিত হবো।'

'ইস, কি আবদার!' রানার মাথার দু'পাশে হাত রেখে কাছে টানলো পিয়াসী, মাত্র একবার চুমো খেলো ঠোঁটে, তারপর ছেড়ে দিলো। 'আপাততঃ এর বেশি কিছু দেয়া গেল না। বাকি ভালোবাসাটুকু কবিতা, চাঁদ, আর ফুলের কাছে গচ্ছিত রাখলাম। আবার তুমি ফিরে এলে…।'

'যদি কখনো ফিরে না আসি?'

তাড়াতাড়ি রানার মুখে হাতচাপা দিলো পিয়াসী। 'অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনবে না!'

ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখালো রানা। 'খানিকটা সময় ওখানে কাটাবার কোনো উপায়ই তাহলে নেই? তোমার সিদ্ধান্তে তুমি অটল?'

চোখ ভিজে গেছে সোহানার। 'পাগলামি করে না, লক্ষীটি!' জোর করে হাসলো সে। পরমুহূর্তে অস্থিরভাবে রানার মাথাটা বুকের মাঝখানে চেপে ধরলো। 'মিঃ ম্যানফ্রেড ব্যবস্থা করতে পারলে ভিজিটিং ডে-তে তোমাকে আমি দেখে আসবো।'

হঠাৎ রানাকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোলো সোহানা। সোফা ছেড়ে উঠলো রানা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে

রানা-১৪৫

লিপস্টিকের দাগ মুছলো। তারপর বন্ধ করে দিলো দরজা।

এখন ওর আর কিছু করার নেই, ওদের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। বালিশের নিচে রিভলভারটা রেখে জানালার ধারে, বিছানার ওপর বসলো ও। নিচের রাস্তাটা দেখলো কিছুক্ষণ। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথা রাখলো বালিশে।

বিশ মিনিটও পেরোয়নি গাড়ির আওয়াজ পেলো রানা। শুয়েই থাকলো ও, জানালা দিয়ে উঁকি দিলো না। তারপর আর কোনো শব্দ নেই। ত্রিশ সেকেণ্ড পর বিছানা থেকে নেমে ড্রইংরুমে চলে এলো ও।

আরো ত্রিশ সেকেণ্ড পর ড্রইংরুমের বাইরে, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে নড়াচড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ হলো। দরজায় নক হলো মৃদু। মিসেস বাটার, বাড়িওয়ালি, বেসুরো কিন্তু আদুরে গলায় ডাকলো, 'ভেতরে আছেন নাকি, মিঃ শাহ?'

সাথে সাথে নয়, তিন সেকেণ্ড পর বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কি চাই আপনার?'

'আপনার একটা চিঠি আছে। আপনি যখন বাইরে ছিলেন তখন এসেছে।'

'একটু অপেক্ষা করুন।'

গভীর একটা শ্বাস টানলো রানা, শক্ত করে নিলো পেশী। তারপর তালা খুললো দরজার। শরীরের ওপর বিস্ফোরিত হলো ভারি কবাট, স্রোতে পড়া খড়কুটোর মতো ভেসে গেল রানা। শুধু কবাটের ধাক্কা নয়, ওকে ঠেলে নিয়ে এলো প্রকাণ্ডদেহী

চারজন পুলিশ। পাঁচজন একযোগে আছাড় খেলো একটা লম্বা সোফার ওপর, সোফাটা সরব প্রতিবাদের সাথে ভেঙে গেল।

ধস্তাধস্তির ভান করতে হলো রানাকে। তবে বেশিক্ষণ নয়, একটু পরই ওর হাতে হাতকড়া পড়লো। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো ওকে।

তাল গাছের মতো লম্বা, হাসিখুশি চেহারার এক লোককে, দেখা গেল দোরগোড়ায়। ভেতরে ঢোকার আগে চৌকস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরালো সে। সাদা পোশাকে জাঁদরেল অফিসার। পরনে গ্যাবার্ডিন রেনকোট। ভেতরে ঢুকে রানার সামনে দাঁড়ালো সে। আপাদমস্তক দেখলো ওকে। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো এদিক ওদিক। বললো, 'বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে এরকম বোকামি করার কোনো মানে হয়? দেশী কাঙাল ভাত পায় না, আর তুমি কিনা...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে, তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, 'লক্ষ্মী ভাই, চটপট বলো দেখি, কোথায় রেখেছো টাকাগুলো?'

'এগারো তলার ছাদে উঠে নিচে লাফ মারছো না কেন?'

'লণ্ডনে অনেক দিন আছো। শুধু ডাকাতি নয়, চ্যাটাং চ্যাটাং কথাও শিখেছো। শুধু শেখোনি কি রকম মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হয়। দিলো তো ফাঁসিয়ে!'

আক্রোশে রানার গাল ফুলে উঠলো। মনে মনে একটা ক... ভেবে একটু দুঃখই হলো ওর, যারা অস্কার দেয় এক্সপ্রেশনটা তাদের দেখানো গেল না। 'কি বললে! কে ফাঁসিয়ে দিয়েছে?'

'একটা অজ্ঞাতনামা মেয়ে। থানায় টেলিফোন করেছিল

অফিসারের চোখে সহানুভূতি। 'কিন্তু টাকাটা কোথায় তা সে জানে না। বা জানলেও বলেনি। কোথায়, মিঃ শাহ?'

হুপদাপ পায়ের শব্দ হলো সিঁড়িতে, ঝড়ের বেগে একজন কনস্টেবল ঢুকলো ড্রইংরুমে। 'টাকা পাওয়া গেছে, ইন্সপেক্টর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'একটা ফোর্ড ভ্যানের ভেতর!'

রানার দিকে ফিরলো ইন্সপেক্টর, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'পৌনে দু'লাখ পাউণ্ড, কি উপকারে লাগলো?'

'পরে জানাবো,' বললো রানা। 'চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে।'

'সেজন্যে প্রচুর সময় পাবে তুমি, আন্দাজে ভুল না হলে অন্তত সাত বছর।' কনস্টেবলদের দিকে তাকালো অফিসার। 'দেরি কিসের? এখান থেকে নিয়ে যাও ওকে।'

সবিনয়ে হাসলো রানা। 'কোর্টে আবার দেখা হবে, ইন্স-পেক্টর।'

সাত

ফ্রাইডেথর্প জেলখানার গভর্ণর কলম নামিয়ে রেখে ডেস্ক ল্যাম্প জ্বাললেন। আটটা বেজে কয়েক মিনিট, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। বাঁ হাত মুখের কাছে তুলে সিগারেটে টান দিলেন তিনি, তারপর ছাইদানিতে ফেলে নেভালেন সেটাকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে এলেন জানালার সামনে। উপত্যকার শেষ মাথায় সার সার উঁচু পাহাড়, দিনশেষের রাঙা আলো পড়ায় চূড়াগুলো মশালের মতো জ্বলছে।

পিছনে, দরজায় নক হলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন গভর্ণর। প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকার ঢুকলো ভেতরে, তার হাতে একটা বড়সড় এনভেলাপ। প্রিজন অফিসার কি বলতে এসেছে আন্দাজ করতে পারলেন গভর্ণর। জানালার কাছ থেকে সরে এসে আবার তিনি বসলেন ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায়।

'তোমার হাতে কি ওটা, বুকার?'

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, স্যার,' বললো ডানিয়েল

বুকার। 'আমাদের নতুন কয়েদী নাহিদ শাহ পৌঁচেছে—বলে-ছিলেন, লোকটা এলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে একবার তাকে দেখতে চান।'

'বলেছিলাম নাকি? বলতে পারি। সে কি বাইরে?'

মাথা ঝাঁকালো ডানিয়েল বুকার। 'জ্বী, স্যার। ডাকবো?'

'কি রকম লোক সে?'

কাঁধ ঝাঁকালো প্রিন্সিপাল অফিসার। 'আমি বলবো বিপথ-গামী ভদ্রলোক। এনভেলাপ খুলে গভর্ণরের সামনে ডকুমেন্ট-গুলো রাখলো সে। 'কেসটার কথা আপনার মনে থাকতে পারে, স্যার। সে-সময় সব ক'টা কাগজে খবর বেরিয়েছিল। পৌনে দু'লাখ পাউণ্ড ডাকাতি করে প্রায় পালিয়েই গিয়েছিল বলা চলে।'

'যতো দুর মনে পড়ছে, অজ্ঞাতনামার ফোনকল পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।'

'জ্বী, স্যার, তাই। আফগানরা এমনিতে খুব হাসিখুশি আর ভদ্রলোক, নাদির শাহ বরং আরো এক কাঠি বাড়া। শান্তশিষ্ট, বিনয়ের অবতার। এই লোক যে কি করে ডাকাত হলো মাথায় আসে না।'

'কোথায় যেন করেছিল ডাকাতিটা?'

'রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিতে,' বললো বুকার। 'এটাই তার প্রথম ক্রাইম নয় অবশ্য। এঞ্জিনিয়ার, অথচ এক সময় ভাড়াটে সৈনিক হিসেবেও কাজ করেছে—সালভাদরে, ইয়ামেনে। ইং-ল্যাণ্ডে আছে অনেক বছর, নাগরিকত্ব পেয়েছে তিন বছর আগে।

মাঝখানে বেশ কিছুদিন দক্ষিণ আমেরিকাতেও ছিলো—কি করছিল জানা যায়নি। আফগান সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলো, টাকা পয়সা এদিক সেদিক করায় চাকরি হারায়। পরে, ইংল্যাণ্ডে আসার পর, কয়েকটা ডাকাতি কেসে তাকে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু নিরেট অ্যালিবাই থাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দেয় পুলিশ, গ্রেফতার করেনি।'

গভর্ণর গম্ভীর হলেন। 'মুগ্ধ হবার মতো কিছু নয়,' বললেন তিনি। 'তবু, বুদ্ধিমান লোক, পেটে বিদ্যে আছে। ভাবছি ওকে জো সলোমনের সাথে রাখলে কেমন হয়।'

বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো বুকার। 'কেন জিজ্ঞেস করতে পারি, স্যার?'

চেয়ারে হেলান দিলেন গভর্ণর। 'সত্যি কথা বলতে কি, সলোমনের ব্যাপারে আমি খুব উদ্বেগের মধ্যে আছি। সেই যখন থেকে তার স্ট্রোক হলো। আগে বা পরে আবার স্ট্রোক হবে তার—নিয়ম, হতেই হবে—তখন কিন্তু তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দরকার হবে। কি ঘটবে কল্পনা করতে পারো, হঠাৎ যদি মাঝরাতে অ্যাটাকটা হয়? যদি মারা যায়?'

'আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন, স্যার। সে-ধরনের কিছু ঘটবে না। কেন, প্রতি ঘন্টায় চেক করা হচ্ছে না ওকে?'

'এক ঘন্টা অনেক সময়, বুকার। ষাট মিনিটে কতো কিই-না ঘটতে পারে।'

'ওকে দেখে কি স্যার মনে হয় যে হঠাৎ মারা যাবে?'

'স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, এ-সবের খারাপ দিক তো এটাই—

আগে থেকে কিছু টের পাওয়া যায় না।' মাথা নাড়লেন গভর্ণর, 'উহুঁ, তুমি যাই বলো, এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। আর সমাধান হলো, সলোমনের একজন সেল-মেট। একই প্রকৃতির দু'জন লোককে একই সেলে রাখা ঠিক হবে না, একজন খুন হয়ে যেতে পারে। অথবা দু'জনের গলায় গলায় ভাব হয়ে যেতে পারে, তারপর এক হয়ে যাওয়া দুটো মাথা থেকে কুমতলব গজাবে।' চোখ তুলে প্রিন্সিপাল অফিসারের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমার তো মনে হয়, সলোমনের সেল-মেট হবার জন্যে নাহিদ শাহ আদর্শ কয়েদী।' বুকারকে আর কোনো আপত্তি প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি আবার তিনি বললেন, 'কই, ডাকো, দেখি চেহারাটা কেমন।'

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো বুকার। 'অ্যাটেনশন, ল্যাড,' হুংকার ছাড়লো সে। 'চেহারায় তাজা একটা ভাব আনো। ভেতরে এসে ম্যাটে দাঁড়াও, তারপর নাম আর নম্বর বলো।'

রাবার ম্যাটটা ডেস্ক থেকে ঠিক তিন ফিট দূরে রাখা হয়েছে। দ্রুত কামরায় ঢুকলো কয়েদী, ম্যাটের ওপর দাঁড়ালো। 'তিরাশি হাজার এক শো উনত্রিশ, নাহিদ শাহ, স্যার,' বললো রানা, টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। ডেস্ক ল্যাম্পের আলো পড়লো ওর মুখে, চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখলেন গভর্ণর। ছোটো করে ছাঁটা চুল খুলি কামড়ে বসে আছে, পরনে ডোরাকাটা কয়েদীর পোশাক, ব্যায়ামপুষ্ট মেদহীন শরীর—সব মিলিয়ে চেহারায় মধ্যযুগীয় যোদ্ধার একটা ভাব এনে দিয়েছে। রীতিমতো বিস্মিত

হলেন গভর্নর। কয়েদীকে মোটেও শিক্ষিত বা ভদ্র মনে হলো না তাঁর। বরং মনে হলো, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা চরিত্র, এর দ্বারা যে-কোনো নিষ্ঠুর কাজ সম্ভব। ভুরু কুঁচকে ডকুমেন্ট-গুলোর ওপর চোখ রাখলেন তিনি।

তিন মাস হলো জেল খাটছে রানা—কাগজে কলমে। আসলে সব মিলিয়ে দিন পনেরো বন্দী-জীবন কাটাতে হয়েছে ওকে, বিভিন্ন জেলখানায়। যেখানেই গেছে ও, একটা করে গোলমাল পাকিয়েছে, ফলে আরেক জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। হোম অফিসের নির্দেশ ছিলো, কোথাও গোলমাল করলে সেখানে ওকে রাখা চলবে না। বাকি আড়াই মাস স্বাধীন জীবন কাটিয়েছে ও, অত্যন্ত গোপনে।

সময়টা হেলায় নষ্ট করেনি রানা। লণ্ডন অফিসে বসে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা রানা এজেন্সির ঊনসত্তরটা শাখার সাথে যোগাযোগ করেছে। সব শাখাতেই কিছু কেস অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে থাকে, সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। চাকরির আবেদনগুলো বিবেচনা করেছে। কয়েক শো স্টাফের সুবিধে-অসুবিধে আর সুখ-দুঃখ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। বদলির দরখাস্তগুলো পড়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এরকম আরো কতো কাজ। আড়াইটা মাস হঠাৎ যেন ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল, টেরও পায়নি। টের পেলো যেদিন গোপন খবর এলো, ফ্রাইডেথর্প জেলখানায় যেতে বলা হয়েছে ওকে। জো সলোমন নাকি কেমন যেন একটু অস্থির।

'ছ' বছর,' রেকর্ড কার্ড থেকে চোখ তুললেন গভর্নর। 'তার-

মানে চার বছর, যদি কোনো গোলমালে না জড়িয়ে পুরো রেমিশন পাও।'

'ইয়েস, স্যার।'

চেয়ারে হেলান দিলেন গভর্ণর। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালেন। 'তা, এই প্রথম জেল খাটছো, লাগছে কেমন?'

'ভালো, স্যার।'

'ভালো?' বিস্মিত হলেন গভর্ণর।

'জী, স্যার,' বললো রানা। 'যেখানেই গেছি, সবাই আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে।'

'তাহলে সবখানে গোলমাল পাকিয়েছো কেন? কেন তোমাকে পাঁচবার বদলি করা হয়?'

হেসে উঠলো রানা। সাথে সাথে প্রিন্সিপাল অফিসার কড়া ধমক লাগালো। 'গভর্ণরের সামনে দাঁত বের করছো?' তার চোখ কপালে উঠে গেছে।

'শুনতে দাও কি বলে ও,' গভর্ণর বললেন, তারপর রানার দিকে তাকালেন। 'বলো।'

'বাইরে থাকতে শুনেছিলাম জেলখানা আর নরকের মধ্যে নাকি কোনো পার্থক্য নেই,' বললো রানা। 'কিন্তু ভেতরে ঢুকে উল্টোটাই দেখলাম। সবাই আমাকে খাতির করে। হিসাব মেলাতে পারলাম না। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হলো। ভাবলাম, যদি পায়ে পা দিই তাহলেও কি ওরা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে? যেই ভাবা সেই কাজ…'

দাঁতে দাঁত চেপে প্রিন্সিপাল অফিসার বিড়বিড় করে বললো,

'আরে, এ যে দেখছি আজব এক চিড়িয়া!'

গভর্ণর একটা হাত তুললেন। 'থাক, আর শুনতে চাই না,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। 'সত্যি কথা বলতে কি,' তোমার মতো শিক্ষিত, গুণী একজন মানুষের এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে আমার ধারণা, তোমাকে আমরা সাহায্য করতে পারবো। কিন্তু একই সাথে নিজেকে তোমার সাহায্য করতে হবে। চেষ্টা করতে চাও?'

তিক্ত কণ্ঠে রানা বললো, 'নিজেকে সাহায্য করতে গিয়েই তো আজ আমার এই অবস্থা, স্যার!'

মুখে হাতচাপা দিলো প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার। কয়েদী ঠাট্টা করলেও, কথাটা অতি কঠিন সত্য বটে।

'কিন্তু এখানে নিজেকে সাহায্য করার একমাত্র উপায় হলো আমাকে সাহায্য করা,' গভর্ণর বললেন। 'তোমাকে আমি জো সলোমন নামে এক লোকের সাথে রাখছি।'

'ইয়েস, স্যার।'

'জো সলোমন দীর্ঘ মেয়াদে জেল খাটছে, কিছুদিন আগে তার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে,' গভর্ণর বললেন। 'সবাই জানি, আবার তার স্ট্রোক হতে পারে। কখন হবে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু রাতে হলেই বিপদ। বিশেষ করে এই রাতের জন্যেই ওর সেলে রাখা হচ্ছে তোমাকে। তেমন কোনো লক্ষণ দেখলেই সাথে সাথে ডিউটি অফিসারকে রিং করবে তুমি। যতোটুকু জানি, এ-ধরনের রোগীদের জীবন-মরণ নির্ভর করে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা পাবার ওপর। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো তো?'

'ইয়েস, স্যার। পারফেক্টলি, স্যার।' রানার ইচ্ছে হলো ডেস্কের ওপর ঝুঁকে গভর্ণরের কানে কানে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি সব জানেন, জেনেশুনে ভান করছেন?'

'সলোমন মেশিনশপে কাজ করে, তাই না, মিঃ বুকার?' জিজ্ঞেস করলেন গভর্ণর।

'জী, স্যার। গাড়ির নাম্বার প্লেট বানায়।'

'তোমাকেও মেশিনশপে পাঠাচ্ছি আমরা,' রানাকে বললেন গভর্ণর। 'ট্রেনিঙে থাকো, দেখা যাক কাজটা তোমার ভালো লাগে কিনা। কি রকম করো সেদিকে আমার একটা চোখ থাকবে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গভর্ণর—ইন্টারভিউ শেষ। রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কর্কশ কণ্ঠে হুংকার ছাড়লো প্রিন্সিপাল অফিসার, 'আউট, বয়!'

করিডরে বেরিয়ে এলো ওরা।

এখানে আসার আগে পাঁচটা জেলখানায় দু'তিন দিন করে ছিলো রানা। সব ক'টা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি করা, পুতিগন্ধময় পরিবেশ, আলো-বাতাসহীন অন্ধকার সেলে গরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি করে থাকতে হয়েছে নোংরা কয়েদীদের সাথে। আধুনিক জেলখানার কোনো রকম সুবিধে চোখে পড়েনি।

ফাইভেথর্প তৈরি হয়েছে মাত্র দু'বছর হলো। এক বিন্দু মাটি নেই কোথাও, সবটুকু কংক্রিট। ঝকঝক তকতক করছে। এয়ার-

কণ্ডিশন তো আছেই, সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের সাহায্যে গোটা জেলখানা গরম রাখা হয়। জানালা নেই, অথচ বাতাসের অভাবে ছটফট করতে হয় না।

প্রিন্সিপাল অফিসারের পিছু পিছু সেন্ট্রাল হলে ঢুকলো রানা। সারি সারি কাঠের বেঞ্চ ফেলা রয়েছে, বেঞ্চের সামনে লম্বা টেবিল, টেবিলে পত্র-পত্রিকা। একটা দরজা দিয়ে লিফটে চড়লো ওরা। কোথাও না থেমে দশ তালায় উঠলো লিফট। ছোটো একটা কংক্রিট ল্যাণ্ডিঙে বেরিয়ে এলো ওরা। সাদা, লম্বা একটা করিডর দেখতে পেলো রানা, একটা স্টীল গেট ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

গেটের সামনে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। তারপর অদৃশ্য কোনো ইঙ্গিতে আপনা থেকেই খুলে গেল গেট, কোনো শব্দ হলো না। ভেতরে ঢুকলো ওরা। আবার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল গেট।

ঘাড় ফিরিয়ে গেটের দিকে তাকালো রানা, পাশ থেকে প্রিন্সিপাল অফিসার জিজ্ঞেস করলো, 'অবাক লাগছে?'

মুগ্ধ হবার ভান করলো রানা, কিছু বললো না।

'ইলেকট্রনিক সিস্টেম, রিমোট কন্ট্রোল,' বললো বুকার। 'জেলখানার শেষ মাথায়, একতালায়, কন্ট্রোল সেন্টারে বসে আছে এক লোক, বোতামে সে-ই চাপ দিয়েছে। চুয়াল্লটা টিভি স্ক্রীনে চোখ রেখে পাঁচজন বসে আছে ওরা, পালা করে ডিউটি করছে। গভর্ণরের কামরা থেকে বেরুবার পর থেকে সারাক্ষণ স্ক্রীনে আছি আমরা।'

কিছু একটা বলা দরকার। 'বিজ্ঞানের তেলেসমাতি!'

'ফ্রাইডেথর্প থেকে কেউ পালাবে সেটি হবার নয়—কথাটা মনে রেখো,' করিডর ধরে এগোতে শুরু করে বললো বুকার। 'ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মতো থাকো, দেখবে সবাই তোমার সাথে ভদ্র ব্যবহার করছে। দাপট দেখাবার চেষ্টা করেছো কি মরেছো, ঠাস করে আছাড় খাবে।'

ঠাস? শুনে হাসি পেলো রানার।

করিডরের শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে থামলো ওরা। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললো বুকার।

বড়সড় সেল, আরো ছোটো আশা করেছিল রানা। জানালা নেই, তবে ইঞ্চি কয়েক চওড়া আর ফুট দুয়েক লম্বা ফাটল দেখা গেল তিনটে, চকচকে আর্মার গ্লাস দিয়ে মোড়া—মানুষ গলার প্রশ্নই ওঠে না। এক কোণে একটা ওয়াশ বেসিন আর টয়লেট।

দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটো বিছানা। একটায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছে জো সলোমন। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ওদেরকে দেখলো সে, বসলো না।

'তোমার একজন সেল-মেট পাওয়া গেছে,' সলোমনকে বললো প্রিন্সিপাল অফিসার। 'গভর্ণর ভয় করছেন, কোনো নোটিশ না দিয়ে আচমকা তুমি পটল তুলতে পারো। সাবধানের মার নেই, তাই তোমার সাথে একজনের থাকার ব্যবস্থা করা হলো।'

'বুড়ো ভামটার দেখছি আমার ওপর দরদ আছে!' রানার দিকে ভুলেও তাকালো না সলোমন। 'জানা ছিলো না।'

'মুখ সামলে কথা বলো, সলোমন।'

'আর আপনি সামলান ঠোঁট, মিঃ বুকার,' বাঁকা হেসে বললো সলোমন। 'আপনার ঠোঁটের কোণ থেকে সরু একটা লালার সুতো নামছে, সত্যি বলছি। আরেক কোণে ফেনা, ফর গডস সেক!'

সলোমনের দিকে ঝট্ করে এক পা এগোলো প্রিন্সিপাল অফিসার। তাড়াতাড়ি উঠে বসলো সলোমন, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত তুললো। 'ভুলে যাবেন না আমি অসুস্থ।'

'সত্যিই তাই, তুমি অসুস্থ—মনে ছিলো না,' সহজভাবে হাসলো বুকার। 'লোকে তোমাকে খাতির করতে পারে, সলোমন, তাদের কাছে তুমি বিরাট একটা কিছু হতে পারো, কিন্তু আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে তোমাকে নেহাতই ক্ষুদে দেখায়। যতোবার তোমার দরজায় তালা মারি হাসির ঠেলায় পেটে আমার খিল ধরে যায়।'

অকস্মাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো সলোমনের চোখ জোড়া। বাঁকা হাসি অদৃশ্য হলো। আশ্চর্য স্থির হয়ে থাকলো সমস্ত শরীর। তার মুখের হিংস্র ভাব লক্ষ্য করে গা শির শির করে উঠলো রানার। এই মুহূর্তে লোকটা মানুষ খুন করতে পারে।

'চমৎকার,' বললো বুকার। 'ভারি চমৎকার।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সেল থেকে বেরিয়ে গেল সে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'বাস্টার্ড!' বন্ধ দরজার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো সলোমন। ধীরে ধীরে তার পেশীতে ঢিল পড়লো। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো। 'তুমিই তাহলে নাহিদ শাহ? সাত দিন থেকে শুনছি তুমি আসছো।'

'আসলেও দেখছি বাতাসের আগে খবর রটে যায়।' নিজের বিছানার কিনারায় বসলো রানা।

'রটবে না! সবাই মিলে বিরাট একটা সুখী পরিবার আমরা। এখানে তোমার ভালো লাগবে—কি চাও যা তুমি পাবে না? সেন্ট্রাল হিটিং, এয়ার কণ্ডিশনিং, টেলিভিশন—দরকার ছিলো শুধু খানিকটা আভিজাত্যের, তুমি আসায় সে অভাবও আর থাকলো না।'

'মানে!'

'ভান করো না, ভায়া। সবাই সব কিছু জানে তোমার সম্পর্কে। ক্যাপ্টেন ছিলে, ঠিক! তোমার পেশা ছিলো যুদ্ধ। সেলাম, ভায়া, সেলাম। বলছো, এতো সব জানলাম কিভাবে। তুমি যখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, আমরা তখন তোমার ইতিহাস মুখস্থ করছি।'

'তোমার সম্পর্কেও পড়া আছে আমার।'

মেঝেতে পা ঝুলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সলোমন। 'আমার সম্পর্কে?' ভুরু কুঁচকে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকালো সে। 'কোথায়?'

'বইটার নাম গ্রেট ক্রাইমস অভ দ্য সেঞ্চুরী। গত বছর বেরিয়েছে। পিটারফিল্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতির ওপর পুরো একটা পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে। দাঁড়াও, লেখকের নামটা স্মরণ করি...।'

অবিশ্বাসের জায়গায় সলোমনের চেহারায় কৌতুক ফুটে উঠলো।

'মনে পড়েছে—কারসন, কারসন রস,' বললো রানা।

'ব্যাটা একটা ভাঁড়,' তাচ্ছিল্যের সাথে বললো সলোমন।
'ও কি লিখবে শুনি? সিকি ভাগও তো জানে না।'

'সিকি ভাগই বা জানলো কিভাবে?'

'হোম অফিসের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমার সাথে দেখা করেছিল। প্রায় সবটুকুই বলেছিলাম তাকে আমি, কিন্তু লিখতে জানলে তো! প্ল্যানিঙের সবটুকু কৃতিত্ব দিয়ে বসলো রিড কোয়েনকে, উজবুক আর কাকে বলে! প্ল্যান একটা কোয়েন করেছিল বটে, কিন্তু সেটা আমরা মানিনি—কাজেও লাগাইনি।'

'তাহলে তোমার প্ল্যান মতোই কাজটা হয়?'

'অবশ্যই,' কাঁধ ঝাঁকালো সলোমন। 'কোয়েনকে আমার দরকার ছিলো। এটা আমি স্বীকার করি। ও ডাকোটা চালাতে জানতো, সেজন্যেই ওকে নেয়া।'

'আর জন হেরিক?'

'কি করতে হবে বলে দিলে স্রেফ জাদু দেখিয়ে দেবে, তা না হলে কাঠের পুতুল।'

'রিপ হটন?'

'উপস্থিত বুদ্ধি ভালোই, কিন্তু দূরদৃষ্টির ভয়ানক অভাব।'

'কোনো ধারণা আছে এখন তারা কোথায়?'

'ঘটে যদি কোনো বুদ্ধি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো সী-বীচে সুন্দরীদের নিয়ে রোদ পোহাচ্ছে আর টাকা ওড়াচ্ছে।'

'নিজের ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না,' হাসলো রানা। 'ঠিক এই মুহূর্তে ওরা হয়তো তোমাকেও দলে টানার বুদ্ধি করছে।'

ভাষাহীন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো সলোমন। 'কি বললে? আমাকে বের করে নিয়ে যাবে? ফ্রাইডেথর্প থেকে?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে। 'আফগান যুবক, শেখার এখনো অনেক কিছু বাকি আছে তোমার। এখান থেকে একটা ইঁদুর বেরুতে পারে না, কেউ তোমাকে বলেনি?'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিলো সলোমন।

'টেলিভিশন ক্যামেরা আর ইলেকট্রনিক গিয়ার আছে এখানে। রিইনফোর্সড কংক্রিট দিয়ে বিশেষ দেয়াল আর পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, ভিতগুলো বিশ ফিট গভীর। কেউ যাতে টানেল বানাতে না পারে,' আক্ষেপের সাথে মাথা নাড়লো সলোমন। 'শুধু শুধু ফ্রাইডেথর্পকে নিশ্ছিদ্র খাঁচা বলা হয়? কেউ আজ পর্যন্ত পালাতে পারেনি এখান থেকে।'

'তা না পারুক,' বললো রানা। 'কিন্তু পালাবার রাস্তা আসলে ঠিকই একটা না একটা থাকে।'

'আমাদের ভাগ্যে তাহলে কি জুটলো আজ? দুর্লভ একটা প্রতিভা?'

'যথেষ্ট দুর্লভ।'

'কিন্তু সে প্রতিভা রুথম্যান মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিতে কোনো কাজে আসেনি। তা না হলে তুমি এখানে কেন?'

'কাজে আসেনি মানে?' কঠিন চোখে তাকালো রানা, যেন ওর কৃতিত্বটাকে ছোটো করে দেখায় রাগ হয়েছে। 'কেন, টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসিনি আমি? ধরিয়ে দিলো তো হারামজাদী

মেয়েটা···।'

'আর বলো না, ভাই!' উরুতে চটাস করে চাপড় মারলো সলোমন। 'এই মেয়ে জাতটা সর্বনাশ করে ছাড়লে! যেখানে যতো ব্যর্থতা দেখবে, খোঁজ নাও, ঠিক একটা মেয়ে রয়েছে তার পেছনে। পুরুষরা অবশ্য কম নয়, লাই দিয়ে একেবারে মাথায় চড়িয়ে রাখে। এই একটা দুর্বলতা থেকে আমি ভাই একেবারে মুক্ত।' হঠাৎ গলা খাদে নামালো সে, যেন গোপন কোনো তথ্য ফাঁস করছে। 'তারমানে আবার ধরে নিয়ো না আমার ওসব কিছু নেই! হাঃ হাঃ হাঃ! স্রেফ লোহা, ডিয়ার ফ্রেণ্ড, স্রেফ লোহা। কিন্তু ওর সাথে মন বা হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার নীতি হলো—ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। গোপন কথা বন্ধুকে বলতে পারি, একটা মেয়েকে কেন বলতে যাবো?'

'তোমাদের ধরা পড়ার কারণও তো আসলে একটা মেয়ে, তাই না?'

'শুনলে বিশ্বাস করবে, মেয়েটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিল কোয়েন? বারো বছর পর মেয়েটা ধিঙ্গি হলো। কোয়েন ভাবলো, এবার শালীকে নিয়ে মৌজ করবো। কিন্তু তা কি হয়! মেয়েটা যে কোয়েনকে বাপ বলে ভাবতো। ডাকাতি করার পর কোয়েনের ফুর্তি ধরে না, একরাতে পালিত কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বসলো। সকালে বাজারে যাবার নাম করে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলো মেয়েটা।'

'কিন্তু টাকাগুলো পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।'

'সেই আনন্দেই তো এখনো হাসতে পারি, দোস্ত।' নিঃশব্দে

হাসলো সলোমন। 'ভোগ করতে পারি বা না পারি, আমার টাকা আমারই আছে।'

হঠাৎ মন খারাপ করে মেঝের দিকে তাকালো রানা। দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা। 'আমার কপাল পুরোটাই ফাটা। টাকা-টাও হারালাম, ধরাও খেলাম।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সলোমনের নিষ্ঠুর চেহারায় একটু যেন কোমল ভাব ফুটলো। বিশটা সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে রানার দিকে ছুঁড়লো সে। 'মন খারাপ করো না তো,' বললো সে। 'আর কেউ না জানুক, আমি জানি রুথম্যান থেকে পৌনে দু'লাখ পাউণ্ড নিয়ে বেরিয়ে আসা স্রেফ অসাধ্য সাধন। ধরা পড়ে গেছো তার কারণ তোমার অ্যামেচার স্ট্যাটাস। আরেকটু যদি কৌশলী হতে পারতে, বাজি মেরে দিয়েছিলে।'

কোল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে রানা বললো, 'তুমি বোধহয় এখানে খুব আরামেই আছো।'

আহ্লাদের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সলোমনের চেহারা। 'আমার কোনো অভিযোগ নেই। সিগারেট? যতো খুশি পেতে পারি। কিভাবে, জিজ্ঞেস করো না। কেউ ধোঁয়া গিলতে চাইলে তাকে আমার কাছে আসতে হবে। বুড়ো নরটন আমার কাছে পাঠিয়েছে তোমাকে, ওর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'উনি বললেন তুমি নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। সিরিয়াস?'

'বেশ কিছু দিন হলো একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। সিরিয়াস কেন হতে যাবে।' কাঁধ ঝাঁকালো সলোমন। 'এমন তো অনেক

মানুষেরই হয়।'

'তোমার শরীর নিয়ে তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। হঠাৎ রাতের বেলা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো। এতোই যখন ভয় পাচ্ছেন, তোমাকে হাসপাতালে পাঠালেই তো পারেন।'

কর্কশ একটা শব্দ করলো সলোমন। 'হোম অফিস অনুমতি দিলে তো! ওদের ভয়, আমার টাকার ওপর হাত দেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে লণ্ডন গ্যাংগুলো হাসপাতাল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে।' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'না হে, কোথাও যাওয়া-যাওয়ি আমার কপালে নেই। ক্রাইডেথর্পই আমার ঠিকানা।'

'আরো পনেরো বছরের জন্যে?'

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে মৃদু শব্দে হাসলো সলোমন। 'সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। ধরাও, তারপর আমাকে একটা দাও।'

নিজেরটা ধরিয়ে সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে ফেরত দিলো রানা। বোঝাই যাচ্ছে, কথা বলে মজা পাচ্ছে সলোমন, রানা তাকে বাধা না দিয়ে শুনে গেল।

দুটো বিছানায় পরস্পরের দিকে মুখ করে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে ওরা, পিঠে বালিশ। জীবনে যা যা ঘটেছে তার প্রায় সবই উথলে বেরিয়ে এলো সলোমনের পেট থেকে। ক্যামবারওয়েল এতিমখানায় শৈশব আর কৈশোর কেটেছে, মা-বাবার পরিচয় জানা নেই। কেয়ারটেকার থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সবার যৌন-বিকৃতির শিকার হয়েছিল। এতিমখানা থেকে

মাঝে মধ্যে বেরুবার ব্যবস্থা করে দিয়ে দারোয়ানরাই তাকে বিপথে যাবার সুযোগ করে দেয়। চুরি বিদ্যায় হাত পাকানোর সাথে সাথে লেখাপড়াটাও বাধ্য হয়ে শিখতে হয়। স্কুল ফাইনাল শেষ করে নেভীতে যোগ দেয়। বিয়ে করেনি, কোথাও কোনো আপনজন নেই।'

'নিজের স্বার্থ নিজেকেই দেখতে হয়, বুঝলে,' রানাকে বললো সে। 'এই শিক্ষাটা আমি অবশ্য ঠেকে শিখেছি। তোমার পাওনা জিনিস ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে আশপাশে কেউ না কেউ আছেই! এম. টি. বি.-তে আমি যখন পি. ও., কোয়ারলে নামে আমাদের এক ক্যাপটেন ছিলো—তরুণ সাব-লেফটেন্যান্ট। গুড ফর নাথিং, স্রেফ কোনো কাজের না। তাকে আমি বয়ে নিয়ে আসি —কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে আসি! ফকল্যাণ্ড যুদ্ধের কথা বলছি, অ্যাটাক শুরু করার সাথে সাথে গুলি খেলো সে। ব্রিজে, স্কিপারের চেয়ারে বসে মাছের মতো খাবি খেতে লাগলো—সমস্ত রক্ত কুলকুল করে বেরিয়ে আসছে। লোকটা মারা যাচ্ছে জেনেও কিছুই আমাদের করার ছিলো না। নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিলাম, নতুন করে শুরু করলাম অ্যাটাক। দুটো টর্পেডো ছুঁড়ে শত্রুপক্ষের একটা জাহাজ দিলাম ডুবিয়ে। আমরা ফিরে আসার পর কি ঘটলো? ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোয়ারলেকে দেয়া হলো ভিক্টোরিয়া ক্রস। আর আমার নামটা শুধু উল্লেখ করা হলো ডিসপ্যাচে।'

চেহারায় সহানুভূতি ফুটিয়ে তুললো রানা। মনে মনে হাসছে ও। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলে একটা গল্প কি রকম বদলে যায়।

সলোমন বক বক করে চলেছে, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটা স্মরণ করলো রানা। জেলখানায় আসার আগে, বি-এস-এস ডি-টু থেকে সলোমনের অফিশিয়াল রেকর্ডের ফাইল যোগাড় করে পড়েছে রানা। নির্জলা সত্যি কথাটা হলো, গুরুতর আহত হয়েও কোয়ারলে ব্রিজ থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে অস্বীকার করে। কোয়ারলে ধরে নিয়েছিল সে মারা যাচ্ছে, কিন্তু তারপরও কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামায়নি। ব্রিজে উপস্থিত থেকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় সে। সলোমন ভালো কাজ দেখায়—তুমুল গোলাবর্ষণের মধ্যেও দিশেহারা হয়নি সে—তার ব্যক্তিগত সাহস প্রশ্নাতীত, কিন্তু পুরোটা সময় কোয়ারলের সরাসরি নির্দেশে কাজ করে সে।

ঘটনাটা বর্ণনার সময় সলোমনের চোখে-মুখে আবেগ ফুটে উঠতে দেখেছে রানা। লোকটা কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে সমস্ত কৃতিত্ব তার ছিলো? হতে পারে, অসম্ভব নয়—বন্ধু-বান্ধব আর নিজেকে এতোবার মিথ্যে গল্পটা শুনিয়েছে যে এখন হয়তো সেটাই ওর কাছে সত্যি হয়ে গেছে। ওর হয়তো ধারণা, কোয়ারলের বদলে তাকে ভিক্টোরিয়া ক্রস দেয়া উচিত ছিলো।

'তারপর, নেভী থেকে বেরুবার পর?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কারসন লিখেছে, এরপর তুমি নাকি চোরাচালানে হাত দাও।'

'ব্যাটাচ্ছেলে ঠিকই লিখেছে,' নিঃশব্দে হাসলো সলোমন। 'চ্যানেলে কাজ করতাম আমরা। বাতিল একটা এম. টি. বি.-কে মেরামত করে নিয়েছিলাম। এক বছর চুটিয়ে ব্যবসা করি।'

'কি চালান করছিলে—মদ ?'

'মদ, হ্যাঁ। তার সাথে সিগারেট, নাইলন, ঘড়ি, কখনো-সখনো স্মল আর্মস—যখন যেটা পেতাম।'

'ড্রাগ ? শুনেছি ড্রাগে নাকি ভালো পয়সা।'

'কি মনে করো তুমি আমাকে!' সলোমন ভারি অসন্তুষ্ট হলো। 'ওসব নোংরা জিনিস আমি ছুঁয়েও দেখি না!'

কথাটা সত্যি। সলোমনের ফাইলেও তাই লেখা আছে। টাকা বানাবার সবচেয়ে বড় দুটো কাজে ভুলেও হাত লাগাবে না সলোমন—নারী আর ড্রাগ। সুন্দর নীতিবোধ, ওর চরিত্রের সাথে একেবারেই মেলে না। কোর্টে বিচার চলার সময় এই প্রসঙ্গটা নিয়ে দু'হাতে লিখেছিল সাংবাদিকরা, তারা ওকে আধুনিক রবিন হুড বানিয়ে ছাড়ে। টাকাগুলো কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর সলোমন কোর্টে বলেছিল, যেখানেই থাক, যথা সময়ে ওগুলোর একটা অংশ লণ্ডনের গরীব মানুষের পকেটে ঠিকই পৌঁছে যাবে। এই সব লেখা পড়ে সাধারণ মানুষও সলোমনকে মহৎপ্রাণ বলে ভাবতে শুরু করে। কলাম লিখিয়েরা লেখে, পিতৃপরিচয়হীন জো সলোমনকে এই সমাজই অপরাধী বানিয়েছে, তাই বিচার যদি হতেই হয় তবে সবার আগে এই সমাজের বিচার হোক, ইত্যাদি। অথচ পিটারফিল্ডে যে ডাকোটাটা হাইজ্যাক করা হয়েছিল সেটার পাইলট ডাকাতদের বাধা দেয়ায় প্রচণ্ড মার খায়, একটা পা হারিয়ে বেচারা চাকরি খুইয়েছে, সে কথা কেউ তোলেনি। পরে খবর নিয়ে আরো জেনেছে রানা, পাইলট তার একটা চোখও হারিয়েছিল।

অপরাধ এই একটাই করেনি সলোমন। সূত্রহীন অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহে সলোমনকে বহুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। বেশিরভাগই ডাকাতির কেস ছিলো সেগুলো, প্রায় প্রত্যেকটিতে নিরীহ মানুষ আহত হয়, অনেকে পরে মারা যায় হাসপাতালে। এইসব মৃত্যুর জন্যে সলোমনকে দায়ী করা হয়নি।

হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলো রানা, সলোমন তখনো কথা বলে চলেছে।

'সে একটা সময় গেছে বটে! এমনভাবে কাজ সারতাম পুলিশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতো। স্মোক এলাকায় আমার টিমটা ছিলো সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, দলের নামটাও ছিলো আমার দেয়া—মনস্টারস! একের পর এক কাজ উদ্ধার করেছি, অথচ পুলিশ একটার সাথেও আমাদের জড়াতে পারেনি।'

'বোঝাই যায়, দলে যোগ্য লোক পেয়েছিলে তুমি,' বললো রানা। 'মাসের পর মাস পুলিশকে কাঁচকলা দেখানো সহজ কথা নাকি!'

'ধরে আমাকে প্রত্যেকবারই নিয়ে গেছে,' বললো সলোমন। 'কিন্তু এমন সব অ্যালিবাই তৈরি থাকতো, উকিল থানায় পৌঁছেই বের করে আনতে পারতো আমাকে। থানার সামনে আমার বোধহয় কয়েক হাজার ফটো তোলা হয়েছে। এমন কোনো হপ্তা ছিলো না আমার ছবি না ছাপা হয়েছে কাগজে!'

'এখন অবশ্য সময়টা খারাপ যাচ্ছে!'

দাঁত বের করে হাসলো সলোমন। 'ধৈর্য ধরো, বৎস—স্রেফ

ধৈর্য ধরো। প্রথম পাতায় আবার আমাকে হাসতে দেখবে তোমরা!'

বিছানার ওপর উঠে বসলো রানা। 'কি বললে?'

হাসিটা সলোমনের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। 'কিছু বলেছি নাকি? হয়তো বা। ভুলে গেছি।' তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে, এই মুহূর্তে রানার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই।

বিছানায় শুয়ে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে রানা। সলোমন সম্পর্কে বইতে কি যেন লিখেছে কারসন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বিপজ্জনক অপরাধের প্রতি এমন অস্বাভাবিক ঝোঁক আছে সলোমনের, ব্যাপারটাকে আত্মহননের আকুতি বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। উত্তেজনা আর বিপদের ঝুঁকি তার কাছে মদ আর মাংস। ভিলেন হতে ভালোবাসে সে, এটা তার একটা নেশার মতো। রানা ভাবলো, আসলে হিরো হতে পারেনি বলেই ভিলেন হয়েছে লোকটা, কিন্তু হিরো হবার সাধ তাকে ছেড়ে যায়নি পুরোপুরি। গরীব মানুষের মধ্যে টাকা পয়সা যদি সত্যি কখনো সে বিলিয়ে থাকে, সেটা ওই হিরো হবার গোপন ইচ্ছে থেকে বিলিয়েছে। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হলে খুশি হওয়ার পিছনেও সেই একই কারণ।

তবে যে যাই বলুক, একটা কথা সত্যি, জো সলোমন রবিন হুড নয়। লোকটা হিংস্র একটা পশু, তার প্রধান অস্ত্র নিষ্ঠুরতা এবং দুঃসাহস। যখন খুশি হাসতে পারে বলে লোকে তাকে সহজে মূর্তিমান শয়তান বলে চিনতে পারে না।

বিছানার কিনারায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করলো রানা। 'ভাবছি শুয়ে পড়বো। সারাটা দিন গাড়িতে ছিলাম তো!'

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে মুখের সামনে একটা পত্রিকা মেলে ধরলো সলোমন। 'ঠিক আছে, দোস্ত। কিন্তু সাবধান, দুঃস্বপ্নগুলোকে একেবারেই পাত্তা দিয়ো না!'

'গুডনাইট,' বলে শুয়ে পড়লো রানা, চাদরটা টেনে বুকের কাছে এনে চোখ বুজলো। ভাবছে, মেশিন শপে কি রকম পরিবেশ কে জানে। বুকার বললো, গাড়ির নম্বর প্লেট তৈরি করতে হবে। জীবিকা হিসেবে চটের বস্তা সেলাই করার চেয়ে গাড়ির প্লেট তৈরি করা তবু ভালো। শুধু যদি সেপাইগুলো বিরক্ত না করে, জীবন মোটামুটি ভালোই কাটবে।

হঠাৎ রানার ভুরু কুঁচকে উঠলো। আরে, আরে, নিজেকে দেখছি একজন কয়েদী বলে ভাবতে শুরু করেছি! সোহানা শুনলে খুন হবে হেসে। ফোড়ন কাটতে ছাড়বে না, তোমার মধ্যে একজন অপরাধী বাস করে।

মুচকি একটু হেসে পাশ ফিরে শুলো রানা। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

আট

'পুনর্বাসন না ঘোড়ার আণ্ডা!' মেশিন শপের ঘটাং ঘটাং আর হিস হিস শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো সলোমনের কণ্ঠস্বর। 'রিভলভিং চেয়ারে বসে হোম অফিসের পেটমোটা আমলারা বিপথগামীদের জন্যে এই প্রজেক্ট চালু করেছে। দিনে বারো ঘণ্টা গরমে সেদ্ধ হও, গাড়ির নম্বর প্লেট বানাতে শিখে দক্ষ শ্রমিক হও, ভবিষ্যতে সুস্থ জীবন কাটানো কোনো সমস্যা হবে না। বুড়বাকদের মাথায় ঢোকে না এই কাজের মজুরি হলো হপ্তায় পাঁচ পাউণ্ড অথচ একজন লোকের সৎভাবে বেঁচে থাকতে হলে লাগে বিশ পাউণ্ড!'

হাতের প্লেটটা ডাই স্ট্যাম্পিং মেশিনের নিচে সাবধানে রাখলো রানা, তারপর লিভার টানলো। মৃদু হিস হিস শব্দ বেরিয়ে এলো হাইড্রলিক প্রেস থেকে। সমতল স্টীল প্লেটের গায়ে নম্বরগুলো শক্তভাবে এঁটে বসলো। প্লেটটা তুলে দেখলো রানা, তারপর একটা ফাইল দিয়ে ঘষে ঘষে কর্কশ কিনারাগুলো

পরিষ্কার করলো। সলোমনের কথাগুলো কানে বাজছে এখনো।

একটুও বাড়িয়ে বলেনি সলোমন। তিন হপ্তা মেশিন শপে কাটিয়ে এই সত্যটুকু হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে রানা। একটু দূরে বসা প্যাট্রিক ফিলিপস-এর দিকে তাকালো ও। তহবিল তছরুপের দায়ে সাত বছর জেল খাটছে লোকটা, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলো। মেশিন শপে তার সহকারী, চার্লস ওয়ার্ণার ছিলো স্কুল-মাস্টার। ছোটোখাটো, নিরীহদর্শন, হাসিখুশি লোক ওয়ার্ণার, স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে বিছানায় দেখে খুন করার পর যাবজ্জীবন খাটছে। অল্প-মজুরির কাজ শিখিয়ে এ-সব লোককে কিভাবে সমাজে পুনর্বাসন করা সম্ভব? ভাবতে গিয়ে নিজ দেশের দুরবস্থার কথা চলে এলো: তবু তো এরা ভাবে, আর আমরা?

অকস্মাৎ অট্টহাসির শব্দে বাস্তবে ফিরে এলো রানা, সেই সাথে স্বস্তিবোধ করলো। দেশের করুণ অবস্থার কথা চিন্তা করতে গেলে মাথা গরম হয়ে যায় ওর, আজও হতে যাচ্ছিলো। আওয়াজটাই জানিয়ে দিলো, হাসিটা জো সলোমনের। একজন কয়েদীর রসিকতা শুনে হাসছে সে।

একমাত্র সলোমনই এভাবে গলা ছেড়ে হাসতে পারে। সেপাই তাকে কিছু বলবে না।

সাধারণ কয়েদীরাও তাকে বিশেষ সমীহ করে চলে। জেলখানার ভেতর লোকজনের মর্যাদার মাপকাঠি অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে। কে কতো টাকার দাঁও মারতে গিয়ে ধরা পড়েছে, কার কতো বছরের জেল হয়েছে, কে কোন সমাজের লোক

ইত্যাদিও বিবেচনা করা হয়। সমস্ত বিচারেই সলোমন ফ্রাইডেথর্পের রত্ন, সবচেয়ে সম্মানের আসনটা তার দখলে। ওদের একজন হয়ে এখানে আসার পর রানা উপলব্ধি করেছে, কয়েদীরা ওকেও বেশ খানিকটা সমীহ করে। বিদেশী বলে নয়, উচ্চশিক্ষিত বলে। ডাকাতি করা টাকার অংকটাও বড় করে দেখছে। সলোমন না থাকলে সম্মানের সেরা আসনটা না চাইতেই পেয়ে যেতো রানা।

আস্তে-ধীরে হেঁটে এলো ওয়ার্ডার, রানার পাশে বেঞ্চের ওপর এক গাদা খালি প্লেট রাখলো। 'সবগুলো তোমার, নাহিদ,' বলে আরেক দিকে হেঁটে গেল সে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। ক্লান্ত, দুর্বল, ভারবাহী পশুর মতো লাগলো তাকে। মুখটা ঘেমে আছে, ফলে পিছলে নাকের ডগায় নেমে এসেছে চশমাটা। লোকটার প্রতি সহানুভূতিতে ছেয়ে গেল রানার মন। ভদ্র একজন স্কুল-মাস্টারের কপালে কি দুঃসহ দুর্ভোগ। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল রানার। এ-ধরনের ভারি কাজের উপযুক্ত নয় লোকটা—জেল কর্তৃপক্ষ দেখতে পায় না নাকি?

নিজেকে শান্ত করলো রানা। কোথায় কি অন্যায় হচ্ছে দেখার জন্যে এখানে আসেনি সে। সলোমনের ওপর নজর রাখতে হবে তার। লোকটার সহানুভূতি আর বন্ধুত্ব অর্জন করতে হবে। জানার চেষ্টা করতে হবে তার ভবিষ্যৎ প্ল্যান। দেড় মাসের বেশি হতে চললো বদরুল হাসানের কোনো খবর নেই। ওর কপালে কি ঘটেছে জানতে হবে তাকে।

জানতে হবে কাউন্টের পরিচয়। শয়তানটাকে থামাতে হবে।

ছোটোখাটো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ব্যাপারে এরই-মধ্যে সাফল্য অর্জন করেছে রানা। ওর অভিনয়ে কোনো খুঁত ধরা পড়েনি, কয়েদী এবং পুলিশরা ওর নাহিদ শাহ পরিচয় নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছে। ভয় ছিলো, সলোমন ওকে ভালোভাবে না-ও গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ঘটেছে উল্টোটা—দু'জন এখন ওরা পরস্পরের বন্ধু।

জো সলোমন আর সব বড় মাপের অপরাধীর মতোই অত্যন্ত জটিল চরিত্রের লোক। বাইরে থেকে দেখে তার সম্পর্কে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কখনো সে শান্ত, নিরীহদর্শন স্কুল-মাস্টারের চেয়েও বিনয়ী আর ভদ্র। আবার কখনো সে বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো থমথমে একটা হুমকি।

ফাইলে, বা ওর সম্পর্কে লেখা বইতে যাই থাক, ফ্রাইডেথর্পে আসার পর লোকটা সম্পর্কে আশ্চর্য সব গল্প শুনেছে রানা। একবার মেফেয়ার ম্যানসনে ডাকাতি করে সে। ডাকাতি করার আগে জায়গাটা ভালো করে দেখার জন্যে একদিন, দিনের বেলা, সেখানে হাজির হলো সলোমন। ম্যানসনে তখন বিবাহোত্তর উৎসব পার্টি চলছিল। দারোয়ানদের সসম্ভ্রম স্যালুট নিয়ে সহাস্যে ভেতরে ঢোকে সে, নিমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে মিশে যায়, ভরপেট খাওয়াদাওয়া সারে, মজার মজার কৌতুক শুনিয়ে উপস্থিত মেহমানদের পেটে খিল ধরিয়ে দেয়, তারপর সদ্য বিবাহিত ভদ্রলোকটির পকেট মেরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। বাইরে, ফুটপাতে, দেউলিয়া এক লোক তার পথরোধ করে দাঁড়ায়,

সাহায্যের আবেদন নিয়ে। সদ্য চুরি করা মানিব্যাগ খুলে সলোমন দেখে তাতে অল্প কিছু টাকা রয়েছে—সব টাকাই লোকটাকে দিয়ে সেখান থেকে দ্রুত কেটে পড়ে সে।

এ-ধরনের ঘটনা তার সম্পর্কে আরো অনেক শোনা যায়। অবশ্য সত্য-মিথ্যে যাচাই করার কোনো উপায় নেই। সব ক'টা গল্পেরই উৎস সলোমনের নিজের মুখ। তবে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়ে রানা জেনেছে, যেখানে স্বার্থের প্রশ্ন সেখানে নির্মম হতে দ্বিধা করে না লোকটা, অকস্মাৎ চোখ উল্টে নিতে তার জুড়ি নেই। অথচ এমনিতে লোকটা হাসিখুশি, এমন কি কখনো কখনো তাকে সরল বলেও মনে হয়। আসলে তা সে নয়।

হঠাৎ রানা লক্ষ্য করলো, ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে সলোমন। 'কি এতো ভাবছো, শুনি?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো সে। 'যা ভাবছো তা না-ও ঘটতে পারে।'

ভাবার কথা যদি ওঠে, কথাটা সলোমনের জন্যেই খাটে। গত দু'দিন থেকে কি যেন চিন্তা করছে সে। প্রায় তাকে অন্যমনস্ক দেখায়।

একজন কয়েদী এগিয়ে আসায় রানার চিন্তায় আবার বাধা পড়লো। লোকটার নাম লিফার, গায়ে সাংঘাতিক শক্তি রাখে। একটা ট্রে ঠেলে নিয়ে এলো সে, তৈরি করা প্লেটগুলো নিয়ে যাবে। রানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার জন্যে কিছু আছে নাকি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে বেঞ্চের ওপর স্তূপ করা প্লেটগুলো দেখালো রানা। লোকটাকে বিশেষ পছন্দ করে না ও। সে-জন্যে

সম্ভবত তার অপরাধের ধরনটাই দায়ী। দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আহত করে সে, বাচ্চার মাকে ধর্ষণ করে। দশ বছরের সাজা খাটছে। পেশায় চোর, এটাই তার প্রথম ধর্ষণ। চেহারাই বলে দেয় অসৎ লোক। গলায় কি একটা অসুখ আছে, তার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেতো, গলার আওয়াজ বেসুরো আর ভাঙা ভাঙা। ট্রলিতে প্লেট তুলতে তুলতে সলোমনের দিকে তাকালো সে। বললো, 'আমাকে দুটো সিগারেট দাও না, সলোমন।'

'তিন হপ্তা হলো চালাচ্ছি তোমাকে,' বললো সলোমন। 'আর পাবে না। বিনিময়ে কিছু ফেলো, তারপর দেখা যাবে।'

দশাসই লিফার বেসুরো গলায় কাকুতিমিনতি শুরু করলো, 'একটু দয়া করো, সলোমন। দু'দিন একটা টান পর্যন্ত দিইনি। আমি পাগল হয়ে যাবো।'

সলোমন নিরুত্তর।

এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধরলো লিফার। 'দাও না ভাই...।' মনে হলো প্রয়োজন হলে সলোমনের পায়ে পড়বে সে। 'সত্যি বলছি, সিগারেট না পেলে পাগল হয়ে যাবো...।'

হাতটা ঝাপটা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো সলোমন। 'কি আজে-বাজে বকছো! সে তো আগেই হয়েছো তুমি। ওদের উচিত ছিলো বছর কয়েক আগেই তোমার চিকিৎসা করানো। ভাগো এখান থেকে। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

লিফারের মতো লোকদের সাথে এ-ধরনের কর্কশ ব্যবহার করেই অভ্যস্ত সলোমন। বেঞ্চের শেষ মাথায় চলে এসেছিল

রানা কিছু পেরেক নেয়ার জন্যে, ফেরার জন্যে ঘুরতেই দেখলো অদম্য আক্রোশে বিকৃত হয়ে গেছে লিফারের চেহারা। অকস্মাৎ অসুরটার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, একটা র‍্যাট'স টেইল ফাইল তুলে নিলো সে। ফাইলের শেষ মাথাটা ছুঁচালো, অস্ত্র হিসেবে ভয়ঙ্কর —সেটা মাথার ওপর তুললো সে, সলোমনের বিশাল নগ্ন পিঠে গাঁথবে।

সাবধান করে দেয়ার সময় নেই, ঝট্ করে হাতুড়িটা তুলে নিয়ে সবটুকু শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারলো রানা। সরাসরি লিফারের বুকে গিয়ে আঘাত করলো হাতুড়ি, আহত পশুর কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। টলে উঠলো সে, হাত থেকে পড়ে গেল ফাইলটা।

চমকে ঘুরলো সলোমন। হাতুড়ি, ফাইল, আর লিফারের যন্ত্রণাকাতর চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো সে। সবশেষে রানার দিকে তাকালো সে। চোখ নয়, যেন কালো স্লেট পাথর। শান্ত ভঙ্গিতে এক পা এগিয়ে এসে ফাইলটা তুলে নিলো সে। 'এটা তোমার, লিফার ?'

হতভম্ব লিফার সলোমনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর হঠাৎ ট্রলিটা আঁকড়ে ধরে ঠেলে নিয়ে চললো দ্রুত।

কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলছে, যান্ত্রিক শব্দগুলোর কোনো উত্থান বা পতন ঘটেনি, অথচ কামরার এদিকে যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকে লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা।

লিফার বেশি দূর যায়নি, দুটো ব্যাপারে সচেতন হলো রানা। সলোমন ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো আরউইন হানিকাট-

এর উদ্দেশে—লম্বা, শক্ত-সমর্থ একজন স্কট হানিকাট, কামরার আরেক প্রান্তে কাজ করছে। এবং চ্যাপল, একজন সেপাই, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'কি হচ্ছে এখানে?' চ্যাপল জানতে চাইলো।

'কিছুই না, মিঃ চ্যাপল, স্যার,' বললো সলোমন। 'দম দেয়া পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছি আমরা।'

চ্যাপল বয়সে তরুণ, বেশি দিন হয়নি আর্মি থেকে বেরিয়ে এসেছে। গোঁফ না ছেঁটে বয়স বাড়াবার মরিয়া একটা চেষ্টা আছে তার মধ্যে। বেঞ্চের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে। এবার ওর দিকে তাকালো চ্যাপল। আর্মিতে লোকটা ল্যান্স কর্পোরালের বেশি উঠতে পারেনি, দুঃসময়ের শিকার ভাড়াটে মেজরকে দু'পয়সা দাম দেয় না সে। ঝাঁঝের সাথে রানাকে বললো সে, 'নতুন এসে তুমিও দেখছি খুব বাড় বেড়েছো, শাহ! হাত গুটিয়ে বসে আছো কি মনে করে? সরকার খাওয়া দেয় না? নাকি প্লেট তৈরি করাটাকে ছোটো কাজ মনে করছো?'

চ্যাপলের খুব কাছে সরে এলো সলোমন। নরম, ফিসফিসে গলায় কথা বললো সে। পরিষ্কার উচ্চারণ, সবাই শুনতে পেলো, 'নাহিদ কাজ করছে, মিঃ চ্যাপল, স্যার। প্রাণপণ খাটছে ও। আমি বলি কি, এখানে চেষ্টা বাদ দিয়ে, আপনি বরং লক্ষ্মী ছেলের মতো কামরার ওদিকে কোথাও...অ্যাঁ, কি বলেন? পরামর্শটা পছন্দ হয়, মিঃ চ্যাপল, স্যার?'

টুঁ-শব্দটিও করলো না চ্যাপল, কড়া চোখে সলোমনের

দিকে তাকাবার পর্যন্ত সাহস হলো না তার। সাদা মুখে পরিষ্কার ভীতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে আচমকা আর্তনাদ ভেসে এলো। কেটে পড়ার অজুহাত তৈরি হওয়ায় পরম স্বস্তি বোধ করলো সে, ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে দ্রুত সরে গেল।

কাজ থামিয়ে দিয়েছে সবাই, এক এক করে মেশিন বন্ধ করে দেয়ায় ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো যান্ত্রিক কোলাহল। এই সময় আরউইন হানিকাটকে উদয় হতে দেখলো রানা, দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে আসছে সে, তেল চিটচিটে নোংরা একটা তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে হাত মুছলো। শান্ত, নির্বিকার চেহারা।

'ওদিকে আবার কি হলো, আরউইন?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'মাইক লিফার জঘন্য একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেছে,' শান্ত গলায় বললো হানিকাট। 'কামারের ঘরে এক বালতি ফুটন্ত পানি ছিলো, কি জানি কি করতে গিয়ে বালতিটা নিজের পায়ে উল্টে দিয়েছে।'

'চু-চু-চু,' জিভ আর টাকরা সহযোগে আওয়াজ করলো সলোমন; চেহারায় সহানুভূতি নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে রানার দিকে তাকালো। 'দেখো দেখি, কি রকম অসাবধানী লোক!'

কোনো মন্তব্য না করে আর সবার সাথে সামনে এগোলো রানা। দরজার কাছে গাদাগাদি ভিড়, সবার মাথার ওপর দিয়ে তাকালো ও। লিফার মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে শরীর। আশপাশ থেকে শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ

শুনতে পেলো রানা, কেউ একটা কথাও বলছে না। এই মুহূর্তে ডাক্তারকে পাওয়া গেল না, তবে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে ছুটে এলো দু'জন পুরুষ নার্স। কিন্তু দশাসই লিফারকে থামানোর উপায় কি। সদ্য গলা কাটা কৈ মাছের মতো সারা গায়ে লাফাচ্ছে দেহটা। ধাক্কা খাওয়ার, বা লেগে যাবার ভয়ে নার্স দু'জনও ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করলো। সাহায্য করার জন্যে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো রানা, কিন্তু ওকে হারিয়ে দিয়ে আগে পৌঁছে গেল সলোমন। চারজনের মিলিত চেষ্টায় কোনোরকমে স্থির করা হলো লিফারকে। ওরা তাকে শক্ত করে চেপে ধরে থাকলো, একজন নার্স একটা ইঞ্জেকশন দিলো।

স্ট্রেচারে তোলা হলো লিফারকে। ইতিমধ্যেই জ্ঞান হারিয়েছে সে।

উপস্থিত সবার প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো রানা। লিফারের প্রতি কারো কোনো সহানুভূতি নেই। জেলখানায় কয়েদীদের নিজস্ব একটা সমাজ আছে, সমাজের আছে বিশেষ কয়েকটা অলিখিত শর্ত, তারই একটা ভেঙেছে লিফার, ফলে প্রাপ্য সাজাও পেতে হয়েছে তাকে।

আরো অনেক সেপাই এলো। তাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকারও রয়েছে। সে তার হাতের রুলারটা ঠকাস ঠকাস করে বার কয়েক একটা বেঞ্চে ঠুকলো। 'যে যার কাজে ফিরে যাও। আমি কোনো গোলমাল চাই না।' চ্যাপ-লের দিকে ফিরলো সে। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ডেস্কে রিপোর্ট চাই,

মিঃ চ্যাপল। আপনার জায়গায় আরেকজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়ালো সে, দরজার দিকে এগোলো। দোরগোড়া থেকে আবার বললো, 'আসার সময় নাহিদ শাহকে নিয়ে আসবেন। ওর বোন ওকে দেখতে এসেছে।'

মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ভিজিটিং ডে। এক নম্বর ভবনের হল-রুমে রানাকে নিয়ে এলো ডিউটি অফিসার। এরই মধ্যে গিজ গিজ করছে লোকজন। এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত খুপরি আকারের সার সার ঘর, প্রতিটিতে কয়েদী এবং সাক্ষাৎপ্রার্থী পরস্পরের মুখোমুখি বসে, মাঝখানে থাকে আর্মারড্ গ্লাস, কথা হয় মাইক্রোফোনে। সময়সীমা দশ মিনিট।

একটা খুপরিতে ঢুকিয়ে দেয়া হলো রানাকে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ক্ষুদে কাঁচের দরজা। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠলো রানা। দু'পাশের খুপরি থেকে হেঁড়ে গলার আও-য়াজ আসছে, ভোঁতা গুঞ্জনের মতো, একটা শব্দও পরিষ্কার শোনা যায় না। প্রায় দু'মিনিট পর উল্টোদিকের দরজা খুলে খুপরিতে ঢুকলো একটা মেয়ে। পরনে রঙচটা হালকা নীল জিনস আর লাল শার্ট। চেয়ারে বসেই বললো, 'ও-মা, ওরা তোমার একি অবস্থা করেছে!'

অ্যামপ্লিফায়ারে গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা শোনালো। একটা ঢোক গিলে হাসলো রানা। 'কেন, এতোই কি খারাপ দেখাচ্ছে?'

'খারাপ ভালো বলছি না, বলছি একেবারে বদলে গেছো

তুমি।'

'সত্যি করে বলো তো, ঠিক কি রকম লাগছে?'

'পচা ছোটোলোক। নীচ গুণ্ডা। শয়তানের হাড্ডি। হিংস্র একটা পশু।'

মাথার চুলে আঙুল চালালো রানা, যেন দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে।

'কি হলো?'

'বোধহয় তোমার কথাই সত্যি,' বললো রানা। 'তা না হলে তোমাকে দেখামাত্র বদ চিন্তাগুলো মাথায় কিলবিল করে উঠলো কেন?'

'বদ চিন্তা?' মুখের এমন ভাব করলো সোহানা যেন চিরতার পানি খেয়ে ফেলেছে।

'জানতে চেয়ো না, সে-সব চিন্তা প্রকাশযোগ্য নয়।'

কাঁচের ওদিক থেকে টুকটুকে লাল জিভের ডগা বের করে রানাকে ভেঙচে দিলো সোহানা। 'তুই শালা একটা ইয়ে।'

'ঢাকার খবর কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বসের মেসেজ এসেছে। তিনি বলেছেন, গরুটাকে মুভ করতে বলো। অনেক দিন তো হলো, জেলখানায় বসে আর কতো ঘাস খাবে।'

'মনে হচ্ছে নতুন কোনো কাজ গছাতে চায়?'

'হতে পারে, ঠিক জানি না,' বললো সোহানা। 'এখানকার খবর বলো।'

'এই মুহূর্তের খবর হলো, পিয়াসী গুলনারকে দারুণ সুন্দরী

দেখাচ্ছে···।'

'সত্যি ?'

'সাবধান, বোকার মতো কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসো না, স্রেফ ফেঁসে যাবে তাহলে। জানোই তো, এখান থেকে পালানোর ইচ্ছে আছে আমার।'

'সময় মাত্র দশ মিনিট, মনে আছে ?' হাতঘড়ি দেখলো সোহানা। 'নাকি আসলেই শুধু ঘাস খাচ্ছো, কাজের কাজ কিছুই এগোয়নি ?'

'কি জানতে চাও বলো।'

'তোমার সাথে সলোমনের সম্পর্ক ?'

'ভালো—খুবই ভালো,' বললো রানা। 'এই তো খানিক আগে একটা বিপদে সাহায্য করলাম ওকে। একজন একটা ধারালো জিনিস গাঁথতে যাচ্ছিলো ওর পিঠে, ঠিকমতো লাগলে মারাই যেতো।'

'ওমা, সেকি! জেলখানাতেও মারামারি কাটাকাটি! শুনেছি এ-সব বন্ধ করার জন্যেই লোকজনকে জেলে ভরা হয়।'

'কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও তো ধানই ভানে।'

'কাউন্ট সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে ?'

মাথা নাড়লো রানা। 'কয়েদীরা অনেকে তার নাম উচ্চারণ করে, তার বেশি কিছু না। কেউই আসলে লোকটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। নানা রকম গল্প আর গুজব শোনা যায় বটে, কিন্তু সবই এক একটা প্রশ্নচিহ্ন।'

'সলোমন কি বলে ?'

'তাকে আমি সরাসরি একটা প্রশ্ন করেছিলাম—শুনেছি, জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটনকে নাকি কাউন্ট জেল থেকে বের করে নিয়ে গেছে? শুনে খুব এক চোট হাসলো সে। তার ধারণা, এ-সব নেহাতই কোনো পাগলের প্রলাপ।'

'তারমানে, আসলেও অযথা সময় নষ্ট করছো তুমি?'

'আরে না। সলোমন এখানথেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে আমি শিওর। কিছু বলেনি, কিন্তু তার আচরণ দেখে টের পেয়েছি।'

'কি রকম?'

'ব্যাখ্যা করা কঠিন,' বললো রানা। 'কিন্তু লক্ষণগুলো চিনতে আমার ভুল হয়নি। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা, কান খাড়া করে পায়ের শব্দ শোনা, টিকটিকি ডেকে উঠলে চমকে ওঠা, কোনো কারণ ছাড়াই ঠোঁট কামড়ানো—নিশ্চয়ই এ-সবের কোনো মানে আছে।'

'তারমানে তুমি জানো না কবে বা কখন সে পালাবে।'

'না। কোনো সূত্র এখনো পাইনি। তবে যখন ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করবে, আমি জানতে পারবো। চোখ-কান খোলা রেখেছি।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো সোহানা। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি কিছু ঘটবে? ফ্রাইডেথর্পের ফাইল পড়েছি আমি। সলোমন পালাতে পারবে না—এখান থেকে পালানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিভাবে সম্ভব তা বলতে পারবো না, কিন্তু সলোমন যে

পালাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' জোর দিয়ে বললো রানা। 'আর সে পালালে আমিও তার সাথে থাকবো।'

'তোমার প্ল্যানটা কিন্তু আমাকে বলোনি। সাথে থাকবে মানে? কতোদূর সাথে থাকবে? আমার তো ধারণা, ওকে যারা নিতে আসবে তাদের তুমি বাধা দেবে—মানে, আটক করবে।'

'না। সলোমনের সাথে সম্ভবত শেষ মাথা পর্যন্ত থাকতে হবে আমাকে। হাসানের খবর পেতে হলে আর কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, কাউন্টের কাছে আমাকে পৌঁছুতে হবে না?'

'একা?'

'কেন, শোনোনি, মাসুদ রানা একাই একশো?'

'ঠাট্টা নয়, প্লিজ, রানা,' উদ্বেগের সাথে বললো সোহানা। 'তুমি একা সেজন্যে আমি ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু যোগাযোগ না থাকলে জানবো কিভাবে তুমি কোনো বিপদে পড়লে কিনা?'

'যোগাযোগ রাখার কোনো উপায় তো দেখছি না,' বললো রানা। 'আমার ওপর নিশ্চয়ই নজর রাখা হচ্ছে। ঘন ঘন কেউ দেখা করতে এলে সন্দেহ করবে। বেরুবার সময়, এবং পরিবেশ কি রকম হবে আগে থেকে বলা সম্ভব নয়—হয়তো যোগাযোগ করতে পারবো, হয়তো পারবো না।'

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সোহানা। 'কিন্তু···।'

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তায় না ভুগে যা করলে কাজ হবে সেটা করবে, পরামর্শ দিলো রানা। 'খবরটা কাগজেই পেয়ে যাবে, আমি পালিয়েছি। অমনি অজু করে জায়নামাজে বসে পড়বে···।'

'নামাজ-কালাম নিয়ে ঠাট্টা করবে না।'

সোহানার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করলো রানা। 'মাফ করে দে।'

ফিক্ করে হেসে ফেললো সোহানা। 'করতে পারি এক শর্তে; নিজের ওপর লক্ষ্য রাখবি।'

'রাজি,' বললো রানা। 'কিন্তু আমারও একটা দাবি আছে।'

'তাড়াতাড়ি বলো,' হাতঘড়ি দেখলো সোহানা। 'কি?'

'শরীরের যত্ন নিবি—বেরিয়ে যখন তোর সাথে দেখা করবো, ঠকতে চাই না। গায়ের গন্ধ, চুমোর স্বাদ, বাহুর বন্ধন, হাতের পরশ, চোখের নাচন, দেহের হিল্লোল—আর কি যেন? সব আগের মতো চাই—টক-মিষ্টি।'

'সব পেতে পারিস শুধু যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস আমার কাছে,' আবার একবার রানাকে ভেঙচালো সোহানা। 'তোর দেরির জন্যে ও-সব নষ্ট হয়ে গেলে আমি দায়ী থাকবো না।'

রানার পিছনে কাঁচের দরজায় টোকা পড়লো। সময় শেষ।

'কথা দিলাম, চেষ্টা করবো,' বলে চেয়ার থেকে নামলো রানা। সোহানাকে উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলো ও।

হঠাৎ বুকটা ওর খালি হয়ে গেল।

নয়

প্রতিটি টাওয়ার ব্লকের তিন তলায় ছোটো একটা করে ক্যানটিন আছে, সেখানেই খাওয়াদাওয়া হয়। রানা পৌঁছে দেখলো, লাঞ্চ শুরু হয়ে গেছে।

দরজার কাছে খাতা নিয়ে বসে আছে এক অফিসার, রানার নামের পাশে টিক্ চিহ্ন দিলো সে, তার কাছ থেকে একটা টিকেট নিয়ে কাউন্টারের সামনে চলে এলো রানা। ট্রে ভরে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলো সলোমনকে। দেয়াল ঘেঁষে প্রথম টেবিলটায় বসেছে সে, পাশেই একটা খালি চেয়ার, হাতছানি দিয়ে ডাকলো রানাকে।

'লণ্ডনে তাহলে তোমার একটা বোনও আছে, কেমন?' রানা বসতেই জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'তারমানে সব কথা তুমি আমাকে বলোনি।'

উত্তর একটা তৈরি করাই ছিলো। 'ধারণা ছিলো না এতো কিছুর পরও আমার কথা ভাবে ও,' বললো রানা। 'মা-বাপ-

ভাই-বোন, জুলুম তো কারো ওপর কম করিনি, ভেবেছিলাম ওরা আমার কথা ভুলে গেছে।'

'শুনলাম খুবই নাকি সুন্দরী দেখতে।'

চেহারায় একটু গর্বের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হলো। 'এমন কিছু আছে কি যা তোমার কানে আসে না?'

'আছে, কিন্তু শোনার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বললো সলোমন। 'নিশ্চয়ই কোনো আফগান যুবককে ভালোবাসে?'

হেসে ফেললো রানা। পরমুহূর্তে, সলোমনের কথা শুনে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও।

'ওর বিয়েতে আমাকে দাওয়াত দিতে পারো,' বললো সলোমন। 'ততোদিনে আমি হয়তো বাইরে থাকবো।' রানা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দেখে হাসলো সে। অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। তারপর বললো, 'কই, আমি কিছু বলিনি তো!'

লাঞ্চের শেষের দিকে প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার এলো ইন্স-পেকশনে, রোজই আসে সে। কয়েক মিনিট পর ঘণ্টা বাজিয়ে পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। কাউন্টারে ট্রে জমা দেয়ার জন্যে লাইন দিতে হলো সবাইকে, তারপর আরেকবার লাইন দিতে হলো লিফটে চড়ার জন্যে। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে সেলে ফিরে যাবে কয়েদীরা, বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম, তারপর আবার ওয়র্কশপে শুরু হবে কাজ।

অপেক্ষা করার সময় ধূমপানের অনুমতি আছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করলো সলোমন, এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে

দিয়াশলাই বের করতে ব্যর্থ হলো সে। ঠোঁটে সিগারেট, কিন্তু আগুন নেই। পাশে এসে দাঁড়ালো প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার, পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

'রাখো এটা, সলোমন, কিন্তু বুঝেশুনে খরচ করো।' মাথা নাড়তে নাড়তে সামনে এগোলো প্রিন্সিপাল অফিসার। 'আমি না থাকলে কি দুর্দশাই যে হতো তোমাদের!'

আশপাশে যারা ছিলো প্রায় সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। কেউ কেউ বেশ জোরে হাসলো, বুকারের চোখে ভালো থাকতে চায় তারা। এক মুহূর্ত পর লিফট নামলো। এগোতে শুরু করে ঠোঁট থেকে সিগারেট নামালো সলোমন, তারপর দিয়াশলাই-য়ের সাথে পকেটে রেখে দিলো সেটা।

উত্তেজনার একটা শিহরণ বয়ে গেল রানার শরীরে। গোটা ব্যাপারটা উদ্ভট লেগেছে ওর কাছে, একেবারেই মেলে না। প্রিন্সিপাল অফিসারের সাথে একটুও বনে না সলোমনের। দু'-জনের কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না, এবং বিতৃষ্ণার ভাব-টুকু গোপন করেও রাখে না। অথচ প্রিন্সিপাল অফিসার যেচে পড়ে সলোমনকে সাহায্য করলো! ব্যাপারটা কি?

আবার ওয়র্কশপে কাজে যাবার আগে-পর্যন্ত সেলগুলোর দরজা খোলাই থাকে, আশপাশের সেল থেকে আসা-যাওয়া করে কয়েদীরা, গল্প-গুজব চলে। তবে কেউ যদি ঘুমাতে চায় বা একা থাকতে চায়, ইচ্ছে করলে দরজা বন্ধ করতে পারে সে। রানাকে সাথে নিয়ে সেলে ঢুকেই সলোমন বললো, 'বাইরে তোমার কোনো কাজ আছে?'

মাথা নাড়লো রানা। 'আমি শোবো।'

'তোমার অসুবিধে না হলে দরজাটা তাহলে বন্ধ করে দিই,' বললো সলোমন। রানার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দরজা বন্ধ করলো সে। 'আজ আমার মুড নেই যে কারো সাথে কথা বলবো।'

বিছানায় লম্বা হলো রানা। 'কেন, কি হয়েছে, শরীর খারাপ করলো নাকি?'

'এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করছি। ইচ্ছে হচ্ছে দেয়াল ভেঙে পাহারায় থাকি কেউ যাতে মেরামত করতে না পারে।'

একটা পত্রিকা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলো রানা। অপেক্ষা করছে।

একটু পর বিছানা থেকে নামলো সলোমন, ওয়াশবেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রানার দিকে পিছন ফিরে পকেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটটা বের করলো সে, ধরালো। দিয়াশলাইটা ওয়াশবেসিনের কিনারায় রাখলো সে।

শার্টের পকেট থেকে রানাও একটা সিগারেট বের করলো। বিছানা থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগোলো ও, হাত বাড়িয়ে দিলো দিয়াশলাইয়ের দিকে। সলোমন তাকিয়ে আছে তার খোলা তালুর দিকে। হাতটা তাড়াতাড়ি মুঠো হয়ে গেল, কিন্তু যা দেখার দেখে নিয়েছে রানা। সলোমনের হাতে ছোটো একটা খয়েরি ক্যাপসুল।

'দিয়াশলাইটা একটু দেবে, সলোমন?'

'হাত বাড়াও,' বললো সলোমন।

বেসিনের কিনার থেকে দিয়াশলাই তুলে নিয়ে সিগারেট ধরালো রানা, সেটা আবার জায়গামতো রেখে ফিরে এলো নিজের বিছানায়। প্রিন্সিপাল অফিসার তাহলে সলোমনের যোগাযোগ? অবাক কাণ্ড! বিশ্বাস করা কঠিন! নিশ্চয়ই মোটা, খুবই মোটা অংকের টাকা খেয়ে এই কাজে নেমেছে বুকার। ঝুঁকিটাও তো ভয়ানক। চুপচাপ শুয়ে থাকলো রানা। ওদিকে প্লাস্টিকের একটা কাপ ভরে ছোটো ছোটো চুমুকে পানি খাচ্ছে সলোমন।

ত্ব'মিনিট পর ফিরে এসে বিছানার কিনারায় বসলো সে। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব স্থির হয়ে আছে।

'সলোমন?' মৃত্থ কণ্ঠে ডাকলো রানা।

ফিরলো সলোমন, কিন্তু রানাকে দেখতে পেতে তার যেন এক সেকেণ্ড দেরি হলো।

'সত্যিই তোমার শরীর খারাপ লাগছে না? কেমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'ও কিছু না,' বললো সলোমন। 'সম্পূর্ণ সুস্থ আছি আমি। সম্ভবত বসন্ত বলেই থেকে থেকে কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ছি। বছরের এই সময়টায় এরকম হয় আমার—ভেতরটা ছটফট করতে থাকে।'

'করারই কথা,' সায় দিলো রানা। 'বন্দী জীবন!'

কিন্তু রানার কথা সলোমন শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। অনড় মূর্তির মতো বসে থাকলো সে। দেয়ালে চোখ, অথচ তাকিয়ে আছে যেন বহুদূরে।

রানা আর তাকে বিরক্ত করলো না।

সেদিন এমনিতে গরম পড়েছে, তার ওপর এয়ার সার্কুলেটিং সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দেয়ায় বিকেলে ওঅর্কশপে কাজ করতে গিয়ে ঘেমে গোসল হয়ে গেল সবাই। অনেকেই গায়ের জামা খুলে ফেলেছে।

লম্বা একটা বেঞ্চের এক প্রান্তে বসে হ্যাণ্ড গিলোটিন দিয়ে প্লেট কাটছে রানা। সলোমন বসেছে উঁচু একটা স্পীড হুইলের সিটে, ইস্পাতের এক গাদা ক্লিপে শান দিয়ে আকারে ছোটো করছে সেগুলো। বেশ কিছুক্ষণ হলো দরদর করে ঘামছে সে। চোখে চকচকে, ঘোর লাগা দৃষ্টি।

'তোমার খারাপ লাগছে, সলোমন?' জিজ্ঞেস করলো রানা, কিন্তু সলোমন ওর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

একবার কাজ থামিয়ে পিছন দিকে হেলান দিলো সলোমন, অথচ সিটের পিঠ নেই। তাল সামলাবার সময় ঝাঁকি খেলো সে। চোখে ঘাম পড়লো, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘষে ঘষে মুছলো চোখ দুটো। পাশেই একটা বেঞ্চের ওপর রয়েছে ক্লিপগুলো, ঝুঁকে একটা নিতে গিয়ে দুলতে শুরু করলো সে। পরিষ্কার দেখলো রানা, বাড়ানো হাতটা কাঁপছে। নাগালের মধ্যে, অথচ হাতড়াতে লাগলো, যেন চোখেও ভালো দেখতে পাচ্ছে না। ক্লিপগুলো একটার ওপর একটা, স্তূপ করা। হাতের ধাক্কা লেগে স্তূপটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল বেঞ্চ থেকে। ব্যস্তভাবে থাবলা মারলো সলোমন, অন্তত যাতে কিছু ক্লিপ ধরে ফেলতে

পারে। কিভাবে যেন হাতের উল্টোপিঠে লেগে লাফ দিয়ে উঠলো একটা ক্লিপ, পড়লো গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ঘুরন্ত চাকায়। বুলেটের মতো ছিটকে গেল সেটা, ঝর্ণার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আগুনের ফুলকি।

তারপরই সলোমনের সারা শরীর কাঁপতে শুরু করলো থরথর করে। অদ্ভুত এক টলমলে অবস্থায় সিট থেকে নামতে গেল সে। নিজের অজান্তেই আঁতকে উঠলো রানা, ভয়ংকর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। গ্রাইণ্ডিং মেশিনে একটু ছোঁয়া লাগতে যা দেরি, সাথে সাথে দু'ফাঁক হয়ে যাবে মাংস। বেঞ্চ ছেড়ে উঠলো রানা, কিন্তু ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে সলোমন। টলছে সে। কাঁপুনি আগের চেয়ে বেড়েছে। উল্টোদিকে নানা আকৃতির মেশিন, সবগুলো চালু, সেদিকে কাত হতে শুরু করলো সে।

লাফিয়ে উঠলো রানা।

ভাগ্যই বলতে হবে, কাত হয়ে পড়ে যাবার আগে সলোমনের একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। সময়মতোই পৌঁছুতে পারলো রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে মেঝেতে বসালো তাকে।

কপালে উঠে গেছে সলোমনের চোখ। কুলকুল করে ঘামছে সে। হাত আর পায়ে খিঁচুনি উঠে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই এটা সেই দ্বিতীয় স্ট্রোক, যার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন গভর্ণর। অভিনয় নয়, নির্ভেজাল অসুস্থতা। স্ট্রোকের লক্ষণগুলো নিখুঁত —না জানলে বিশ্বাস করা কঠিন ড্রাগের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

এরপর কি হবে জানা আছে। এখুনি অ্যাম্বুলেন্স চলে আসবে। ম্যানিংহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে সলোমন-

কে। তারপর…তারপর কি ?

তারপর কি জানতে হলে সলোমনের সাথে যেতে হবে রানাকে।

কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ ওকে পাঠাবে না। যাতে পাঠায় তার ব্যবস্থা ওকেই করতে হবে।

মেশিন শপের চারদিক থেকে হৈ-চৈ করে উঠলো কয়েদীরা। ছুটে এলো সবাই। আবার একটা ঝাঁকি খেলো সলোমন, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো রানা। চেষ্টা করলে তাল সামলে নিতে পারতো ও, কিন্তু চেষ্টা করলো না। সলোমনের সাথে যাবার সম্ভাব্য এই একটা রাস্তাই খোলা আছে, তাল হারিয়ে বেঞ্চে ঘষা খেলো রানা, তারপর কাত হয়ে পড়লো গ্রাইণ্ডিং মেশিনের দিকে।

বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটা লম্বালম্বিভাবে পলকের জন্যে ঠেকলো মেশিনে, নয় ইঞ্চি মাংস ফাঁক হয়ে গেল সাথে সাথে। রক্তের দর্শনীয় এবং সন্তোষজনক একটা স্রোত বেরিয়ে ভাসিয়ে দিল বেঞ্চটা।

আহত জায়গাটা চেপে ধরে মেঝেতে ঢলে পড়লো রানা। সলোমনকে ছেড়ে দেয়ায় সে-ও ঢলে পড়তে শুরু করলো। ছুটে এসে তাকে ধরে ফেললো হানিকাট। আশ্চর্য, রানা কোনো ব্যথা অনুভব করলো না। মেঝেতে শুয়ে লোকজনের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো ও, যেন কিভাবে কি ঘটলো কিছুই বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণের জন্যে উপস্থিত সবার মধ্যেই একটা দিশেহারা ভাব

দেখা গেল। চারদিকে ব্যস্ত ছুটোছুটি, চেঁচামেচি। আনাড়ি এক লোক হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে হড় হড় করে রানার মাথায় পানি ঢালতে শুরু করলো। গ্রাইণ্ডিং মেশিনটা তখনও চলছে, বন্ধ করার কথা কারো মাথায় আসেনি। কয়েক মুহূর্ত পর দু'ফাঁক হয়ে গেল ভিড়টা, হন হন করে হেঁটে এলো প্রিন্সিপাল অফিসার বুকার।

'ডাকাত পড়েছে নাকি, অ্যাঁ? এতো কিসের গোলমাল শুনি? সরো, দেখতে দাও আমাকে!' ডিউটি অফিসারকে ধাক্কা দিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো বুকার।

'সলোমনের আবার স্ট্রোক হয়েছে। নাহিদ না ধরলে ঢুকে যেতো মেশিনের ভেতর।'

রক্তের স্রোত দেখে সাদা হয়ে গেল বুকারের চেহারা। 'মাই গড, এমন রক্তারক্তি কাণ্ড হলো কি করে!'

'ধাক্কা খেয়ে গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ওপর পড়েছিল।'

হাঁটু মুড়ে বসে সলোমনকে পরীক্ষা করলো বুকার। ঠোঁট উল্টে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো সে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি অফিসারের দিকে ফিরলো। 'সিক বে থেকে একজোড়া স্ট্রেচার আনাও, জলদি! ওদের বলো ম্যানিংহ্যাম হাসপাতালে ফোন করুক। বলো সলোমনের এটা দ্বিতীয় স্ট্রোক, আমরা রওনা হয়ে গেছি।'

'আর নাহিদ?'

'সে-ও যাচ্ছে। জখম গুরুতর, এখানে কিছু করা যাবে না। অন্তত বারোটা সেলাই লাগবে হাতে। যাও!'

আশ্চর্যই বলতে হবে, ঠিক এই সময় শুরু হলো ব্যথাটা, অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখলো রানা। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

দশ

চোখ মেলার পর রানা শুধু মাকড়সার জাল দেখতে পেলো। বিশাল আকারের সব মাকড়সার জাল, খয়েরি, এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত, ধীর ভঙ্গিতে সামনে পিছনে নড়াচড়া করছে। চোখ বন্ধ করে মাথাচাড়া দিতে থাকা আতংকের সাথে যুঝলো ও। তারপর আবার যখন চোখ মেললো প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে জালগুলো।

হাসপাতালের সরু একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও। বাঁ হাতটা নেই।

মাথা একটু কাত করে পাশে তাকালো রানা। যেখানটায় বাঁ হাত থাকার কথা সেখানে মোটা ব্যাণ্ডেজ দেখলো, কিন্তু কাঁধের কাছ থেকে নিচের দিকে কোনো অনুভূতি নেই। ঝট্ করে

সব কথা মনে পড়ে গেল ওর। কামরার চারদিকে চোখ বুলালো।

ছোটো একটা ওয়ার্ড, ছ'টা বেড, তিনটেই খালি। একটায় রয়েছে লিকার, পা জোড়ার ওপর একটা খাঁচা নিয়ে শুয়ে আছে সে। অপর বেডে রয়েছে সলোমন। দু'জনেই হয় ঘুমিয়ে আছে, নয়তো জ্ঞান নেই।

দরজার কাছে ছোটো একটা টেবিল, দু'জন প্রিজন অফিসার তাস খেলছে। রানা নড়ে উঠতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তারা, খেলা ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এলো একজন। 'কেমন লাগছে তোমার?'

'পুলক,' বললো রানা। মনে মনে ভাবলো, সলোমনের সাথে অন্তত হাসপাতাল পর্যন্ত আসতে পেরেছি, এটা কি কম সাফল্য? শরীরের অবস্থা যাই হোক, মনটা তো পুলকিত হওয়ারই কথা। 'এখানে নিয়ে আসার পর কি ঘটলো জানো?'

'ডাক্তার অ্যানেসথেটিক দেয়, তারপর সেলাই করে।' সঙ্গীর দিকে ফিরলো প্রিজন অফিসার। 'ডাক্তারকে খবর দাও। জানাতে বলে গেছে।'

ক্লান্তিতে গোটা শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে, চোখ বন্ধ করলো রানা। মাথার ভেতরটা হালকা আর খালি খালি লাগলো। ঢোক গিলেও মুখের ভেতরটা ভেজানো যাচ্ছে না, শুকনো নিউজপ্রিন্ট হয়ে আছে। প্রিজন অফিসার টেলিফোনে কথা বলছে, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। চোখ খুলে আবার একবার হাতটার দিকে তাকালো রানা। একেবারে কিছুই অনুভব করছে না, তা নয়। অদ্ভুত একটা অসাড়

ভাব। হাতটার যেন তিন শো মন ওজন, এক চুল নাড়াবার শক্তি নেই। এতো ভারি লাগার কারণ, উপলব্ধি করলো রানা, পেইন-কিলিং ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। ব্যাণ্ডেজের ভেতর হাতের অবস্থা কতোটা খারাপ জানার কোনো উপায় নেই।

মেশিন শপে ঝুঁকিটা কিন্তু মারাত্মক নিয়েছিল সে। যদি একটা টেনডন ছিঁড়ে যেতো? আবার চোখ বুজলো রানা, কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে।

দরজা খোলার আওয়াজে চোখ খুললো ও।

ডাক্তার একজন আফ্রিকান, নিগ্রো। চেহারায় আদিবাসী একটা ভাব আছে, সম্ভবত নাইজেরিয়ান। ছ'ফুটের বেশি লম্বা, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, হাসি হাসি মুখ। রানার চোখে চোখ রেখে একটা হাত নাড়লো সে, বললো, 'হাই!'

বিছানার কিনারায় বসলো ডাক্তার। রানার হাত ধরে পালস পরীক্ষা করলো। 'কি রকম বোধ করছেন?'

'মাথার ভেতরটা হালকা, আর গলা শুকিয়ে কাঠ।'

'স্রেফ অ্যানেসথেটিকের আফটার-এফেক্টস। দুশ্চিন্তার কোনো ব্যাপারই নয়।' বেডসাইড লকার থেকে জগ ভর্তি পানি বের করে একটা গ্লাসে ঢাললো ডাক্তার। 'ঢক ঢক করে এটুকু খেয়ে ফেলুন, দেখবেন আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগবে।'

পানি খেয়ে আবার শুলো রানা। 'হাতটার কি অবস্থা—খুব কি খারাপ?'

মাথা নাড়তে নাড়তে নিঃশব্দে হাসলো ডাক্তার। 'টেলি-ভিশনে কি যেন বলে—আবার আপনি বেহালা বাজাতে পার-

বেন। আচ্ছা, আপনার মধ্যে কুসংস্কার আছে ? আপনি মনে করেন তেরো একটা অশুভ সংখ্যা ?'

'কেন বলুন তো ?'

'না, তেরোটা সেলাই পড়েছে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।' হাসছে ডাক্তার। 'কি করবো বলুন, আরেকটা সেলাইয়ের জায়গা ছিলো না।'

'এবার তাহলে আমাকে ফেরত পাঠাবেন ?'

'ফ্রাইডেঞ্চর্পে ?' উত্তর দেয়ার সময় ডাক্তারের চেহারায় সহানুভূতির কাছাকাছি একটা ভাব ফুটে উঠলো, 'এখুনি না। হাতটার ওপর আরো দু'চার দিন নজর রাখতে চাই আমি।'

স্বস্তির ভাবটুকু চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় তা সম্ভব হলো না। 'সলোমনের অবস্থা কি রকম বুঝছেন ?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'সিরিয়াস ?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল ডাক্তারের, কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'দ্বিতীয় স্ট্রোক—সিরিয়াস তো বটেই। কাল টেস্টগুলো করার পর আরো ভালো বোঝা যাবে। কথা তো অনেক হলো, এবার আপনাকে ঘুমাতে হবে।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেল, সাথে সাথে ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। প্রিজন অফিসাররা দু'জন এক সাথে এগিয়ে এসে সলোমন আর লিফারকে একবার দেখে গেল, তারপর আবার তাস নিয়ে বসলো।

ঘাড় ফিরিয়ে সলোমনের দিকে তাকালো রানা। শান্তভাবে ঘুমাচ্ছে সে, ঘুমন্ত চেহারায় অদ্ভুত একটা সরলতা ফুটে রয়েছে।

গভীর একটা শ্বাস টানলো রানা। এখন তাহলে কি ?

মঞ্চ তো তৈরি। পরবর্তী দৃশ্য কি হবে ?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো ও।

এরপর যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত। ওয়ার্ডের ভেতর ম্লান আলো আর গাঢ় ছায়া। বন্ধ জানালার কাঁচে অনবরত আঘাত হানছে ক্ষুদে বর্শা আকৃতির বৃষ্টির ফোঁটা। চোখ মেলেই রানা লক্ষ্য করলো খালি বিছানার সংখ্যা এখন আর তিনটে নয়, দুটো। অপরটায় একজন প্রিজন অফিসার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সঙ্গী লোকটা জেগে আছে, টেবিলে বসে একমনে পত্রিকা পড়ছে।

রানা মাথা তুলতেই তাকালো সে। 'কেমন আছো হে ?'

বিছানায় উঠে বসলো রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'বোধ হয় ভালো, ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখি হাঁটতে পারি কিনা।'

প্রিজন অফিসারের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। তবে চেয়ার ছেড়ে উঠলো না সে, বা আপত্তিও জানালো না। পা জোড়া বিছানা থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলো রানা, ওভাবে বসে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর মেঝের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো। প্রায় স্থির ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে দেখে সামনে পা বাড়ালো ও। ধীরে ধীরে হেঁটে ওয়ার্ডের আরেক প্রান্তে চলে এলো, ওয়াশবেসিনের সামনে। ক্লান্ত, হালকা লাগছে শরীরটা, তবে আর কোনো অসুবিধে নেই। ফেরার সময় আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারলো রানা, একটুও হাঁপালো না।

ফিরে এসে বিছানার কিনারায় বসলো, তারপর হঠাৎ করেই

উপলব্ধি করলো, বিস্ময়ের একটা ধাক্কার সাথে, ওর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সলোমন। রানা যেন এক আজব প্রাণী, দু'জন একই ঘরে রয়েছে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তারপর তার ভুরু জোড়া ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠলো। বিছানা থেকে নেমে এগোলো রানা, একটা চেয়ার টেনে সলোমনের পাশে বসলো। 'তোমার শরীর এখন কেমন, জো?'

'এসব কি?' সলোমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। 'কি ঘটছে এখানে?'

'ম্যানিংহ্যাম জেনারেলের সীল করা একটা ওয়ার্ডে রয়েছো তুমি,' বললো রানা। 'আরেকবার স্ট্রোক হয়েছিল তোমার।'

'তুমি? তুমি এখানে কি করছো?'

'ফ্রাইডেথর্পের মেশিন শপে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে তুমি,' মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো রানা। 'কাত হয়ে মেশিনারির ওপর পড়তে যাচ্ছিলে, আমি তোমাকে ধরে ফেলি। তারপর তোমার ধাক্কা খেয়ে গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ওপর পড়ে যাই। কিছুই তোমার মনে পড়ছে না?'

রানার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে তাকালো সলোমন। 'শুধু হাতে লেগেছে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'কি অবস্থা?'

'তেরোটা সেলাই। আরো খারাপ হতে পারতো। ওরা বোধহয় আরো দু'দিন এখানে রাখবে আমাকে।'

দ্রুত একটা ফোন করে ওদের কাছে চলে এলো প্রিজন অফিসার। 'ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। কেমন লাগছে শরীর?'

'রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছে,' বললো সলোমন। 'যা হোক কিছু একটা দাও।'

মাথা নাড়লো প্রিজন অফিসার। 'আগে শুনি ডাক্তার কি বলে।'

এক মুহূর্ত পর নক হলো দরজায়। ডাক্তার।

প্রিজন অফিসার দরজা খুলে দিলো। ভেতরে ঢুকে হন হন করে এগিয়ে এলো নাইজেরিয়ান আদিবাসী। বিছানায় বসে ভালো করে পরীক্ষা করলো সলোমনকে। হাসি ফুটলো তার মুখে। 'গুড—ভেরি গুড। ভালো ঘুম হওয়ায় একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর।'

'একটা শুয়োর, আর একটা খাসি দরকার,' বললো রানা। 'হাসবেন না, সত্যি দরকার।'

'এর মানে কি আপনাদের খিদে পেয়েছে?' ডাক্তারের দু'সারি দাঁত টিউব লাইটের মতো আলোকিত।

'ভীষণ।'

'দেখি কি করতে পারি,' বললো ডাক্তার। 'কিন্তু বসে থাকা চলবে না, দু'জনেই শুয়ে পড়ুন।' প্রিজন অফিসারের দিকে ফিরলো সে। 'মিঃ ম্যালকম, কিচেনে বলে যাচ্ছি আমি, ওদের কেউ খাবার নিয়ে আসবে। ভালো কথা, আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবে আমার কলিগ ডঃ টেনিসন যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন। তিনি নিজেই একবার টহল দিতে আসবেন, তবে

তার আগে তাঁকে যদি দরকার হয় সিস্টারকে ফোন করলেই পৌঁছে যাবেন তিনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রিজন অফিসার ম্যালকম বললো, 'ঠিক আছে।'

দরজা বন্ধ করে একটা হাই তুললো সে, হাত দিয়ে লাল চোখ জোড়া ডলতে ডলতে দুই বিছানার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। সলোমনকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'তোমার কিছু লাগবে?' ম্যালকমের বয়স হয়েছে, পঁয়তাল্লিশের কম নয়। সহকারীরা সবাই তাকে একটু নরম বলে জানে। হাঁটাচলার মধ্যে শ্লথ একটা ভাব।

'আমার একবার ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার,' বললো সলোমন। 'বেডপ্যান চিরকাল ঘেন্না করি আমি। নার্সের সাথে আপনিও আমাকে একটু ধরুন না, চেষ্টা করে দেখি যেতে পারি কিনা।'

সলোমনের বাঁ দিকে থাকলো রানা, ডান হাতটা ব্যবহার করবে। ম্যালকম থাকলো ডান দিকে। মাঝখানে সলোমনকে নিয়ে এগোবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। অথর্ব একটা বুড়োর মতো ধীরে ধীরে হাঁটলো সলোমন, তার প্রায় সবটুকু ভার ওদেরকে বইতে হলো। রানা জানে, সলোমন ধোঁকা দিচ্ছে, অথচ ফেরার সময় চিটচিটে ঘাম দেখা গেল তার কপালে। বিছানায় বসে ঘনঘন হাঁপাতে লাগলো সে। সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ওষুধের প্রতিক্রিয়া?

আবার টোকা পড়লো দরজায়। 'নার্স,' পুরুষকণ্ঠ।

দরজা খুলে দিলো প্রিজন অফিসার ম্যালকম। একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ভেতরে ঢুকলো নার্স। শুকরও নয়, খাসিও নয়, —পোচ করা মুরগীর ডিম, মাখন লাগানো রুটি, আর চা নিয়ে এসেছে! ট্রলি রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। খেতে বসে সলোমনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলো রানা। কথা বলার আগ্রহ নেই লোকটার, খেলো আস্তে-ধীরে, ভাব দেখালো এখনো ভীষণ ক্লান্ত। অথচ তারপরও তার হাবভাবে অদ্ভুত একটা উত্তেজনার ভাব। ম্যালকমের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইলেকট্রিক দেয়াল-ঘড়ির দিকে বার কয়েক তাকালো সে।

রানার অনেক পরে খাওয়া শেষ করলো সলোমন। ট্রলিটা দরজার কাছে রেখে গেছে নার্স, ট্রে-গুলো সেটার ওপর তুলে দিয়ে এলো ম্যালকম।

'একটা সিগারেট হবে নাকি, মিঃ ম্যালকম?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

চেহারায় দ্বিধা নিয়ে মাথা নাড়লো প্রিজন অফিসার। 'উঁহু,' বললো সে। 'ধূমপান তোমার জন্যে হারাম।'

'একটা সিগারেট দু'জন খাবো—দুটোর বেশি টান দেবো না,' বললো সলোমন। 'সারা জীবন খেয়ে এলাম, দুটো টান দিলে মরবো না।'

'তা মরবে না, কিন্তু…।'

'ডাক্তার বকবে আপনাকে?' গলা খাদে নামিয়ে সমাধান জানিয়ে দিলো সলোমন, 'দরজায় নক হলে নিভিয়ে ফেলবো। ধোঁয়া দেখে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি খাচ্ছিলেন।'

হেসে ফেললো ম্যালকম। দয়ার শরীর, দু'জনকে একটা করে দিলো সে। দিয়াশলাই জ্বেলে ধরিয়েও দিলো। তারপর টেবিলে ফিরে গিয়ে পত্রিকা নিয়ে বসলো।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট তখন। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, নেই কোনো অস্থিরতা, অথচ রানার মনে হতে লাগলো যে-কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তেজনার চাপে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে পরিবেশটা। ওরা যেন টাইম সেট করা বোমার ওপর বসে আছে, বিস্ফোরণের নির্দিষ্ট সেকেণ্ড উপস্থিত, এই বুঝি ফাটলো।

বিছানায় পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে সলোমন। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সিলিঙে। আঙুলের ফাঁকে আলগা হয়ে রয়েছে সিগারেট, হাতটা যতোবারই সে মুখের সামনে তুললো একটু একটু কাঁপতে দেখলো রানা। লোকটা যে ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ন'টা বাজতে আড়াই মিনিট।

রানাকে একবার দেখে নিয়ে আবার সিলিঙের দিকে তাকালো সলোমন।

'কিছু বলবে নাকি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো রানা।

সলোমন নড়লো না, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি।

ন'টা বাজতে দু'মিনিট।

'সময় থাকতে,' সিলিঙের দিকে চোখ রেখেই রানাকে বললো সলোমন, 'জানিয়ে রাখি, তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, নাহিদ। মেশিনশপে আমার উপকার করেছো। প্রথমে লিফারকে ঠেকালে, তারপর সময় মতো ছুটে এসে আমাকে ধরলে। সত্যি ঋণী হয়ে

থাকলাম তোমার কাছে।'

'ও কিছু না।'

'অন্তর দিয়ে অনুভব করি, তোমার জন্যে কিছু করা দরকার আমার,' আবার বললো সলোমন, 'কারো কাছে ঋণী থাকা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু কোনো সুযোগই নেই। যাই ঘটুক, আমি চাই আমার এই মনোভাবটুকু উপলব্ধি করো তুমি।'

'কি বলছো কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

সলোমন উত্তর দেয়ার আগেই দরজায় নক হলো।

প্রথমে দরজার চেইন খুললো ম্যালকম। 'কে?'

'আমি,' মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে থেকে। 'ডঃ টেনিসন।'

তালা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো ম্যালকম।

লোকটার পরনে সাদা কোট, কোটের একটা পকেট থেকে অফিশিয়াল সার্টিফিকেটের মতো ঝুলছে স্টেথোস্কোপ। ম্লান, সরু চেহারা, চেহারায় মিটিমিটি হাসিটুকু স্থির হয়ে আছে, যেন সেলাই করা। হাসিটা দেখে মনে হতে পারে লোকটা যেন অনেক আগেই বুঝে নিয়েছে জীবন একটা বাজে কৌতুক বৈ কিছু নয়।

চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের একটা ভাব ধরে রাখার চেষ্টা আছে, কিন্তু রানার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না সে—একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে নিলো ও, লোকটা অপরাধ জগতের বাসিন্দা, একজন প্রফেশনাল। সেই সাথে এক ধরনের সতর্কতা

অনুভব করলো ও, বিপজ্জনক চরিত্র, সাবধান থাকতে হবে।

'এখানের খবরাখবর সব তাহলে ভালো?' হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললো লোকটা। সলোমনের দিকে নয়, রানার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে একটা চোখ টিপলো সে। রানা লক্ষ্য করলো, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লেও লোকটার চোখ দুটো হাসছে না। ঘরের দিকে পিছন ফিরে দরজা বন্ধ করছে ম্যালকম, টেনি-সনের হাতে একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট বেরিয়ে এলো। হাসতে হাসতেই ম্যালকমের খুলির গোড়ায় উল্টো করা অটোমেটিক দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো সে।

গুঙিয়ে উঠে দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল ম্যালকম।

তারপরই শোনা গেল চাপা একটা হুংকার। ঘুম ভেঙে গেছে দ্বিতীয় প্রিজন অফিসারের। লাফ দিয়ে হুংকার ছেড়েছে সে। টেনিসন আওয়াজটা শুনলো, কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার সময় পেলো না, শূন্য থেকে ব্যাঙের আকৃতি নিয়ে তার পিঠে সওয়ার হলো প্রিজন অফিসার।

আশ্চর্য, ছদ্মবেশী ডাক্তার আছাড় খেলো না। প্রিজন অফি-সারকে পিঠে নিয়েই এলোমেলো পায়ে টলতে টলতে খানিকটা এগোলো, ঠকাস করে কপালটা ঠুকে গেল দেয়ালের সাথে।

সেই ধাক্কায় হাতের অটোমেটিক খসে পড়লো। মেঝেতে ঘষা খেয়ে ঘরের আরেক দিকে চলে গেল সেটা। তারপর আছাড় খেলো দু'জনেই। ডাক্তারের ঘাড়ের ওপর প্রিজন অফিসার। লাফ দিয়ে এগোলো সলোমন।

থাবলা দিয়ে প্রিজন অফিসারকে ধরলো সে, হ্যাঁচকা টান

দিয়ে তুলে আনলো ডাক্তারের ঘাড় থেকে। আরেক হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুললো, তারপর ছুঁড়ে দিলো দেয়াল লক্ষ্য করে। সলোমনের গায়ের জোর হতভম্ব করে দিলো রানাকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়লো প্রিজন অফিসার, ছুটে গিয়ে দমাদম তার মাথায় আর ঘাড়ে কয়েকটা লাথি মারলো সলোমন। মানুষ নয়, হিংস্র পশুর মতো লাগলো তাকে। থামছে না, অথচ অফিসার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সলোমনের একটা হাত ধরে ফেলে বাধা দিলো টেনিসন। 'খুন-টুন যদি করতে হয়, সেজন্যে আমিই তো আছি, বুড়ো খোকা—ক্ষ্যামা দাও।'

মনে মনে বিস্ময় মানলো রানা। সলোমন একটু হাঁপাচ্ছে না পর্যন্ত।

'শালা আরেকটু হলে দিয়েছিল সব গোলমাল করে।' প্রিজন অফিসারকে শেষ একটা লাথি মেরে হাসতে লাগলো সলোমন। 'ভুলটা অবশ্য আমারই—ওর দিকে একটা চোখ রাখা উচিত ছিলো।'

'আমি কোনো অভিযোগ করছি না, বুড়ো খোকা!' টেনিসন এখনো হাঁপাচ্ছে।

'জাদু দেখিয়ে দিলে হে,' সলোমনকে বললো রানা। 'স্ট্রোক হবার পর এতো তাড়াতাড়ি কেউ সুস্থ হতে পারে, আমার ধারণা ছিলো না।' মুচকি হাসলো ও। 'আমি বলবো, মেশিন শপে যে অভিনয় দেখিয়েছো তোমার অস্কার পাওয়া উচিত।'

তিন কি চার ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা, সলোমন যখন ঘাড়

ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো, ওর হাত দুটো তখন পিছনে।

'অভিনয়? আরে না, অভিনয় কেন হতে যাবে! সমস্ত কৃতিত্ব মারোফাইন নামে একটা ওষুধের। স্ট্রোকের সমস্ত লক্ষণ থাকবে, কিন্তু আফটার-এফেক্টস থাকবে না।'

এমন মুখভঙ্গি করলো রানা যেন দারুণ প্রভাবিত হয়েছে। 'সত্যি এ-ধরনের প্ল্যানের তুলনা হয় না।'

'উপভোগ্য সংলাপ,' ওদেরকে বাধা দিয়ে বললো টেনিসন। 'কিন্তু জীবন আর সময়ের দর এই মুহূর্তে সমান। এখুনি আমাদের কেটে পড়া উচিত।'

'আমার কোনো আপত্তি নেই,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো রানা।

মিটিমিটি হেসে ধৈর্যের পরিচয় দিলো ডাক্তার। 'দুঃখিত, বুড়ো খোকা, এবারের সুযোগটা তুমি কাজে লাগাতে পারছো না। শুধু একজনের জন্যে আমাদের ভাড়া করা হয়েছে।'

'আসলেও তাই, নাহিদ,' বললো সলোমন। 'মোটা টাকা ছাড়া ওরা কাউকে সাহায্য করে না।'

পিছন থেকে হাতটা সামনে আনলো রানা, টেনিসনের অটোমেটিকটা তাক করলো ওদের দিকে। 'এটা কি বলছে শুনতে পাচ্ছো না? হয় আমরা সবাই যাবো, নাহয় কেউ যাবে না।'

টেনিসনের সঙ্গের সাথী মিটি মিটি হাসি অদৃশ্য হলো, ঝোঁকের মাথায় এক পা সামনে বাড়লো সে।

দ্রুত সাবধান করলো সলোমন, 'করো কি!' দিশেহারা বোধ করছে সে, মনে দ্বিধা। 'ও সিরিয়াস!'

টেনিসন কাঁধ ঝাঁকালো। 'কাউন্ট ব্যাপারটা পছন্দ করবেন

না।'

'তোমার কাউন্ট তো টাকার ভুখা,' বললো সলোমন। 'ওর জন্যে আলাদা বিল করবে সে, ব্যস, চুকে গেল। তাড়াতাড়ি বলো এবার, এখান থেকে বেরুবো কিভাবে?'

'টাকা অবশ্য কথা বলে, তা সত্যি।' টেনিসনের ঠোঁটে মিটি মিটি হাসিটা ফিরে এলো আবার। দরজা খুলে বাইরে তাকালো সে, তারপর বাইরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখা হুইল চেয়ারটাকে টেনে ভেতরে ঢোকালো। 'কারো সাথে দেখা হলে তার চোখে ধুলো দেয়া যাবে। করিডরের শেষ মাথায় এলিভেটর, বেসমেন্টে নামবো,' বেরোবো স্টাফ এন্ট্রান্স দিয়ে। এতো রাতে কেউ কোথাও নেই। বাইরে গাড়ি আর কাপড়-চোপড় আছে, কিন্তু একজনের জন্যে।' রানার দিকে তাকালো সে। 'হাসপাতালের ছাপ মারা পা'জামা আর ড্রেসিং গাউন পরে কতো দূরে যেতে পারবে তুমি আমি জানি না।'

'ওটা কোনো সমস্যাই নয়,' বললো রানা। ইঙ্গিতে ম্যালকমকে দেখালো ও। 'লম্বা-চওড়ায় আমরা দু'জন প্রায় সমান। ওর সব খুলে নাও। ইউনিফর্ম জ্যাকেট লাগবে না, শুধু ট্রাউজার, শার্ট, আর পুলওভার।'

কেউ আর কথা বাড়ালো না। দু'মিনিট পর কাপড়গুলো রানার দিকে ছুঁড়ে দিলো সলোমন। ওয়ার্ডের আরেকপ্রান্তে সরে গেল রানা, নাগালের মধ্যে পিস্তলটা রেখে দ্রুত পরে নিলো ওগুলো। 'ভেবো না তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি, সলোমন,' ব্যাখ্যা করলো ও। 'কিন্তু আমি জানি, আমার

জন্যে তোমার এই পালানোর সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে মনে হলে স্রেফ আমার গলা কাটবে তুমি।'

নাক দিয়ে ভোঁতা একটা আওয়াজ করলো সলোমন, এদিক ওদিক মাথা নাড়লো, চেহারায় উদার প্রশংসার ভাব। 'দুঃখ এই যে তোমার সাথে ক'বছর আগে আমার দেখা হয়নি, নাহিদ। দু'জন মিলে কি না করতে পারতাম!'

হুইল চেয়ারে বসলো সে, ঝুঁকে পায়ের ওপর টেনে দিলো চাদরটা। গায়ের কোট খুলে রানার দিকে ছুঁড়ে দিলো টেনিসন। 'এটা পরে হুইলচেয়ার ঠেলবে। আমি একহাতে স্টেথোস্কোপ দোলাবো।'

'ওদের দু'জনকে বাঁধবে না?'

'লাভ কি! আসল টেনিসন যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে। চলো-চলো, আর দেরি নয়। সময় এদিক ওদিক হয়ে গেলে বিপদে পড়তে হবে।'

'তোমার নামটা তো জানা হলো না,' বললো রানা। 'কেউ তোমাকে অন্য কারো নামে ডাকলে তুমি অস্বস্তিবোধ করো না?'

'না, কেন অস্বস্তিবোধ করবো? নামে কি আসে যায়? তুমি আমাকে যে-কোনো নামে ডাকতে পারো।' মিটি মিটি হেসে দরজার দিকে এগোলো টেনিসন। 'তবে একান্তই যদি নির্দিষ্ট একটা নামে ডাকতে চাও... জনি হলে কেমন হয়? নামটা সুন্দর, না? কেউ আমাকে জনি বলে ডাকুক এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।'

মুখ হাঁড়ি করে সলোমন বললো, 'কে বলবে ক্ষুরের ওপর

দিয়ে হাঁটছি আমরা।'

খালি করিডর। এলিভেটর পর্যন্ত নিরাপদে চলে এলো ওরা, কিছুই ঘটলো না। বোতামে চাপ দিলো জনি, নিচ থেকে উঠে এলো এলিভেটর। বেসমেন্টে পৌঁছে খুলে গেল দরজা, কোনোরকম ইতস্তত না করে বেরিয়ে এলো জনি, হুইলচেয়ার নিয়ে পিছনে থাকলো রানা।

প্রায় খালিই বলা চলে বেসমেন্ট, লোডিং বে-তে শুধু দুটো অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কিছু নড়ছে না। শেষ মাথায় পৌঁছুলো ওরা, কারো সাথে দেখা হলো না। সামনে দরজা, শুধু স্টাফরা ব্যবহার করে। বেরিয়ে এলো ওরা বাইরে।

পোর্চের ওপর নগ্ন একটা বালব জ্বলছে। বালবের হলদেটে আলোয় বৃষ্টির সূক্ষ্ম কণাগুলো ঝিলমিল করছে। ধাপগুলোর নিচে একটা পুরনো ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। পোর্চ থেকে নামার আগে উঁকি দিলো জনি। দু'জন নার্স, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে গাড়ি-পথ ধরে মেইন গেটের দিকে ছুটছে। আর কেউ নেই আশ-পাশে।

গেটের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়ে দুটো। একটা গাড়ির আওয়াজ শুনলো ওরা। তরতর করে ধাপ বেয়ে নিচে নামলো জনি। ভ্যানের পিছনের দরজা খুললো সে। ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝাঁকালো। সলোমনের পিছু পিছু ধাপ বেয়ে নামলো রানা। উঠে পড়লো ভ্যানে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তালায় চাবি ঘুরলো। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে স্টার্ট নিলো

গাড়ি। ছুটতে শুরু করে অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেল।

রওনা হবার কয়েক মিনিট পর গাড়ির ভেতর একটা আলো জ্বলে উঠলো। এক কোণে কাপড়ের একটা স্তূপ দেখলো সলোমন। জুতো থেকে রেনকোট পর্যন্ত যা যা দরকার সবই আছে, প্রতিটি ওর গায়ের মাপমতো।

খুব যে একটা জোরে ছুটছে গাড়ি তা নয়, কাপড় বদলাতে কোনো অসুবিধে হলো না। মাত্র শেষ করেছে, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো ভ্যান। এঞ্জিনও বন্ধ হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে নিচে নামলো জনি। ঘুরে পিছন দিকে এসে তালা খুললো দরজার।

'কোথায় থামলাম আমরা?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইলো সলোমন।

'দেখার কাজটাও কি তোমাদের হয়ে আমি করবো?' মিটি-মিটি করে হাসছে জনি।

জায়গাটা বোধহয় শহরের মাঝখানে কোথাও। একটা কার পার্কে থেমেছে ভ্যান, চারদিকে আকাশ-ছোঁয়া দালান-কোঠা।

'এ কোন্ জায়গা?' আবার জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'ম্যানিং-হ্যাম?'

'অতো কথা জেনে দরকার নেই,' বললো জনি। 'এখানে গাড়ি বদলের জন্যে থামা হয়েছে।' একটা ট্রেঞ্চকোট, আর একটা সিল্ক স্কার্ফ রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। 'দান করার একদম পক্ষপাতি নই আমি, কিন্তু তোমার এগুলো দরকার হবে।'

হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো তার, চোখ বাদে। 'এবার কি আমি আমার পিস্তলটা ফেরত পেতে পারি, বুড়ো খোকা?'

'ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারি,' বললো রানা। 'কাজেই এটাও আমার একটা দান বলে জেনো।' পিস্তলটা জনির হাতে ধরিয়ে দিয়ে টেঞ্চকোটটা পরতে শুরু করলো ও।

ম্যাগাজিন খুলে দেখলো জনি, তারপর ক্লিক শব্দের সাথে জায়গামতো বসিয়ে রানার দিকে চোখ তুললো। 'একটা ঝোঁক দমন করলাম, বুড়ো খোকা। বিলিভ মি।'

'জানি,' বললো রানা। 'কিন্তু এখানে আমার লাশ পড়ে থাকলে তোমার প্ল্যানের বারোটা বাজবে, এ-ও সত্যি। এখানে যারা পৌঁচেছে, এরপর তারা কোন্ দিকে যাবে, পানির মতো সহজেই বুঝে নেবে পুলিশ।'

'জানতাম এই কথাগুলোই বলবে তুমি, বুড়ো খোকা,' বললো জনি। 'ঠিক হ্যায়, আরেক সময় দেখা যাবে। এসো তাহলে সবাই।'

পার্কিং এরিয়ার শেষ মাথায়, গাঢ় ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। একটা ভক্সহল। দেরি না করে গাড়ি ছেড়ে দিলো জনি। ম্যানিংহ্যাম থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা ধরলো সে। দশ মিনিটের মধ্যে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওরা, গ্রাম এলাকায় পড়লো গাড়ি।

রেডিও অন করলো জনি। গান বাজছে। তারপর এক সময় গান থামলো। সিটে হেলান দিলো সে। চোখ দুটো রাস্তার ওপর। 'এবার ব্যবসার কথা হতে পারে, কি বলো, মিঃ সলো-

মন ?'

'ভাবছিলাম প্রসঙ্গটা তুলতে দেরি করছো কেন।'

মৃদু শব্দে হাসলো জনি। 'মজার ব্যাপার কি জানো ? রিড কোয়েন ঠিক এই কথাটাই বলেছিল।'

ঘাড় ফেরালো সলোমন। 'রিডকেও তুমি বের করে আনো ?'

'অবশ্যই। বড় কাজগুলো আমাকে দিয়েই করান কাউন্ট।'

রানা চাইছে জন হেরিক আর রিপ হুটনের কথাও জিজ্ঞেস করুক সলোমন। একই দলের লোক ওরা, সলোমনেরই জিজ্ঞেস করা সাজে।

'সে এখন কোথায় ?' জানতে চাইলো সলোমন।

'রিড কোয়েন ?' বড় করে হাসলো জনি। 'অনেক, অনেক দূরে, মিঃ সলোমন। এই একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারি—কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমাদের গ্যারান্টেড সার্ভিসের এটাই হলো বৈশিষ্ট্য।'

জনি থামতেই রানা জিজ্ঞেস করলো, 'বড় কাজ আর ক'টা করেছো তুমি ?'

'কেন, তা জেনে তোমার কি দরকার, বুড়ো খোকা ?'

মিটিমিটি হাসিটা রানার গা জ্বালিয়ে দিলো। 'না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। কি রকম যোগ্য লোকের হাতে পড়েছি সেটা জানতে চাওয়া কি খুব অন্যায় ?'

'জন হেরিককেও এই বান্দা বের করে আনে,' সগর্বে বললো জনি। 'তালিকায় আরো অনেক আছে হে, শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে।'

রানার ইচ্ছেটা পূরণ করলো সলোমন। 'রিপ হটন? তাকে কে বের করে?'

কাঁধ ঝাঁকালো জনি। 'কেন জানি না, রিপ হটনকে তেমন দক্ষ বলে মনে করেননি কাউন্ট,' বললো সে। 'তা মনে করলে তাকে বের করার দায়িত্বটাও আমাকেই দিতেন।'

'তাহলে কে বের করলো তাকে?'

'আমাদেরই কোনো লোক,' বললো জনি। 'কে, সঠিক বলতে পারবো না।'

'সে কোথায় তাও তুমি জানো না?'

'না,' বললো জনি। 'তবে সবার পরিণতিই এক রকম হয় আগে বা পরে। প্রত্যেককে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেখানে তাদের কোনো দুঃখ থাকে না, ভয় থাকে না। খোশ গল্প অনেক হয়েছে, এবার কাজের কথা হোক। নগদ নারায়ণ প্রসঙ্গে কিছু বলো। তুমি আমাদের শর্ত সম্পর্কে সব জানো—বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের কাজ আমরা শেষ করেছি—বের করে এনেছি তোমাকে। এবার তোমার পালা। টাকাগুলো কোথায় আছে বলো, তারপর শুরু হবে অপারেশনের দ্বিতীয় পর্ব।'

শান্তভাবে সলোমন বললো, 'নগদ কিছু নেই।'

গাড়ি দিকভ্রান্ত হলো, সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল জনি। 'ঠাট্টা দেখছি ভালোই জানো!'

'ঠাট্টা নয়। ডাচ হুণ্ডি ব্যবসায়ীদের সাথে আমস্টারডামে একটা চুক্তি করি আমি। আমার ভাগের বিশ লাখ পাউণ্ড দিয়ে হীরে

কিনেছি।'

'মন্দ নয়, সত্যি মন্দ নয়। পাঁচ বছরে টাকার মান কমেছে, কিন্তু হীরের দাম আরও বেড়েছে। কোথায় সেগুলো?'

'লণ্ডনে। জারমিন স্ট্রীটের একটা সেফ-ডিপোজিটে, জমা দেয়া আছে এডওয়ার্ড ব্রিজ-এর নামে। কোম্পানির বৈশিষ্ট্য হলো, একটা চাবি থাকে খদ্দেরের কাছে, আরেকটা থাকে ম্যানেজারের কাছে। বাক্সটা খোলার জন্যে দুটো চাবিই দরকার হবে তোমার।'

'তোমার চাবিটা কার কাছে?'

'আমার কেউ থাকলে তবে তো তার কাছে রাখবো,' বললো সলোমন। 'চাবিটা আমি ফেলে দিয়েছি।'

'হোয়াট!'

'ডাস্টবিনে।'

'কি!' চোখ কপালে উঠলো জনির।

সলোমন হাসছে। 'ডাস্টবিনের মতো নিরাপদ জায়গা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে? মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা রোজ সকালে এসে আবর্জনা তুলে নিয়ে যায়, কিন্তু সব আবর্জনা কি তোলে? তোলে না। ফলে মেঝেতে ময়লার একটা স্তর থেকেই যায়। আমি সেই ময়লার ওপর বসে কংক্রিটের মেঝে খুঁড়ি, চাবিটা প্লাস্টিকে জড়িয়ে মাটির নিচে পুঁতে ফেলি। ডাস্টবিনে যখন নামি আর যখন উঠি, দু'বারই কেউ আমাকে দেখেনি, কাজেই ওঠা-নামার মাঝখানের সময়টাও কেউ আমাকে দেখেনি, ঠিক?'

হাঁ করে সলোমনের দিকে তাকিয়ে আছে জনি। বিস্ময়ের ধাক্কায় হাসতে পর্যন্ত ভুলে গেছে সে।

'কখনো ডাস্টবিনের ভেতর বসেছো?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'বিশেষ করে লণ্ডনের ডাস্টবিনে? ওগুলো এতো গভীর, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ভেতরের সবটুকু দেখা যায় না।'

রানা অন্যমনস্ক। হাসানের কথা মন থেকে সরাতে পারছে না। রিপ হটনের ভূমিকায় অভিনয় করছিল সে। অভিনয় নিখুঁত হলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পরিচয় গোপন রাখা তার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি। সলোমনকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে, হাসানকেও সে-প্রশ্ন করা হয়েছে। সলোমন যেভাবে উত্তর দিতে পারছে, হাসানের তা পারার কথা নয়। রিপ হটনের বিশ লাখ পাউণ্ড কোথায় আছে তা সে জানবে কিভাবে? সম্ভবত এই পর্যায়ে এসেই ধরা পড়ে যায় হাসান।

তারপর কি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে? নাকি কাউণ্টের কাছে পাঠানো হয়েছে? দ্বিতীয়টার সম্ভাবনাই বেশি। হাসানের পরিচয় জানতে চাইবে কাউণ্ট। জানতে চাইবে হাসান কার প্রতিনিধিত্ব করছে। কতোটুকু কি জানে সে। তারমানে কি এখনো বেঁচে আছে হাসান?

'কোন্ ডাস্টবিনে? কোথায় সেটা?' জিজ্ঞেস করলো জনি।

'খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়,' বললো সলোমন। 'বলতে পারো একেবারে বাঘের ঘরের পাশেই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পিছনে প্রথম যে সরু গলিটা, সেই গলির মাঝামাঝি জায়গায়। প্রতি

বছর ডাস্টবিন বদলানো হয়, কিন্তু জায়গাটা বদলায় না। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, পঞ্চাশ বছরে একবারও বদলায়নি।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জনি। ধীরে ধীরে পরিচিত হাসিটা এতোক্ষণে ফিরে এলো মুখে। 'তুমিই তোমার তুলনা, জো সলোমন। তোমার মতো লোককে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে সত্যি সুখ আছে। ঠিক হ্যায়, চেইনের মাধ্যমে পরবর্তী স্টেশনে তথ্যগুলো পাঠিয়ে দেবো আমি।'

'আর আমরা? আমাদের কি হবে?'

'তোমাদের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে লোক আছে। সব কিছু যদি ঠিকঠাক মতো ঘটে, অপারেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করবে ওরা। তবে তার আগে তোমার হীরে থেকে ঠিকরানো আলোর রঙ দেখতে চাইবেন আমাদের কাউন্ট। ও, হ্যাঁ, আরো একটা কথা··· ।'

'আবার কি কথা?'

'মিঃ নাহিদ শাহ, তার জন্যে আলাদা ফি দিতে হবে।'

হ্যাঁ-না কিছু না বলে সলোমন জিজ্ঞেস করলো, 'কাউন্টের সাথে আমাদের দেখা হবে কখন?'

'দেখা হবেই এমন কোনো কথা নেই,' বললো জনি। 'তিনি যদি চান, তাহলেই শুধু দেখা হতে পারে। দেখা হোক বা না হোক, নিরাপদ আশ্রয়ে ঠিকই তোমরা পৌঁছে যাবে। আমাদের কাজের সিস্টেম হলো, মক্কেলদের এক হাত থেকে আরেক হাতে তুলে দেয়া। সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই এই সিস্টেম নিরাপদ।'

'শেষ মাথায় পৌঁছে ডায়মণ্ড আর প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র পেয়ে যাবো ?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'অর্ধেক ডায়মণ্ড,' বললো জনি। 'তা থেকে আবার তোমার বন্ধুর জন্যে কিছু নেবো আমরা। দেনাটা ও তোমার কাছে কক্রক।'

'সেজন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' বললো রানা। 'আমার দেনা আমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবো।'

সামনে একটা বাঁক। বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এলো ভক্সহল। এক মাইল এগিয়ে গাড়ি থামালো জনি। বৃষ্টি আগেই থেমে গেছে, মেঘেরাও উধাও হয়েছে আকাশ থেকে, পাহাড়ের মাথা থেকে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। চাঁদের আলোয় একটা ফার্ম হাউস দেখা গেল। কোনো প্রাণের সাড়া নেই, সম্ভবত পরিত্যক্ত।

'বুড়ো খোকারা, এবার তোমরা নামো,' বললো জনি। 'আমার দৌড় এ-পর্যন্তই।'

রানার পিছু পিছু রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর নামলো সলোমন। চারদিকে চোখ বুলালো সে। 'এটা কি রকম হলো ?' জিজ্ঞেস করলো জনিকে। 'তুমি চলে যাবে নাকি ?'

হাতের ঘড়ি খুলে জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিলো জনি। 'এটা রাখো। এখন ন'টা পঁয়ত্রিশ। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের লোক এসে তোমাদের নিয়ে যাবে।'

'গাড়িটা কি হবে ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তা তো জানি না,' বললো জনি। 'সে তোমাদের জিজ্ঞেস

করবে, কোথায় যেতে চাও বলো তোমাদের আমি পৌঁছে দিই। তোমাদের বলতে হবে, ব্যবিলন। সে বলবে, ব্যবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাদের আমি পৌঁছে দিতে পারি। মুখস্থ করে নাও, তা না হলে ভুলে যাবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো সলোমন। 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?'

'না থাকলে তোমরা ছাড়া পেতে?' বলে গাড়ি ছেড়ে দিলো জনি। একটু পরই রাস্তার শেষ মাথায় হারিয়ে গেল ভক্সহল।

এক মিনিট বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা। নির্জন রাস্তা, চারদিকে কোথাও প্রাণের কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

'চিমটি কেটে দেখবো নাকি?' নিস্তব্ধতা ভাঙলো সলোমন। 'দুঃস্বপ্ন দেখছি কিনা?'

'নিজেকে হলে কাটতে পারো।'

'না, ঠাট্টা নয়,' গম্ভীর হলো সলোমন। 'তোমার কি মনে হয়? ওরা আমাদের কাঁচকলা দেখালো?'

'মনে হয় না,' বললো রানা। 'অনেক কিছু হারাবার ভয় আছে ওদের। কাঁচকলা দেখাতে চাইলে আমাদের একটা বিহিত করতে হবে। অন্তত সেজন্যে হলেও কেউ একজন আসবে।'

'আমারও তাই মনে হয়। এসো সিগারেট ধরাই।'

গাড়ির আওয়াজ রানাই প্রথম শুনতে পেলো। রাস্তায় উঠে এসে পাহাড়গুলোর নিচের দিকে তাকালো ও, ছায়াগুলো ওখানে গাঢ়, তার ভেতর এক জোড়া হেডলাইট জ্বলছে।

'ওটাই কি?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

আরো কয়েক সেকেণ্ড দেখলো রানা, চোখ কুঁচকে সরু সরু হয়ে উঠলো ওর। তারপর মাথা নাড়লো। 'মনে হয় না। ওটা তো একটা পেট্রল ট্যাংকার আসছে।'

এগারো

বাঁক নিয়ে গ্রেট নর্থ রোডে উঠলো ভক্সহল। রাস্তার পাশে প্রথম যে কাফেটা দেখলো তার সামনে থামলো জনি। সরাসরি ফোন বক্সে ঢুকলো সে।

দু'জায়গায় ফোন করলো জনি। প্রথমটা অনেক দূরে, ম্যানুয়্যাল এক্সচেঞ্জ বলে লাইন পেতে বেশ একটু দেরি হলো। প্রায় পাঁচ মিনিট পর ভোঁতা একটা ওর্কশায়ার কণ্ঠস্বর শুনলো সে, বাধা দিয়ে বললো, 'তুমি হোফার টুইড। শোনো, প্রোগ্রামে একটু গোলমাল হয়েছে। তুমি একটা প্যাকেট পাবে বলে আশা করছো, কিন্তু তোমাকে নিতে হবে দুটো।'

'দুটো?'

'হ্যাঁ,' বললো জনি। 'ভেবে দেখো নিতে পারবে কিনা। না পারলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। নিলে তুমি অবশ্য ফি বেশি পাবে—ডাবল।'

খ্যাক খ্যাক করে হাসলো হোফার টুইড। এমন সুরে কথা বললো সে যেন গরু-ছাগল দর করছে। 'আসলে হওয়া উচিত ডবলের কিছু বেশি, তাই না? প্রস্তাবটা হঠাৎ করে পেলাম তো, প্রস্তুতির ব্যাপার আছে, টেনশনের কথা নাহয় বাদই দিলাম।' এক সেকেণ্ড বিরতি নিলো সে, জনি হ্যাঁ-না কিছু বলছে না দেখে তাড়াতাড়ি শুরু করলো আবার, 'ঠিক আছে, রাজি। ডবলেই আমি সন্তুষ্ট।'

'আমি জানতে চেয়েছি, কাজটা তুমি করতে পারবে কিনা।'

'কেন পারবো না? সময় একটু বেশি লাগবে এই যা। আর একটু সাবধান থাকতে হবে। এতো দিন ধরে একই কাজ করছি, পারবো না মানে?'

'গুড।'

'ও, ভুলেই গেছি,' বললো হোফার টুইড, 'আমার স্ত্রী যে ক্লেসিক সে তো আপনাকে আমি আগেই বলেছি, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন, কি হয়েছে?'

'কি আবার হবে!' ত্যক্ত কণ্ঠে বললো টুইড, 'কাল রাতে মারা গেছে। আর সময় পেলো না।'

'শুনে দুঃখ পেলাম।'

'কি বললেন?'

'দুঃখ পেলাম শুনে।'

'আপনার রাগ হচ্ছে না?'

উত্তর না দিয়ে জনি জিজ্ঞেস করলো, 'লাশটা কোথায়?'

'বাড়িতেই। কাল সকালে ব্যবস্থা হবে।'

'আর কাজটা?'

'চেষ্টা করবো রাতেই যাতে সারতে পারি।'

'ঠিক আছে,' বললো জনি। 'খবর নেবো আমি।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো সে। তারপর পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে আবার ক্রেডল তুললো, এবার ডায়াল করলো লণ্ডনের নম্বরে।

প্রায় সাথে সাথে অপরপ্রান্ত থেকে একটা মার্জিত মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো, 'ইউনিভার্সেল এক্সপোর্ট।'

'হ্যালো, সুইটি, কাউন্টি ডারহাম থেকে রবার্ট পিয়ারসন আমি তোমার নাগর বলছি।'

'অসভ্যতা করার আরো অনেক সময় পাবে। কি ঘটেছে তাই বলো। এইমাত্র টিভির খবর শুনলাম। দুটো প্যাকেট, একটা নয়—ব্যাপারটা কি?'

'সত্যি কিছু করার ছিলো না। দু'নম্বর প্যাকেটটার ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট নই। কেমন যেন গোলমেলে। তবু, কিছু এসে যায় না। দুটোই নেবে বলে রাজি হয়েছে টুইড। দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে।'

'খবরটা তাহলে জায়গামতো জানাতে হয় আমাকে। নারায়ণ কোথায় আছে?'

'নেই, আছে আরো অনেক ভালো জিনিস। হীরে। জারমিন

রানা

স্ট্রীটের একটা সেফ ডিপোজিটে, এডওয়ার্ড ব্রিজের নামে।'

'চাবি?'

'হেসো না,' বললো জনি। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পিছনে প্রথম যে গলিটা পড়বে, তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ডাস্টবিন আছে...'

'আছে,' অপরপ্রান্ত থেকে বললো মেয়েটা। 'ওদিকেই থাকি আমি।' তারপরই বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ করলো সে। 'কি বললে? ডাস্টবিন?'

'হাসতে বারণ করেছি, তারমানে তোমাকে আমি কাঁদতেও বারণ করেছি। হ্যাঁ, ডাস্টবিন। সকালে মিউনিসিপ্যালিটির লোক আবর্জনা নিয়ে চলে যাবার পর লণ্ডন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট্রের একটা গাড়ি নিয়ে আমাদের লোক হাজির হবে ওখানে। সঠিক লোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারলে গাড়ি যোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না...।'

'সে ব্যবস্থা কিভাবে করতে হয় আমার জানা আছে, ওখানে গিয়ে কি করতে হবে তাই বলো।'

'ডাস্টবিনটার মেঝে নষ্ট হয়ে গেছে,' বললো জনি। 'তোমার লোকেরা সিমেন্ট, বালি, ইত্যাদি নিয়ে যাবে মেরামত করার জন্যে। মেরামতের আগে অবশ্য মেঝেটা খুঁড়তে হবে। প্লাস্টিকের ব্যাগ, ভেতরে সোনার কাঠি।'

'ফর গডস সেক!'

'ফর গডস সেক।'

'এখুনি আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি, কাল সকালে যাতে

কাজটা উদ্ধার হয়। আর, রবার্ট···।'

'ইয়েস, সুইটি?'

'তোমার জায়গায় আমি হলে সকালে আমার প্রথম কাজ হতো হোফার টুইডের খবর নেয়া···।'

'ঠিক আমি যা ভাবছিলাম। রাখি তাহলে, কেমন? কোথাও নিশ্চয়ই একদিন দেখা হবে তোমার সাথে, কি বলো?'

গাড়িতে ফিরে আসার সময় অকারণ হাসিটা জনির সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

ট্যাংকারের গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে উঠে এসে রানা দেখলো আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে। তবে আশপাশটা কেমন ভেজা ভেজা, আর কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, বেশিক্ষণ হয়নি জোরালো খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রানার পিছু পিছু সলোমনও বেরিয়ে এলো। হ্যাচের ঢাকনি বন্ধ করে দিয়ে ওপর থেকে ওদের দিকে তাকালো ড্রাইভার। এই লোকটা জনির ঠিক উল্টো, একদম হাসতে জানে না। 'রাস্তা টপকে ঢাল বেয়ে নেমে যান,' বললো সে। 'খানিকদূর গেলে একটা মেঠো পথ পাবেন। শ' ছয়েক গজ এগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকুন, কেউ না কেউ আসবে। গুড লাক।'

ক্যাবে ঢুকলো লোকটা। ব্রেক রিলিজ করায় জোরালো হিস্‌স্ শব্দ হলো। ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ট্যাংকার।

তারার আলোয় যতোদূর দেখা যায়, চোখ বুলিয়ে নিয়ে

রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'ভালো লোকদের পাল্লায় পড়া গেছে, তাই না?'

'ক'টা বাজে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। হাত-পায়ের আড়ষ্টতা দূর করার জন্যে জগিং শুরু করলো ও।

হাতঘড়ি দেখলো সলোমন। 'দেড়টার কাছাকাছি।'

'তারমানে ট্যাংকারের ভেতর প্রায় চার ঘণ্টা ছিলাম আমরা। ধরো, দেড়শো মাইল পেরিয়ে এসেছি। চলো দেখি, জায়গা মতো গিয়ে দাঁড়াই।'

হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোলো সলোমন, অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে। 'আবার কেউ আমাকে ট্যাংকারের ভেতর ঢুকতে বললে আমি পালাবো।'

রাস্তা পেরিয়ে ঢাল বেয়ে নামলো ওরা। পাথর আর মাটি মেশানো ঢাল, পিছলা। নেমে আসতে প্রচুর সময় লাগলো। মেটো পথটা বেশ চওড়া। শ দুয়েক গজ এগিয়ে ওরা থামলো।

'কই, কাউকেই তো দেখছি না।'

'এখনো কেউ আসেনি,' বললো রানা।

দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁপা গলায় ডেকে উঠলো। তারা ভরা আকাশের নিচের দিকে উঁচু-নিচু কালো রেখা, পাহাড়শ্রেণী। ডানা ঝাপটে রাত জাগা পাখি উড়ে গেল একটা।

'শালার কোন্ জায়গায় এসে পড়লাম বলো তো!' অস্বস্তি-বোধ করছে সলোমন। চারদিক একেবারে নির্জন।

পথের আরেক দিক থেকে ছোট্ট একটা শব্দ এলো, যেন একটা নুড়ি পাথর খানিকটা নেমে এলো গড়িয়ে। দু'জনেই

তাকালো সেদিকে। গাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা মেয়ে। 'কোথাও যেতে চাইলে বলো তোমাদের আমি পৌঁছে দিই।'

সাথে সাথে মেয়েটার গলার আওয়াজ চিনতে পারলো রানা, ফিসফিস করে সলোমনকে বললো, 'কোনো সন্দেহ নেই ওর্ক-শায়ারের কোনো একটা অংশ।'

স্কার্ফ পরেছে মেয়েটা, গায়ে পুরানো একটা রেনকোট। ওদের কাছ থেকে তিন হাত দূরে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। চাঁদের সাদা আলোয় তার মুখটা ভালো করে দেখা গেল না, কিন্তু রেনকোট ঠেলে ফুটে রয়েছে উথলানো যৌবনের রেখা-গুলো।

সলোমনের ঢোক গেলার আওয়াজ, রানার মনে হলো, বিশ গজ দূর থেকেও শোনা গেল। 'ব্যাবিলন।'

'ব্যাবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা তোমাদের আমি এগিয়ে দিতে পারি।' মিষ্টি গলা মেয়েটার, কিন্তু নিস্তেজ আর বিষণ্ণ। রানার মনে হলো, মেয়েটা বারবার দীর্ঘশ্বাস চাপছে।

ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটা, যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে এগোলো। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলো ওরা।

'আমাকে একটা চিমটি কাটবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'তাহলেই যদি বিশ্বাস হয় স্বপ্ন দেখছি না।'

হেসে ফেললো রানা। 'ভুল লোককে ধরছো তুমি। তোমার আসলে মেয়েটাকে অনুরোধ করা উচিত।'

'চিমটি নয়, ওর কাছ থেকে আমি অন্যকিছু চাইবো,' বলে

[illegible]

[illegible] হোফার ট্রুইড। [illegible] আছে।' ফিসফিস করে বললো সে।

তার পাশে, অন্ধকারে, কি যেন নড়ে উঠলো। উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকলো [illegible] ফ্লানান, তার ঠোঁটের কোণ থেকে সুতোর মতো লালা ঝরছে।

'এবার তোমাকে দুটো মানুষের আওয়াজ হবে, ফ্লানান,' বললো ট্রুইড। 'ভাবনার কিছু নেই, আমিও থাকবো তোমার সাথে। তবে আস্তে ধীরে, তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না। সময় হলে তোমাকে আমি বলবো।'

ফ্লানানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে মই বেয়ে নামলো সে। গোলা থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে মেয়েটা। রানা আর সলোমন তার ঠিক পিছনেই রয়েছে।

'মা, মাগো,' বলে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলো হোফার ট্রুইড। ভাবাবেগে অধীর হয়ে, অনেকটা মাতালের মতো টলতে টলতে ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরলো সে। 'তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে, জোয়েনা। আজকের দিনেও তোমাকে কতো কষ্ট করতে হলো।' জোয়েনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো আস্তে করে। কপালের চুল সরিয়ে আড়চোখে তাকালো সলোমনের দিকে। একটু

আড়ষ্ট, বোধহয় লজ্জা পেয়েছে। 'আর একটা কাজ, মা, তারপর তোমার ছুটি,' বলে চলেছে টুইড। 'মুরগির রোস্ট আর ডিমের ওমলেট করো, মেহমানদের খেতে দিতে হবে।'

একটাও কথা না বলে উঠন থেকে ঘরের দিকে চলে গেল রোয়েনা। ওদের দিকে ফিরে এক গাল হাসলো টুইড, কেউ বলবে না এই লোকই এক মুহূর্ত আগে ফোঁপাচ্ছিল। 'মিঃ জো সলোমন এবং মিঃ নাহিদ শাহ—কংগ্রাচুলেশন্স! এগারোটার খবরে আপনাদের সম্পর্কে এতো কিছু বলা হয়েছে, মনে হচ্ছে আপনাদের আমি বিশ বছর ধরে চিনি। হোফার টুইড অ্যাট ইওর সার্ভিস, জেন্টলমেন!'

'নাটুকে, বিপজ্জনক চরিত্র,' বিড়বিড় করে বললো রানা।

টুইডের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরলো না সলোমন। 'ওটা কি?' গোলাঘরের ছায়া থেকে হঠাৎ ডুগানকে বেরিয়ে আসতে দেখে সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।

'ডুগান, মিঃ সলোমন, আমাদের গুড বয় ডুগান।' অর্থবহ ভঙ্গিতে নিজের কপালে একটা টোকা মারলো টুইড। 'ওপর-তলায় যা যা থাকা দরকার বেশিরভাগই নেই ওর। তবে ফার্মে, দু'জনের কাজ একাই করতে পারে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কি করছি আমরা? আসুন, ঘরে দিয়ে আসি আপনাদের। হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন, রোয়েনা ইতিমধ্যে টেবিল সাজিয়ে ফেলবে।'

'রোয়েনা—তোমার মেয়ে?' পোর্চে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললো টুইড। 'বড় লক্ষ্মী মেয়ে, বুঝলেন।'

'কথা খুব কম বলে, তাই না ?'

'আরে, ঠিক ধরেছেন তো !' হঠাৎ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে শুকনো চোখ মুছলো টুইড। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আজ তো এমনিতেই ওর পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে ওর মা মারা গেছে।' বাঁ দিকে একটা দরজা, আস্তে করে ঠেলা দিয়ে সেটা খুললো সে। লম্বা টেবিলে একটা কফিন দেখা গেল। 'সকাল দশটায় ওকে আমরা গ্রামের চার্চে নিয়ে যাবো। আট মাইল পথ, ন'টার মধ্যে লাশ নেয়ার জন্যে পৌঁছে যাবে গাড়ি। ততোক্ষণ আপনারা একটু মাথা নিচু করে থাকবেন আর কি।'

দরজা বন্ধ করে পথ দেখালো সে, কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে এলো ওরা। লম্বা ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে শেষ মাথার একটা দরজা খুললো টুইড। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললো। 'আপনাদের রাতের কবরখানা।'

রানা আর সলোমন পরস্পরের দিকে তাকালো।

ভেতরে ঢুকলো ওরা। একটাই বিছানা, তবে বড়সড়। ছোটো একটা ওঅর্ডরোব, ছোটো একটা ড্রেসিং টেবিল, আর মার্বেল পাথরের একটা ওয়াশবেসিন রয়েছে, সবই বহু-ব্যবহারে মলিন।

'গরীবের ডেরায় উঠেছেন, একটু কষ্ট করতে হবে,' সবিনয়ে বললো টুইড। 'আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করতে পারিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'একা হয়ে গেছি, বুঝতেই তো পারছেন, খাতির যত্ন তেমন করতে পারবো না।'

রেনকোটের বোতাম খুলে সেটা বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিলো

সলোমন। 'এখানে আমরা ক'দিন থাকছি ?'

'এখুনি বলি কি করে। আমাকে টেলিফোন করা হবে। আগামীকাল সম্ভবত। খুব দেরি হলে পরশু। তবে উদ্বিগ্ন হবেন না। এখানে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে-কোনো জায়গা থেকে শত মাইল দূরে রয়েছেন।'

'কোথায় ?' প্রশ্ন করলো রানা।

'উত্তর দিলে তথ্য ফাঁস করা হবে, তাই না, মিঃ নাহিদ শাহ?' ঠোঁট সরু করে হাসলো টুইড। 'যার নেমক খাই তার সাথে বেঈমানী করা আমার স্বভাব নয়, প্লিজ। তাছাড়া, নিজের প্রোটেকশনের কথাও আমাকে ভাবতে হয়। তৈরি হয়ে নিন, তারপর নেমে আসুন নিচে।'

টুইডের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। জ্যাকেট খুলে বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিলো সলোমন। 'কি মনে হলো তোমার ?'

'চোখের আড়ালে এ লোককে বিশ্বাস করি না।' জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো রানা। 'বাড়িটার চারদিকে আমি শুধু অশুভ ছায়া দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছো, বাতাস কেমন গোঙাচ্ছে ?'

ভুরু কুঁচকে তাকালো সলোমন। 'তোমার আবার ভূতের ভয় আছে নাকি ?'

'উঁহুঁ, কারণ আমি ভূত ছাড়াতে জানি।'

ওয়াশবেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সলোমন। জগ থেকে পানি নিয়ে চোখে-মুখে ছিটালো সে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো, 'খাবো কি, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'তোমার বুঝি ধারণা, টুইড তোমাকে ঘুমাতে দেবে ?'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'তারমানে ?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, কিন্তু কিছু বললো না।

'একটু বেচাল চলতে দেখি, শালার আমি ঘাড় মটকাবো,' ফুঁসে উঠে বললো সলোমন।

ট্রেঞ্চকোট খুলে বেসিনের দিকে এগোলো রানা। 'তার আগে নিজের ঘাড়টা বাঁচাতে হবে তোমার। নাকি ডুগানের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছো ?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো সলোমন। 'আমার ধারণা ওটা একটা জড়-পদার্থ। বুদ্ধি-সুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।'

'তারমানে টুইডের বুদ্ধিতে চলে সে।'

'এবং টুইড লোক ভালো নয়।'

রানা হাসলো। 'ঠিক তাই।'

'কিন্তু এসবই আমাদের আন্দাজ,' বললো সলোমন। 'সত্যি নাও হতে পারে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'নিচে আছি, তুমি এসো,' বললো সলোমন। 'দেখি টুইড ব্যাটা কি করছে।'

চলে গেল সলোমন। বেসিনের ওপর চিড় ধরা আয়নার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো রানা। কোনো কারণ নেই অথচ মন বলছে এটা সত্যি একটা অশুভ বাড়ি। মনকে ইন্ধন যুগিয়েছে মেয়েটার মৌনতা, টুইডের আড়চোখে তাকানোর স্বভাব, এবং ড়গান নামে তার কালো ছায়া।

কিন্তু উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়, কি হতে পারে সেটা ? টুইড বোকা নয়, বুঝে নিয়েছে ওদের দু'জনকে কাবু করা সহজ হবে না। অবশ্য একজন একজন করে, আলাদাভাবে··· । ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার বুক। 'সর্বনাশ !' বিড়বিড় করে উঠলো ও। তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে ছুটলো। হ্যাঁচকা টানে কবাট খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো সিঁড়িতে।

নিচের বসবার ঘরে নেমে এসে কাউকে দেখলো না সলোমন। ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু চারটে কোণ আর সিলিং সহ এখানে সেখানে এতো বেশি ছায়া যে গা ছমছম করে উঠলো তার। বাড়িটায় পা দিয়েই লক্ষ্য করেছে সে, প্রতিটি বাল্ব কম ওয়াটের, ছায়াগুলোকে বেশি দূর তাড়াতে পারে না। কোথাও কোনো শব্দ না পেয়ে গায়ের লোম খাড়া হতে শুরু করলো সলোমনের। ওদের দু'জনকে রেখে বাড়ি ছেড়ে পালায়নি তো সবাই ? তাড়াতাড়ি অন্ধকার প্যাসেজে বেরিয়ে এলো সে।

ফাঁকা প্যাসেজ। রান্নাঘরের দরজা খোলা রয়েছে, কিন্তু ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝা গেল না। সাবধানে এগোলো সলোমন। আশ্চর্য, রান্নাঘরেও কোনো আলো জ্বলছে না। লালচে আলোটা সম্ভবত আগুনের আভা।

দরজার কাছ থেকে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকালো সলোমন। ভয় পেয়েছিল বলে মনে মনে তিরস্কার করলো নিজেকে। জ্বলন্ত চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোয়েনা। পুরনো একটা সুতী ড্রেস পরেছে সে, অনেক দিন ধরেই গায়ে একটু ছোটো হয় বলে

এখানে সেখানে সেলাই কেটে গেছে। সলোমন লক্ষ্য করলো, মেয়েটার পায়ে মোজা নেই। চাঁদের আলোয় ব্যাপারটা বোঝা যায়নি, উপলব্ধি করে খানিকটা হতাশ হলো সে—দেখতে মোটেও মেয়েটা ভালো নয়। মুখের হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু, নাকটার কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই, বেঢপ কপাল। অনেকেই তাকে কুৎসিত বলতে দ্বিধা করবে না।

তবে হ্যাঁ, শরীর বটে একখানা। যৌবনের যেন বান ডেকেছে। সলোমনের ধারণা হলো, এ মেয়ে ঘুমাতে পারে না, বিছানায় ছটফট করে রাত কাটায়।

'রান্না প্রায় হয়ে এসেছে,' বিষণ্ণ, নিস্তেজ গলায় বললো রোয়েনা। হাত দুটো সুগোল উরুর ওপর ঘষলো, কুঁচকে থাকা কাপড় সমান করার ব্যর্থ চেষ্টা। 'উঠেছি শেডে যাবো বলে, চুলোর জন্যে আরো কিছু কাঠ লাগবে।'

সিঙ্কের ওপর সার সার কয়েকটা হুক, তার একটা থেকে ল্যাম্পটা নামালো রোয়েনা। ল্যাম্প জ্বেলে পিছনের দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। তার আগেই দরজার সামনে পৌঁছে গেল সলোমন। 'দাও, আমাকে দাও,' বলে রোয়েনার হাত থেকে ল্যাম্পটা একরকম কেড়ে নিলো সে। 'তোমার সাহায্য দরকার।'

ইতস্তত করলো রোয়েনা, সলোমনের মুখের দিকে ভালো করে তাকালো, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব। তারপর, যেন লজ্জা পেয়েছে, ধীরে ধীরে মাথা নিচু করলো। বিড়বিড় করে বললো, 'বেশ, চলুন। শেডটা উঠানের ওদিকে।'

উঠনে কোথাও মসৃণ পাথর, কোথাও মাটি। বারবার পা পিছলে যাবার উপক্রম হলো সলোমনের। একবার একটা গর্তে পা পড়লো, পানি ঢুকলো জুতোর ভেতর।

শেডের দরজা খুললো রোয়েনা। পচা খড়, আর ভ্যাপসা একটা গন্ধ ঢুকলো সলোমনের নাকে। একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, তার পাশ ঘেঁষে ভেতরে ঢুকলো সে। ছাদের কয়েক জায়গায় গর্ত, ঝলমলে তারা দেখা গেল আকাশে।

'এদিকে,' বললো রোয়েনা।

মেয়েটার দিকে এগোলো সলোমন, ল্যাম্প ধরা হাতটা উঁচু করলো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রোয়েনা। আলোর শিখা কাঁপছে, কখনো আলো কখনো ছায়া পড়ছে মেয়েটার মুখে। রাস্তায় চাঁদের আলোয় প্রথমবার দেখে যেমন মনে হয়েছিল, আদি এবং অকৃত্রিম নগ্ন ইভ বলে মনে হলো রোয়েনাকে।

ঘুরলো মেয়েটা, পিছন ফিরে ঝুঁকে পড়লো স্তূপ করা চেলা কাঠের দিকে। তার উরুর পিছন দিকে আর নিতম্বে দ্বিতীয় চামড়ার মতো সেঁটে গেল সুতী কাপড়।

পাঁচ বছর! ভাবলো সলোমন। একটানা পাঁচ বছর কোনো মেয়ের স্পর্শ পাইনি। নিঃশব্দে সামনে এগোলো সে, শিকারী বিড়ালের মতো। চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখ হাঁ করে আছে। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে যাবে, হঠাৎ সিধে হয়ে ঘুরলো রোয়েনা। থমকে গেল সে, আকস্মিক বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে।

শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। কেউ নড়লো না।

তারপর যেন টলে উঠলো রোয়েনা। যেন সলোমনের দিকে ঝুঁকছে সে।

বাড়ির কোথাও থেকে হাঁক ছাড়লো রানা, 'সলোমন? এই সলোমন!'

ঠোঁট লম্বা করে হাসলো সলোমন। একটা হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে মেয়েটার গাল স্পর্শ করলো সে। 'তুমি খুব ভালো মেয়ে, রোয়েনা। অন্য কোনো সময়, কেমন? ল্যাম্পটা তুমি ধরো, আমি কাঠ নিচ্ছি।'

ল্যাম্পটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে পিছিয়ে গেল রোয়েনা। আঙুলের ডগাগুলো সাদা হয়ে গেছে। একটা হাতের ভাঁজে দশ-বারোটা চেলা কাঠ নিয়ে সিধে হলো সলোমন, আগে আগে বেরিয়ে এলো শেড থেকে। উঠনের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে, রান্নাঘরের দরজায় রানাকে দেখা গেল। 'ও, তুমি তাহলে একটা কাজে ছিলে,' বললো রানা। 'কাউকে দেখতে না পেয়ে···এই মেয়ে, তোমার বাবা কোথায় জানো?'

'এই তো, আমি এখানে, মিঃ নাহিদ শাহ।' অন্ধকার উঠনের আরেক মাথা থেকে বেরিয়ে এলো হোফার টুইড। 'ছাগল আর ভেড়াগুলোকে ঘরে ঢোকালাম।'

'ডুগান কোথায়?'

হে হে করে হাসলো টুইড। 'ওটাকে কোনো গুরুত্বই দেবেন না।'

সলোমন ঝাঁঝের সাথে বললো, 'নাহিদ জানতে চাইছে, কোথায় সে?'

চোখ পিট পিট করে একবার সলোমন, একবার রানার দিকে তাকালো টুইড। 'বুঝলাম না, স্যার। আমরা কেউ কোনো অন্যায় করেছি ?'

'প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো কেন ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ডুগান ?' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো টুইড। 'ওটা আবার একটা মানুষ নাকি যে কোথায় গেল না গেল খোঁজ নিতে হবে! কখনো ছাগলের সাথে শোয়, কখনো মুরগীর খাঁচায় ঘুমায়। আজ অবশ্য ওকে আমি গোলাঘরে শুতে বলেছি। বলে দিয়েছি, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেহমানদের সামনে যেন না আসে।'

'কেন ?'

চেহারায় রাজ্যের বিস্ময় ফুটিয়ে টুইড বললো, 'দেখেননি, ওর মুখ থেকে সব সময় লালা ঝরে ?'

রান্নাঘরের দিকে এগোলো সলোমন, বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা গেল না। এগিয়ে এসে মেয়েটার সামনে দাঁড়ালো টুইড। 'কি রান্না করেছো, মা-মণি? মেহমানদের কথা কি বলবো, আমারই এমন খিদে পেয়েছে, আস্ত একটা ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারি।'

টুইডকে পাশ কাটিয়ে সলোমনের পিছু পিছু হন হন করে এগোলো রোয়েনা। তার আচরণে তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু রানার দৃষ্টি এড়ালো না।

আরো প্রায় এক ঘণ্টা পর গোলাঘর থেকে অন্ধকার উঠনে বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি। দূর পাহাড়ের কোথাও

থেকে একটা শিয়াল ডেকে উঠলো। উঠন পেরোতে গিয়ে থমকালো ডুগান, বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকলো—কাজে আজ বাধা পড়বে, শিয়ালের ডাক অশুভ লক্ষণ। কাঁধ ঝাড়া দিয়ে খুঁতখুঁতে ভাবটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো সে, পিছনের দরজার দিকে এগোলো।

রান্নাঘরে একটা টেবিলের সামনে বসে পাইপ টানছে হোফার টুইড। উত্তেজনায় ঘন ঘন পা দোলাচ্ছে সে, চোখের সামনে মেলে ধরেছে একটা খবরের কাগজ। মুখ তুলে ডুগানকে ঢুকতে দেখলো, বললো, 'এসেছো তাহলে। আমি ভাবছিলাম আবার না ডাকতে যেতে হয়।'

ভোঁতা, কর্কশ, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ বেরুলো ডুগানের গলা থেকে, 'আমার হাত নিশপিশ করছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো টুইড। ডুগানের পিঠ চাপড়ে দিলো। 'তুমি না থাকলে কি যে করতাম আমি!' লম্বা পা ফেলে কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, কবাট খুলে ভেতর থেকে দশ পাউণ্ড ওজনের একটা হাতুড়ি বের করলো। এগিয়ে এসে সেটা বাড়িয়ে দিলো ডুগানের দিকে। 'কি করতে হবে জানো তো?'

হাতুড়িটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো ডুগান। চোখে পলক পড়লো না, অস্বাভাবিক চকচক করছে। মোটা সুতোর মতো লালা ঝরছে মুখ থেকে। গলা থেকে দুর্বোধ্য একটা উল্লাস-ধ্বনি বেরিয়ে এলো।

'লক্ষ্মী ছেলে। চলো যাওয়া যাক। শুভ কাজে দেরি করতে নেই।'

দ্বিতীয় দরজাটা খুললো টুইড, পথ দেখিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোলো। খুব সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওরা, প্রায় কোনো শব্দই হলো না। ল্যাণ্ডিংঙে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিলো টুইড, উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠেছে। তারপর শেষ মাথার দরজার সামনে দাঁড়ালো সে, ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে ডুগানকে কোনো শব্দ করতে নিষেধ করলো। আস্তে করে নবটা ধরলো সে, ধীরে ধীরে ঘোরালো।

নব ঘুরলো না।

ডুগানকে ল্যাণ্ডিঙের আরেক দিকে ঠেলে নিয়ে গেল টুইড। পিছিয়ে গেল ডুগান, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে নামতে রাজি নয় সে। অগত্যা বারবার তাকে ঠেলা দিতে হলো। সিঁড়ির একেবারে নিচে নেমে এসে ফিসফিস করে বললো টুইড, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, তাড়াহুড়ো করলে অসুবিধে আছে। অন্তত এই কাজটায়। মন খারাপ করো না, কথা দিচ্ছি কাল তুমি সুযোগ পাবে।'

বেডরুমের মাঝখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রানা আর সলোমন। দু'জনেই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে দরজার নবের দিকে। নবটা নড়লো, কিন্তু ঘুরলো না। মৃদু পায়ের আওয়াজ দরজার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এই সময় হিশ্‌শ্‌ করে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সলোমন।

'তুমি পাশে থাকায় আমি কৃতজ্ঞ, নাহিদ!' চাপা স্বরে বললো সে। 'মাই গড! নিজেকে আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু মনে

হচ্ছে! মনে হচ্ছে বাড়িটার আনাচেকানাচে গলায় খুলির মালা ঝুলিয়ে নাচানাচি করছে ভূতেরা। ভাগ্যিস তুমি জেগে থাকতে বলেছিলে!'

'আমি ওদের তিনজনের কথা ভাবছি,' বললো রানা। 'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটন। ওদের কপালে কি ঘটেছে জানা গেলে বুঝতে পারতাম আমাদের সামনে কি আছে।'

'চলো, জেনে আসি।' দরজার দিকে পা বাড়ালো সলোমন।

খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেললো রানা, 'কি করছো!'

'বানচোতটার মুখে পেচ্ছাব করবো,' ফুঁসে উঠলো সলোমন। 'তারপর পেটের ওপর পা দিয়ে দাঁড়ালেই গড়গড় করে সব বলে দেবে।'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো,' বললো রানা। 'ওদের উদ্দেশ্য কি, এখনো আমরা তা জানি না। হয়তো খারাপ, কিন্তু কতোটুকু খারাপ বলা কঠিন। এমনও তো হতে পারে আমাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে এসেছিল।' বললো বটে, কিন্তু রানা নিজেই কথাটা বিশ্বাস করে না।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো সলোমন। 'হয়তো তাই। কিন্তু গিয়ে জিজ্ঞেস করতে দোষ কি? হাবভাব দেখে বুঝতে পারবো মিথ্যে কথা বলছে কিনা।'

'তা বুঝেও কোনো লাভ হবে না,' বললো রানা। 'তাতে শুধু ওদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে। বুঝতে পারছো না কেন, কাউন্টের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম টুইড।'

'এখন গিয়ে যদি শালার একটা হাত ভাঙি, কাউন্টের ঠিকানা

জানতে পারবো না ?'

হাসলো রানা। 'তোমার বুঝি ধারণা টুইডের মতো লোক কাউন্টের ঠিকানা জানে ?'

মিইয়ে গেল সলোমন। 'তাহলে আমাদের এখন করণীয় কি ?'

'অপেক্ষা করা,' বললো রানা। 'চাল যা দেয়ার টুইডই দিক। আমরা তো সতর্কই আছি, দেখা যাক না কি করে সে।'

'রাতটা তাহলে···?'

'আর বোধহয় আসবে না ওরা,' বললো রানা। 'কিন্তু ঝুঁকি নেয়ারও কোনো মানে হয় না। ঘুমালে একজন।'

বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লো সলোমন। 'দু'ঘণ্টা পর তুলে দিয়ো আমাকে।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আবার সেই দুঃস্বপ্ন-২

পূর্বাভাষ

প্রায় বছর ঘুরতে চললো সংঘবদ্ধ একটা অপরাধী দল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জেল-খানা থেকে দীর্ঘ মেয়াদের সাজা পাওয়া কয়েদীদের কৌশলে বের করে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

জেলখানাগুলো এমনিতেই এক একটা দুর্গম দুর্গ, তবু অপরাধী দলটাকে প্রতিরোধ করার জন্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোর-দার করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি—চমকপ্রদ নতুন নতুন কৌশলে বার বার কয়েদী ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটতেই থাকলো। প্রতিটি পরিকল্পনা নিখুঁত, আগেরটার সাথে কোনো মিল নেই। কখনো কমাণ্ডো ধরনের হামলা হলো, গ্রেনেড থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার পর্যন্ত সব কিছুই ব্যবহার করলো পনেরো-বিশ জনের দুর্ধর্ষ একটা বাহিনী। আবার হয়তো কখনো দেখা গেল একজন সেপাই জেলখানার ভেতর বাথরুমে উলঙ্গ এবং অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, তার ইউনিফর্ম পরে গেট দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে গেছে কয়েদী—কাছেই একটা গাড়ি অপেক্ষা

করছিল, তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে সেটা। আশ্চর্য ব্যাপার, পলাতক কয়েদীদের একজনকেও পরে আর ধরা সম্ভব হয়নি। জেল থেকে বেরুবার পর তারা যেন স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

একের পর এক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড উপলব্ধি করলো, এ-ধরনের নিখুঁত প্ল্যান-পরিকল্পনা নিশ্চয়ই দুর্লভ কোনো প্রতিভার মাথা থেকে বেরুচ্ছে। গুজব রটলো, সংঘবদ্ধ অপরাধী দলটাকে পরিচালনা করছে কাউণ্ট নামে এক রহস্যময় চরিত্র। ধারণা করা হলো কাউণ্ট তার ছদ্মনাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও লোকটা সম্পর্কে আর কিছু জানা গেল না। কেউ বললো লোকটা নাকি মিশরীয় মাস্টার ক্রিমিনাল; আবার কেউ বললো কাউণ্ট আসলে প্রাক্তন কোনো ভারতীয় রাজা। সবচেয়ে মুখ-রোচক গুজব রটলো, কাউণ্ট নাকি আদৌ কোনো মানুষই ওটা একটা অত্যাধুনিক রোবট—যান্ত্রিক মানুষ, কমপিউটার ব্রেনের সাথে দেহকাঠামোর বিস্ময়কর সংযোজন।

কয়েকটা ঘটনা ঘটে যাবার পর একটা প্যাটার্ন পাওয়া গেল। শুধু যাদের দীর্ঘ মেয়াদের সাজা হয়েছে তাদেরকেই বের করে নিয়ে যাচ্ছে কাউণ্টের দল। আরো একটা মিল লক্ষ্য করা গেল, প্রায় সব ক'জন কয়েদী ডাকাতি করার পর ধরা পড়েছিল, কিন্তু পুলিশ তাদের কারো কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করতে পারে-নি। অর্থাৎ যে-সব কয়েদী মোটা অংকের টাকা লুকিয়ে রাখতে পেরেছে শুধু তাদেরকেই বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুঝতে বাকি থাকলো না, কাউণ্ট লোকটা শুধু অর্থলোলুপই নয়, তার

ব্যবসা বুদ্ধিও প্রখর।

প্যাটার্ন পাবার পর কয়েদীদের একটা তালিকা তৈরি করা হলো, এরপর যাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। প্রতিটি জেলখানায় কয়েদীর ছদ্মবেশে নিজেদের লোক ঢোকালো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, কয়েদীদের ওপর নজর রাখবে তারা। কিন্তু পরিকল্পনাটা শুরুতেই কেঁচে গেল। কয়েদীর ছদ্মবেশে থাকলেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভদের দেখামাত্র চিনে ফেললো অপরাধীরা। ফলে কেউ তারা কোনো জেলখানাতেই দু'চার দিনের বেশি টিকতে পারলো না। কয়েদীরা তাদেরকে শুধু যে এড়িয়ে থাকলো তাই নয়, প্রায় প্রত্যেক জেলখানায় ছোটোখাটো দুর্ঘটনার শিকার হলো ছদ্মবেশী ডিটেকটিভরা। কারো মাথায় খালি বালতি পড়লো ছাদ থেকে, পায়ে সরু তার লেগে আছাড় খেলো কেউ, খাবারের সাথে নিজের অজ্ঞাতে কড়া জোলাপ খেয়ে অনেককেই সারা দিনে বত্রিশ বার ছুটতে হলো ল্যাট্রিনে। বাধ্য হয়েই নিজেদের লোককে জেলখানা থেকে ফিরিয়ে নিলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। তবে এবার তারা দু'একটা নগণ্য সাফল্যের মুখ দেখলো বটে।

চিহ্নিত কয়েদীর সাথে জেলখানার ভেতরই অন্য একজন নবাগত কয়েদী যোগাযোগ করলো, একজন ডিটেকটিভের চোখে ধরা পড়ে গেল ব্যাপারটা। তিনটে জেলখানায় এ-ধরনের তিনটে ঘটনা ঘটলো। জেলখানার বাইরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে গ্রেফতার করা হলো আরো দু'জনকে। শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। পাঁচজনই স্বীকার করলো, তারা কাউন্টের লোক,

কিন্তু কাউন্টের ঠিকানা বা পরিচয় সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। টাকার বিনিময়ে ছোটোখাটো কাজ করে দেয় তারা, কাজের প্রস্তাব আসে অচেনা লোকদের কাছ থেকে। দীর্ঘ দিন জেরা করার পর ডিটেকটিভদের বিশ্বাস জন্মালো লোকগুলো সত্যি কথাই বলছে। বোঝা গেল একটা কাজ করার জন্যে এক-জন লোকের যতোটুকু জানা দরকার তার বেশি তাকে জানতে দেয় না কাউন্ট, ফলে লোকটা পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও দলের সাথে বেঈমানী করার কোনো সুযোগ থাকে না তার।

এই যখন অবস্থা, অনেক ভেবেচিন্তে শেষ চেষ্টা হিসেবে কোনো ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের সাহায্য নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো কর্তৃপক্ষ। ফার্মের তালিকা তৈরি হলো, এবং বিস্তর আলো-চনার পর ঠিক হলো কেসটা রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে দেয়া হবে—কারণ, এ-ধরনের কেসে আগেও অনেক কাজ করেছে রানা এজেন্সি, এবং কোনোটাতেই ব্যর্থ হয়নি।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একটা কাভার মাত্র। অনেক সময় এমন সব নাজুক পরিস্থিতি বা সমস্যা দেখা দেয় যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সরাসরি সেগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে না, পড়লে কূটনীতিক পর্যায়ে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হতে পারে, কিংবা দুর্নামের ভাগীদার হও-য়ার আশংকা থাকে। হয়তো দেখা গেল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স জানতে পেরেছে মিত্র একটা দেশ নিজ স্বার্থ উদ্ধা-রের জন্যে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে এমন একটা কাজ গোপনে সারতে যাচ্ছে, তখন বাধা দেয়ার দায়িত্ব চাপে রানা এজেন্সির

ওপর, কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্স এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই তারা জানে না। রানা এজেন্সি সৃষ্টি করার পিছনে আরো বড় একটা কারণ হলো, দুনিয়ার অন্যান্য গুপ্তচর সংগঠনগুলোকে জানিয়ে দেয়া যে মাসুদ রানা সহ এজেন্সিতে যারা কাজ করছে তারা সবাই বেসরকারী ইনভেস্টিগেটর, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কাভারটা যাতে নিখুঁত হয় তার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো বড় শহরে এজেন্সির শাখা অফিস রয়েছে, স্থানীয় যে-কোনো লোক বা যে-কোনো প্রতিষ্ঠান এজেন্সির সাহায্য চাইতে পারে। বিশেষ করে জটিল কোনো কেস রানা এজেন্সি কখনোই ফিরিয়ে দেয় না।

লণ্ডন শাখার ইনচার্জ ছিলো বদরুল হাসান। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট গোপনে দেখা করলো তার সাথে। কেসটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানানো হলো হাসানকে, ফটো সহ চারজন কয়েদীর চারটে ডোশিয়ে-ও দেয়া হলো তাকে।

চারজন কয়েদীর নাম—জন হেরিক, রিড কোয়েন, রিপ হটন, এবং জো সলোমন। চারজনই কুখ্যাত ডাকাত, পিটারফিল্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতির সাথে জড়িত ছিল। আশি লাখ পাউণ্ড সহ একটা প্লেন হাইজ্যাক করে ওরা, প্রত্যেকে বিশ লাখ পাউণ্ড করে ভাগ পায়। তবে কিছু দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যায় ওরা, বিচারে বিশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয় সবার। কিন্তু টাকাগুলো পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।

চারজনের মধ্যে জন হেনরিক এবং রিড কোয়েনকে কাউন্টের দল জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে গেছে। সেই থেকে তাদের আর কোনো খবর নেই। সঙ্গত কারণেই ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট জ্যাক মারভিনের ধারণা, এরপর হয় রিপ হটন, নয়তো জো সলোমনকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

রিপ হটনের চেহারাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো হাসান। শারীরিক গঠন, চোখ আর চুলের রঙ, উচ্চতা, নাকের গড়ন, ঠোঁটের বিস্তার, ইত্যাদি অদ্ভুতভাবে মিলে যায় তার নিজের সাথে। এই মিল লক্ষ্য করেই তার মাথায় একটা বিপজ্জনক আইডিয়া খেলে গেল। রিপ হটনের ওপর নজর রাখার কোনো দরকার নেই, তারচেয়ে সে নিজেই রিপ হটনের ভূমিকায় অভিনয় করবে। রাতের অন্ধকারে, সবার অগোচরে সেল থেকে সরিয়ে দেয়া হবে রিপ হটনকে, তার ছদ্মবেশ নিয়ে সেলে ঢুকবে বদলে হাসান। কাউন্টের লোক যদি যোগাযোগ করে তাহলে রিপ হটন মনে করে হাসানের সাথেই যোগাযোগ করুক। অনেক আলোচনার পর একমত হওয়া গেল, কাউন্টের ঠিকানা এবং পরিচয় জানার জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হলো। রিপ হটনের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে জেল খাটতে শুরু করলো হাসান। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না, সত্যি সত্যি জেলখানার ভেতরে তার সাথে যোগাযোগ করলো কাউন্টের লোক। এবং একদিন তাকে জেল থেকে বেরও করে নিয়ে গেল তারা।

কিন্তু এরপর তার আর কোনো খবর নেই। আর সব পলাতক

কয়েদীর মতো হাসানও যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে।

খবর পেয়ে হেড অফিস ঢাকা থেকে লণ্ডনে ছুটে এলো এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা এবং অপারেশনাল চীফ সোহানা চৌধুরী। লণ্ডন শাখা আসলে কাউন্টের তৎপরতার ওপর গত সাত-আট মাস ধরেই লক্ষ্য রাখছিল, শাখার এজেন্টরা বিস্তারিত একটা রিপোর্টও তৈরি করেছে। সেটা পড়ে শুধু বিস্মিত নয়, চিন্তিত হয়ে পড়লো রানা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের জ্যাক মারভিনের সাথে দেখা করলো ও, তাকে বললো কেসটা নিয়ে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথে আলোচনা করা দরকার। বি. এস. এস. চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেড সাক্ষাৎ দানে রাজি হলেন। কাউন্টকে ধরার জন্যে, এবং হাসানের খবর পাবার জন্যে একটা পরিকল্পনা তৈরি করলো রানা, সেটা নিয়ে দেখা করলো বি. এস. এস. চীফের সাথে। তাকে বললো, কাউন্ট আসলে পুলিশী কেস নয়, ইন্টেলিজেন্স কেস—কারণ, ব্রিটেনের শত্রুদের কাছে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপুর্ণ অর্থাৎ টপ সিক্রেট ইনফরমেশন পাচার করছে কাউন্ট। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে ব্রিটেন থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানী, সামরিক অফিসার, পার্লামেন্ট সদস্য, এবং স্পাইদেরকে ইসরায়েল, সোভিয়েত রাশিয়া, এবং পূর্ব জার্মানীতে পাচার করেছে সে। স্বভাবতই বিচলিত বোধ করলেন বি. এস. এস. চীফ। রানার প্ল্যানটা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। রানার সাথে তিনিও একমত হলেন, কাউন্টকে ধরতে হলে এই প্ল্যানের কোনো বিকল্প নেই। রানাকে সাহায্য করার জন্যে হোম ডিপার্টমেন্টকে রাজি করাবেন বলে কথা দিলেন তিনি।

চার ডাকাতের তিনজনকেই কাউন্টের সংগঠন জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে গেছে। স্বভাবতই আন্দাজ করা যায়, এর পর চতুর্থজন অর্থাৎ জো সলোমনের পালা আসবে। রানার প্ল্যান হলো, কোথাও ডাকাতি করে ধরা পড়বে সে। বিচারে তার জেল হবে। জো সলোমনের আচরণ দেখে যখন বোঝা যাবে কাউন্টের লোকেরা তার সাথে যোগাযোগ করছে, তখন রানাকেও ফ্রাইডেথর্প জেলখানায় বদলি করা হবে—ওখানেই রাখা হয়েছে সলোমনকে।

ইতিমধ্যে একবার স্ট্রোক হয়ে গেল সলোমনের। একবার হলে, আরেকবারও হওয়ার কথা। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছে, স্ট্রোক সত্যি হয়েছিল, সলোমন অভিনয় করেনি। তাছাড়া, তাদের জানামতে, ড্রাগস ব্যবহার করে কৃত্রিম হার্ট অ্যাটাকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও, কৃত্রিম স্ট্রোকের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু রানা লোকটার অসুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলো। ওর জানা ছিলো, হল্যাণ্ডে মাবোফাইন নামে একটা ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যার সাহায্যে কৃত্রিম স্ট্রোকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে।

প্ল্যান অনুসারে কাজ শুরু হলো। ডাকাতি করে জেলে গেল রানা। কিছু দিন পর ফ্রাইডেথর্প কারাগারে বদলি করা হলো ওকে। জো সলোমনের সাথে একই সেলে থাকার ব্যবস্থা হলো।

ছদ্মবেশী রানার পরিচয় হলো সে একজন আফগান যুবক, নাম নাহিদ শাহ, নাগরিকত্ব নিয়ে অনেক বছর হলো লণ্ডনে আছে। ভাড়াটে সৈনিক হিশেবে ক্যাপ্টেন পদে ছিলো সে, হঠাৎ

বড়লোক হওয়ার খায়েসে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ক্লিফ শাহ শিক্ষিত, একজন সৈনিক, এই ব্যাপারটা জো সলোমনকে প্রভাবিত করলো, কারণ সে-ও রয়্যাল নেভীতে ছিলো এক সময়। রানাকে বন্ধু হিশেবেই গ্রহণ করলো সে। ছোটোখাটো কয়েকটা বিপদে সলোমনকে সাহায্য করে সেই বন্ধুত্ব আরো গাঢ় করে নিলো রানা।

কয়েকটা লক্ষণ দেখে রানা টের পেয়ে গেল, সলোমন পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওকে বিস্মিত করলো প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকার, কাউন্টের প্রতিনিধি হিসেবে সে-ই যোগাযোগ করলো সলোমনের সাথে। নিজের চোখেই রানা দেখলো, বুকার একটা ম্যাচ-বাক্সের ভেতরে করে ক্যাপসুল দিয়ে গেল সলোমনকে। সেই ক্যাপসুল খেয়ে পরদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো সলোমন, অর্থাৎ সে বোঝাতে চাইলো আবার তার স্ট্রোক হয়েছে।

স্ট্রোক হওয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ফ্রাইডেথর্প জেলখানায় নেই, কাজেই সলোমনকে ম্যানিংহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তার সাথে রানাও যেতে চায়, কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া সেখানে যাবার কোনো উপায় নেই। অগত্যা, ইস্পাত শান দেয়ার মেশিনে হাত ঠেকালো রানা, চোখের পলকে নয় ইঞ্চি মাংস ফুঁফাঁক হয়ে গেল, রক্তের স্রোত বইলো মেশিন শপের মেঝেতে। অ্যাম্বুলেন্স এলো, দু'জনকেই নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে।

কোনো হাসপাতালেই ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা

সম্ভব নয়। মাত্র দু'জন লোক রানা আর সলোমনের পাহারায় থাকলো। দিন কয়েক পর এক রাতে, ডাক্তারের ছদ্মবেশে ওয়ার্ডে ঢুকলো কাউন্টের একজন লোক। অসুস্থ সলোমন এক নিমেষে সুস্থ হয়ে গেল, ছদ্মবেশী ডাক্তারের সাহায্যে পুলিশ দু'জনকে কাবু করলো সে। ধস্তাধস্তির সময় ডাক্তারের হাত থেকে অটো-মেটিকটা খসে পড়লো। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সলোমন আর ডাক্তারের দিকে তাক করলো রানা, বললো, হয় তাকেও সঙ্গে নিতে হবে, নয়তো কারো যাওয়া হবে না। নানাভাবে রানার কাছে ঋণী হয়ে আছে সলোমন, তার ওপর শেষ মুহূর্তে রানা যদি গোল বাধায় তাহলে তার পালানো হয় না, এই সব চিন্তা করে রানাকে সাথে নিতে রাজি হলো সলোমন। ডাক্তার ইতস্তত করছে দেখে তাকে সে বললো, নাহিদকে বের করার বিনিময়ে প্রাপ্য ফি দেয়া হবে কাউন্টকে, তাহলে আর অসুবিধে কি?

সহজেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল, সেটায় চড়ে পালালো তিনজন। কিছু দূর গিয়ে নির্জন এক রাস্তায় ওদের দু'জনকে নামিয়ে দিলো ডাক্তার, বললো ওদেরকে নেয়ার জন্যে কেউ একজন আসবে। লোকটা ওদেরকে জিজ্ঞেস করবে, কোথায় যেতে চান বলুন আপনাদের আমি পৌঁছে দিই। ওরা বলবে, ব্যাবিলন। উত্তরে লোকটা বলবে, ব্যাবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা আপনাদের আমি এগিয়ে দিতে পারি।

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ডাক্তার। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা দু'জন। একটু পর হেডলাইট জ্বেলে একটা

ট্যাংকারকে এগিয়ে আসতে দেখলো ওরা। ওদের পাশে থামলো ড্রাইভার। সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা হলো। পেটের ভেতর ওদেরকে ভরে নিয়ে আবার রওনা হলো ট্যাংকার।

প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর আবার নির্জন একটা রাস্তায় ছেড়ে দেয়া হলো ওদেরকে। এবার একটা মেয়ে এলো ওদেরকে নিতে। যুবতী মেয়ে, শরীরে উথলানো যৌবন, কিন্তু দেখতে ভালো না। নাম রোয়েনা। তার সাথেও সাংকেতিক ভাষায় কথা হলো ওদের। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা ফার্মহাউসে নিয়ে এলো সে।

চিলেকোঠা থেকে ওদেরকে আসতে দেখলো ফার্ম হাউসের মালিক হোফার টুইড। তার পাশেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গরিলা আকৃতির ডুগান। হোফার লোকটা পেশায় খুনী, তার কাজই হলো কাউন্টের লোকেরা তার কাছে যাদেরকে পাঠায় তাদের খুন করা। কোনো কারণে খুন করা যদি সম্ভব না হয়, কিংবা যদি অন্য রকম নির্দেশ থাকে, কাউন্টের আরেক লোকের হাতে কয়েদীদের তুলে দেয় সে। অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোক আছে কাউন্টের, কেউ কারো সম্পর্কে কিছু জানে না, প্রত্যেকেরই কাজ হলো হাতে কয়েদী এলেই তাদেরকে খুন করা, কোনো কারণে খুন করা সম্ভব না হলে কিংবা অন্য রকম নির্দেশ থাকলে, পরবর্তী লোকের হাতে তাদেরকে তুলে দিতে হবে। অবশ্য খুন করার আগে কয়েদীর কাছ থেকে তার লুকানো টাকার হদিশ ঠিকই জেনে নেয়া হয়।

গরিলা আকৃতির ডুগান হাবা গোছের লোক, গায়ে অসুরের

শক্তি থাকলেও ঘিলু বলতে কিছু নেই। হোফার টুইডের কথা ওঠেবসে। কয়েদী খুন করার কাজে টুইড তাকে হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করে। লোকটার ঠোঁটের কোণ থেকে সারাক্ষণ সুতোর মতো লালা ঝরছে।

টুইডের অস্থির, রহস্যময় আচরণ ভালো লাগলো না রানার। ডুগানের উপস্থিতিও কেমন যেন খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিলো ওদের মনে। টুইড অসম্ভব বিনয়ী, কথাবার্তায় হেঁয়ালি ভাব। রানাকে সে জানালো, কাল তার স্ত্রী মারা গেছে; সকালে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা হবে। রোয়েনা মেয়েটা চুপচাপ। টুইড তাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় করিয়ে দিলো। খাওয়া-দাওয়ার পর দোতালার একটা ঘরে শুতে এলো রানা আর সলোমন। দু'জনেই খুব অস্বস্তিবোধ করছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দশ পাউণ্ড ওজনের একটা হাতুড়ি নিয়ে দোতালায় উঠলো ডুগান, সাথে তার মনিব হোফার টুইড। উদ্দেশ্য, কয়েদী দু'জনকে খুন করা। ডাক্তার, অর্থাৎ টেনিসন ওরফে রবার্ট পিয়ারসন ওরফে জনি ইতিমধ্যে টুইডের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিল। তার নির্দেশেই রানা আর সলোমনকে খুন করতে এলো টুইড।

কিন্তু ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে হতাশ হলো তারা। ডুগানকে টুইড বললো, ব্যস্ত হবার কিছু নেই, কাজ সারার আরো অনেক সময় পাওয়া যাবে।

ওদিকে ঘরের ভেতর মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে রানা আর সলোমন। দরজার নব নড়তে দেখলো ওরা, কিন্তু ঘুরলো না।

ছুট্ট। আগেই আশংকা করেছিল রানা, এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে, তাই নিজেও ঘুমায়নি, সলোমনকেও ঘুমাতে দেয়নি। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর সলোমন চাপা কণ্ঠে বললো, 'ভাগ্যিস তুমি সাথে ছিলে, তা না হলে…!' ঠিক হলো, পালা করে জেগে রাতটা কাটিয়ে দেবে ওরা।

গল্পের দ্বিতীয় অংশ শুরু হবে পরদিন সকাল থেকে। কাউন্টের ব্যবসাটা কি, মোটামুটি তা আন্দাজ করে নিয়েছে রানা, অর্ধেক টাকা, স্বাধীনতা, এবং নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে কয়েদী-কে জেল থেকে বের করে আনে সে, লুকানো টাকার হদিশ জেনে নেয়, তারপর তাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করে। সেজন্যেই পলাতক কয়েদীদের একজনকেও পরে আর ধরতে পারে না পুলিশ।

রানাকে এখন জানতে হবে হাসানের ভাগ্যে কি ঘটেছে। সে কি বেঁচে আছে, না মরে গেছে? কাউন্ট সমস্যারও একটা সমাধান করতে হবে ওকে। সলোমনের ওপর ওর কোনো দুর্বলতা নেই, আবার কোনো বিদ্বেষও নেই। অর্থাৎ শুধু নিজেকে নয়, সলোমনকে রক্ষা করার দায়িত্বও ওর কাঁধে চাপছে। সলোমন শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি কম।

এরপর কি ঘটবে সে-সম্পর্কে রানা বা সলোমনের কোনো ধারণা নেই। আসুন এখন দেখা যাক ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে নিয়ে যায় ওদেরকে।

এক

পিট পিট শব্দে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে কাঁচে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের উঠনে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। সকালের নিষ্প্রভ আলোয় দৃশ্যটা নোংরা লাগলো। উঠনের এখানে সেখানে ছোটোবড় অনেক গর্ত, নিচে পানি জমায় আবর্জনা-গুলো ভেসে উঠছে। এদিক ওদিক কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি নিয়ে পড়ে রয়েছে ভাঙাচোরা লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি, আর বাতিল যানবাহন। গোটা ফার্মহাউস খাঁ খাঁ করছে, প্রাণের কোনো সাড়া নেই কোথাও।

টেবিলের কাছে ফিরে এলো রানা। 'ক'টা বাজে?'

'ন'টা পঁয়তাল্লিশ।'

'টুইড বলে গেছে ওর স্ত্রীকে দশটায় মাটি দেয়া হবে। সাড়ে দশটার মধ্যে ফিরে আসার কথা ওদের।' টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা। 'তোমার পেট ভরেছে?'

মস্ত একটা ঢেকুর তুললো সলোমন। 'কোনো পুরুষমানুষ

এতো সুন্দর ডিম ভাজতে পারে, আমার ধারণা ছিলো না। ক'টা ডিম খেলাম বলতে পারবো না—চারটে না ছ'টা? তবে পাউরুটি গোটাটাই সাবাড় করেছি।'

'হুটো,' বলে রান্নাঘরের দরজা খুললো রানা, পিছনের উঠন পেরিয়ে চোখ চলে গেল কাছের পাহাড়টার ওপর। পাহাড়ের মাথায় ছোটো একটা পাথুরে ঘর, ঘরটার চারপাশে এক পাল ধূসর রঙের ভেড়া চরছে। 'চারদিকটা একটু হেঁটে দেখে আসা দরকার।'

মুখ তুলে জানালার দিকে তাকালো সলোমন। 'এই বৃষ্টির মধ্যে? তুমি যাও—আমি বরং বাড়িটা সার্চ করি। ভাগ্য ভালো হলে দু'একটা পিস্তল-টিস্তল পেয়েও যেতে পারি।'

'কি মনে করো তুমি টুইডকে? লোকটা জংলী হতে পারে, কিন্তু শেয়ালের চেয়েও চতুর।'

নিচের তালায় নেমে এসে দরজার পিছন থেকে একটা অয়েল-স্কিন কোট নিলো রানা, গলা পর্যন্ত বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এলো বাইরে। আউট হাউসের দেয়াল ঘেঁষে স্তূপ হয়ে রয়েছে এক গাদা মরচে ধরা টিন ক্যান। চলার পথে পড়লো একটা, জুতোর ডগা দিয়ে কিক মারলো রানা। সেটাকে অনু-সরণ করে ঢুকে পড়লো গোলাঘরের ভেতর।

আর সব কিছুর মতো গোলাঘরটাও নোংরা, মাসের পর মাস পরিষ্কার করা হয়নি। দরজা আছে, কিন্তু কবাট থেকে কয়েক ফালি কাঠ উধাও। ছাদের গর্তগুলো থেকে বৃষ্টি পড়ছে। পিছ-নের দরজার কাছে মরচে ধরা লালচে ট্র্যাক্টরের পাশে পুরনো

একটা ক্যাটল ট্র্যাক দেখা গেল, চেষ্টা করলে সম্ভবত এখনো চালানো যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে টিনের ক্যানটাকে আবার কিক মারলো রানা। উড়ে গিয়ে ভেজা ভেজা খড়ের গাদায় গিয়ে পড়লো সেটা, সাঁৎ করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক জোড়া খয়েরি ইঁদুর, মেঝের মাঝখানে থেমে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। কেন যেন ভয়ানক ঘৃণা বোধ করলো রানা। একটা নুড়ি পাথর তুলে ছুঁড়লো ও। লাগলো না, ছুটে গিয়ে আরেক কোণে খড়ের গাদার ভেতর লুকালো ওগুলো।

পিছনের দরজা দিয়ে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এলো রানা। আগাছায় ঢাকা পড়ে আছে সামনেটা। এককালে বাগান ছিলো, আন্দাজ করলো ও। একটা প্রায়-দার্শনিক চিন্তা খেলে গেল মাথায়—শয়তানের হাত থেকে এমন কি সৌন্দর্য পর্যন্ত নিরাপদ নয়। যা কিছু সুন্দর সবই ধ্বংস করে সে। বিধ্বস্ত-প্রায় [illegible] পাঁচিলটা টপকে এলো রানা, পায়ে হাঁটা সরু একটা পথ পেয়ে গেল।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছগুলোর ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে পথটা, পাহাড়ী বাঁকগুলোকে অনুসরণ করে প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে চূড়ায়। হঠাৎ করেই রানা উপলব্ধি করলো, পরিবেশটা উপভোগ করছে সে। বৃষ্টি ভেজা পাথর আর মাটি থেকে সোঁদা একটা গন্ধ আসছে, তারই সাথে তাজা বাতাসে মিশে রয়েছে বনফুলের সুবাস। পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠার পরিশ্রমটুকুও আনন্দের পরশ বুলিয়ে দিলো শরীরে। এক-ঘেয়ে বন্দী জীবনের পর উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে স্বাধীন পদ-

চারণা পুলক জাগালো মনে।

পাথুরে একটা পাঁচিল টপকে শেষ ঢালে পৌঁছুলো রানা। বিশাল সব বোল্ডার চারদিকে, কোথাও কোথাও কাছিমের পিঠের মতো ফুলে আছে ঢালের গা, এরই মাঝে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল। ওর ওপরে, ঘরটার পিছনে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে কাঁটাঝোপ, শাখাগুলো অদ্ভুতভাবে মোচড়ানো, হাড্ডিসার হাতের লম্বা আঙুলের মতো বাতাসের দাপটে সবগুলোই একটামাত্র দিক নির্দেশ করছে।

ফার্মহাউস থেকে ঠিকমতো বোঝা যায়নি, ঘরটা আসলে বেশ বড়সড়। ভেতরে শুকনো, তাজা খড় রয়েছে। বস্তা ভরা ভেড়ার খাবারদাবারও প্রচুর। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বেরিয়ে এলো রানা। ছড়ানো এক গাদা পাথর টপকে পাহাড়ের কিনারায় এসে দাঁড়ালো।

নিচে কুয়াশা ঢাকা উপত্যকা, প্রধান সড়কটা প্রায় পরিষ্কার দেখা গেল। রাস্তার আরো সামনে ঝিলমিল করছে পানি। সম্ভবত একটা লেক। ঘুরে দাঁড়ালো রানা, এবং প্রায় চমকে উঠে দেখলো। কাছেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—রোয়েনা টুইড।

ম্লান, রুক্ষ প্রকৃতির সাথে মেয়েটার বিমর্ষ চেহারা মিলে গেছে। পুরনো একটা কালো কোট পরে আছে সে, কাঁধের কাছে প্যাড লাগানো। আজকাল আর এ-ধরনের কোটের চল্ নেই। গ্রাম্য কঠিন দু'গাল ঘিরে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে তালি দেয়া একটা স্কার্ফ।

'হ্যালো,' বললো রানা, ধীর পায়ে মেয়েটার দিকে এগোলো। 'সব সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে তো?'

রোয়েনার চেহারায় অদ্ভুত নির্লিপ্ত একটা ভাব, মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'প্রিস্ট মোটেও সময় নষ্ট করেনি। এই বৃষ্টির মধ্যে কে ভিজতে চায়।'

'তোমার বাবা কোথায়?'

'ডুগানকে নিয়ে পাশের গ্রামে গেছে। রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গেছে আমাকে। তাড়াতাড়ি হবে বলে পাহাড়ী পথ ধরে চলে এলাম। ভেড়াগুলোকেও একবার দেখা হয়ে যাবে।'

'তুমিই বুঝি ওগুলো দেখাশোনা করো?'

'একরকম তাই। মেজাজ ভালো থাকলে ডুগান অবশ্য সাহায্য করে। মুশকিল হলো, নিজের শক্তি সম্পর্কে লোকটার কোনো ধারণা নেই। একটা ভেড়ার বাচ্চাকে হয়তো আদর করছে, পর মুহূর্তে দেখা গেল ঘাড় ভেঙে মরে আছে সেটা। ওর ওপর কোন ভরসা করা যায় না।' সরু পথ বেয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো রোয়েনা।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রানা, তারপর বললো, 'তোমার মা মারা গেলেন—আমি দুঃখিত।' রোয়েনাকে অনুসরণ করলো ও।

'আমি নই,' নিষ্ঠুর শোনালেও, স্পষ্ট করে বললো রোয়েনা। 'এক বছর ধরে স্টমাক ক্যানসারে ভুগলো, অথচ হাসপাতালে যেতে রাজি হয়নি। আমাকেই দেখাশোনা করতে হতো। মানুষ মরে গেলে কি হয় আমি জানি না, তবে এখান থেকে চলে যেতে

পেরেছে বলে যার প্রতি আমার হিংসা হয়।'

'কেন, এই জায়গা তোমার ভালো লাগে না?'

চেহারায় অবাক ভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রোয়েনা। 'এ-ধরনের একটা জায়গা কার পছন্দ হবে?' লম্বা করা একটা হাত একদিক থেকে আরেক দিকে নিয়ে গেল সে, রুক্ষ গোটা এলাকাটা দেখালো সে। 'এখানে এমনকি গাছগুলো পর্যন্ত অশুভ চেহারা নিয়ে বেড়ে ওঠে। প্রাণ কোথায় এখানে? এটা তো একটা বাতিল জগৎ। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এখানে শুধু ভেড়াগুলো বেঁচে আছে। সেটাও কোনো খুশি হয়ে ওঠার মতো ব্যাপার নয়। ভেড়াগুলো ভুগানের মতো—বোধবুদ্ধি নেই।'

'তাহলে তুমি অন্য কোথাও চলে যাও না কেন?'

'এতোদিন যেতে পারিনি মার জন্যে। এখন বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখানে থাকতে থাকতে ছিবড়ে হয়ে গেছি আমি। মনটা মরে গেছে। আর যাবোই বা কোথায়? কিছুই তো চিনি না।'

মেয়েটার চেহারায়, কণ্ঠস্বরে গভীর বেদনা ফুটে উঠলো। তার জন্যে আন্তরিক দুঃখ অনুভব করলো রানা। ইংল্যাণ্ডের মতো উন্নত, সভ্য একটা দেশেও কোনো মেয়ের এই করুণ অবস্থা হতে পারে বিশ্বাস করা যায় না। নিজের দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়লো ওর। গোণা-গুণতি কিছু বাদ দিলে, মেয়েরা সবাই বন্দী-জীবন যাপন করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেল, নারী-নির্যাতনের অবসান আর হলো না। দেশ স্বাধীন হবার পরও মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারছে

না। অদূর ভবিষ্যতে পারবেও না। যতদিন না দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে পুরুষের, ততদিন চলবে এই অবস্থা।

রোয়েনার দুঃখটুকু অনুভব করে একটু অস্থির হলো রানা। অনেকটা সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললো, 'তোমার মা চলে গেলেন, এখন হয়তো তোমার বাবা তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

হঠাৎ কর্কশ একটু শব্দ করে হেসে উঠলো রোয়েনা। 'ওই লোকের কথা আর বলবেন না। আমাকে নিয়ে তার একটাই ইচ্ছে···আমি শক্ত না হলে এতো দিনে সে—হুঁহ্,' আবার পথ চলতে শুরু করলো রোয়েনা। 'আমার তিন বছর বয়েসে বাবা মারা যান। মার মতো বাবাও ছিলেন জিপসি। দশ বছর আগে স্লিপটন মার্কেটে হোফার টুইডের সাথে পরিচয় হয় মার, এক হপ্তার মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। জীবনে এর চেয়ে বড় ভুল বোধহয় মা আর করেনি।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটাকে তুমি ঘৃণা করো।'

'এই জায়গাটাকেও—জীবনে একটাই চাওয়া আমার, এখান থেকে মুক্তি।'

'যদি সুযোগ হয়, কোথায় যেতে পারলে খুশি হও?'

হাঁটার গতি মুহূর্তের জন্যে শ্লথ হলো রোয়েনার। 'তা তো কখনো ভেবে দেখিনি। যে-কোনো শহর হলেই চলে, যেখানে ভালো একটা চাকরি পাবো, সুন্দর কাপড় পরতে পারবো, ভদ্র লোকজনের সাথে মেলামেশার সুযোগ আছে। লণ্ডন হলে মন্দ হয় না।'

বুঝতে অসুবিধে হয় না লণ্ডন রোয়েনার কাছে চাঁদের মতোই

দুরে, এবং সাংঘাতিক রোমান্টিক একটা জায়গা। 'নাগালের বাইরে অনেক জিনিসই লোভনীয় মনে হয়,' নরম স্বরে বললো রানা। 'এমনও হতে পারে লণ্ডন তোমার কাছে এখানকার চেয়েও খারাপ লাগবে।'

'যদি লাগে, তাহলে আর কোথাও চলে যাবো,' বললো রোয়েনা। 'তবে এখানকার চেয়ে খারাপ লাগতেই পারে না। এটা তো স্রেফ একটা নরক। জানেন, কোথাও যাবার সুযোগ নেই বলেই হয়তো বেড়াবার ভারি শখ হয় আমার। সেজন্যে আপনার বন্ধুকে আমার ঈর্ষা হয়।'

থতমত খেয়ে গেল রানা। 'কার কথা বলছো!'

'জো সলোমন।'

'মানে?'

'আমি জানি, উনি ঘরকুনো নন,' বললো রোয়েনা। 'ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব শহরে বেড়িয়েছেন উনি।'

'তুমি জানো?'

'হ্যাঁ।'

কোত্থেকে জানলো তা আর জিজ্ঞেস করলো না রানা, একটু পর নিজেই বলবে রোয়েনা। 'তাকে ঈর্ষা করার কারণটা ঠিক বুঝলাম না,' বললো ও। 'পাঁচ বছর জেল খেটেছে, ধরা পড়লে আরো পনেরো বছর—না, আরো কয়েক বছর বেশি খাটতে হবে। ধরা না পড়লেও যতো দিন বেঁচে থাকবে বেশির-ভাগ সময় লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে, বেড়াবার দিন শেষ।'

'আগের কথা ভেবেই বললাম,' রোয়েনার কণ্ঠস্বরে একটু যেন

অসহিষ্ণু ভাব। তারপর খুব উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, উনি স্মাগলার ছিলেন?'

'শুধু স্মাগলার কেন, আরো অনেক কিছু ছিলো সে।'

রানার বলার মধ্যে ব্যঙ্গ থাকলেও সেটা খেয়াল করলো না রোয়েনা। রানার মনে হলো, সলোমনের ব্যাপারে মেয়েটা একটু যেন বেশি উৎসাহী।

শুধু উৎসাহী নয়, রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লো রোয়েনা। হড়বড় করে বলতে শুরু করলো সে, 'গত বছর সানডেতে ওঁর সম্পর্কে একটা লেখা পড়েছিলাম। লেখাটায় ওঁকে আধুনিক রবিন হুড বলা হয়েছিল।'

'অনেক দৃষ্টিভঙ্গির একটা,' বললো রানা। 'সত্যি কিনা তা নির্ভর করে আসল রবিন হুড কি রকম ছিলো তার ওপর।'

'সত্যি নয় মানে?' মৃদু ঝাঁঝের সাথে প্রশ্ন করলো রোয়েনা। 'সানডে-তে এক বুড়ির সাক্ষাৎকারও ছাপা হয়েছিল। ভাড়া দিতে পারছিল না বলে বাড়িওয়ালা তাকে বের করে দিচ্ছিল ঘর থেকে, কথাটা কেউ মিঃ সলোমনের কানে তোলে। বুড়িকে তিনি তখুনি পাঁচশো পাউণ্ড পাঠিয়ে দেন। অথচ জীবনে বুড়িকে তিনি কখনো দেখেননি।'

রানা মেয়েটাকে বলতে পারে ঘটনাটা ঘটেছিল এসেক্সে ডাকাতি করার পর, সলোমনের হাতে তখন নগদ সত্তর হাজার পাউণ্ড রয়েছে। এই ডাকাতিতে দু'জন দারোয়ানকে আহত করে সে, একজনের খুলি ফেটে গিয়েছিল, আরেকজন একটা হাত হারায়। কিন্তু বলে কোনো লাভ নেই, অযথা সময় নষ্ট

, কলা হলো।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে রানা বললো, 'সন্দেহ নেই কিছু মহৎ গুণ তার আছে বটে।'

মাথা ঝাঁকালো রোয়েনা। ভারি খুশি হয়েছে কথাটা শুনে। 'আমি চাই উনি যেন নিরাপদে পালাতে পারেন। চোর হোক, ডাকাত হোক, অন্তরটা তো ভালো। আপনাদের দু'জনের জন্যেই প্রার্থনা করবো আমি।'

দুঃখী মেয়ে, তোর জন্যে কে প্রার্থনা করে।

'আমাদের মতো আরো লোক তোমাদের এখানে আসে, তাই না?' কাজের কথায় ফিরে এলো রানা।

'আসে। আপনাদের নিয়ে এ-বছরই তো দশ-বারো জন এসে গেল।'

'সলোমনের তিন বন্ধুও বোধহয় এসেছিল, তাই না?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটন? নাকি ওদের কাউকে তুমি দেখোনি?'

সাথে সাথে আড়ষ্ট হয়ে গেল রোয়েনার শরীর। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে যখন তাকালো, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি, সমস্ত ভাব অদৃশ্য হয়েছে চেহারা থেকে। 'হ্যাঁ, ওরা এসেছিল।'

এবার রানার পেশীতে টান পড়লো। রিপ হটন অর্থাৎ বদরুল হাসানও এসেছিল? 'তিনজনই?'

মাথা ঝাঁকালো রোয়েনা।

'ক'দিন করে ছিলো ওরা?'

রোয়েনার চেহারায় কেমন যেন একটা চাপা বিচলিত ভাব।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললো সে, 'আমি জানি না। ওদে
আমি যেতে দেখিনি।'

হঠাৎ রানার তলপেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। 'যেতে দেখোনি—সেটা কি অস্বাভাবিক?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, অস্বাভাবিক,' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না রোয়েনা। 'আর সবাই দু'দিন কি তিন দিন করে থাকে, কাউকে কাউকে চলে যেতে দেখি। আমার সৎ বাবা ওদেরকে গাড়ি করে নিয়ে যায়।'

চলে যেতে দেখেনি মানে কি এখানেই কোথাও লাশ হয়ে আছে ওরা তিনজন? রানার মনের ভেতর ঝড় বইছে। হাসানের সুদর্শন, হাসি-খুশি চেহারাটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। তাহলে কি সে বেঁচে নেই?

'পরিষ্কার করে বলো আমাকে,' রানার গলায় আবেদনের সুর। 'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হর্টনকে রাস্তা থেকে এখানে নিয়ে আসো তুমি, ঠিক যেমন আমাদেরকে নিয়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে নিয়ে আসার পর তাদের আর দেখোনি তুমি?'

'একটু ভুল হয়েছে,' বললো রোয়েনা। 'ওদের দু'জনকে তারপর আর দেখিনি। একজনকে দেখেছি—পরদিন আমার সৎ বাবা তাকে গাড়ি করে কোথায় যেন নিয়ে যায়।'

'কে সে?'

'রিপ হুটন।'

তবে কি বেঁচে আছে হাসান?

বৃষ্টির মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা। বাতাসের একটানা হাহাকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

'তোমার বাবা রিপ হুটনকে নিয়ে যায়,' নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা। 'কোথায়, রোয়েনা?'

'আমি জানি না।'

'বাকি দু'জন? কোথায় তারা? কি ঘটেছে তাদের ভাগ্যে?'

'জানি না, সত্যি আমি জানি না!' হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠলো রোয়েনা।

'জানো না, নাকি জানতে চাও না?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো রোয়েনা, ঠাণ্ডায় হি হি করছে। তার একটা কনুই চেপে ধরলো রানা। 'ঠিক আছে, রোয়েনা, শান্ত হও। তোমার কোনো ভয় নেই।' সরু পথ বেয়ে নামতে শুরু করলো ও। খানিকটা নেমে এসে দাঁড়ালো আবার, ঘুরলো। 'তুমি নামছো না?'

'ভেড়াগুলোকে দেখতে হবে,' হাত দুটোকে শক্তভাবে এক করেও কাঁপুনি থামাতে পারছে না রোয়েনা। 'পরে—পরে আসছি আমি।'

তর্ক না করে হন হন করে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো রানা। দেখার প্রথম মুহূর্তেই হোফার টুইড আর তার কালো ছায়া ডুগানকে মূর্তিমান শয়তান বলে সন্দেহ করেছিল ও।

রোয়েনার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো। রাতে শোবার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করেছিল টুইড, কথাটা মনে পড়তেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।

পাথুরে পাঁচিলের কাছে সলোমনের সাথে দেখা হলো।

'কিছু পেলে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো সলোমন। 'একটা শটগান পর্যন্ত নেই। জায়গাটা কোথায় তা অবশ্য জানতে পেরেছি। এটা ওয়াইকেহেড ফার্ম, সেটল্‌-এর কাছে।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে তাকালো সে। 'তোমাকে যেন উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার?'

'ভালো বুঝছি না,' বললো রানা। 'এইমাত্র কথা বললাম রোয়েনার সাথে। কেন যেন মনে হচ্ছে উডশেডে সাংঘাতিক কিছু একটা আছে।'

'আরে, কি হলো তোমার? প্রলাপ বকছো নাকি?'

'আলোচনার সময় নেই। রোয়েনাকে জন হেরিক আর রিড কোয়েনের কথা জিজ্ঞেস করো, নিজেই বুঝতে পারবে। চূড়া থেকে মেইন রোডটা পরিষ্কার দেখা যায়, টুইডের গাড়িটাকে আসতে দেখলেই ছুটে নেমে এসে আমাকে সাবধান করবে। ঠিক আছে?'

সলোমনকে ওখানে রেখেই বাড়ির দিকে ছুটলো রানা। বিস্ফারিত চোখে রানাকে কিছুক্ষণ দেখলো সলোমন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করলো সে।

নেভীতে চাকরি করার সময় সাগরের সাথে প্রেম থাকলেও জো সলোমন আসলে শহুরে জীব। পাহাড় বেয়ে চূড়ায় ওঠার

সময় মাঝে মধ্যে থামলো সে, চারদিকের রুক্ষ প্রকৃতি তার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়ে তুললো। অনেকটা যেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই শক্ত পাথরের ওপর জোরে জোরে পা ঠুকে এগোলো সে। তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো কিছুই নেই চারপাশে। চূড়ায় উঠে ঘরটাকে পাশ কাটালো সে, কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো। রানা যেমন বলেছিল, রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মতো একটা সচল আকৃতি দৃষ্টি কেড়ে নিলো। একটা ট্রাক। কিন্তু টুইডের কালো ফোর্ডের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।

ঘুরে ঘরটার দিকে তাকালো সলোমন। সাথে সাথে রোয়েনাকে দেখতে পেলো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুকে একটা শিশু ভেড়া, আদর করছে সেটাকে। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিলো রোয়েনা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। দরজার কাছে পৌঁছে সলোমন দেখলো মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে একটা পাত্রে দুধের সাথে আর কি যেন মেশাচ্ছে রোয়েনা।

'এই মেয়ে,' ডাকলো সলোমন। 'তোমার বাবা এখনো ফিরলো না যে?'

'ডুগানকে নিয়ে পাশের গ্রামে গেছে। ভেড়াগুলোকে দুধ খাওয়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি আমি,' মুখ না তুলেই জবাব দিলো রোয়েনা।

একটা সিগারেট ধরালো সলোমন, আস্তে করে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর। হঠাৎ সে তার বুকে অসহ্য একটা টান টান ভাব

অনুভব করলো, মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে। গা থেকে কোটটা খুলে ফেলেছে রোয়েনা, পুরনো উলেন ড্রেসটা উরু ... নিতম্ব কামড়ে বসে আছে।

হঠাৎ চমকে দিয়ে গুরু গম্ভীর শব্দে মেঘ ডেকে উঠলো বাইরে, সেই সাথে বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। চট্‌ করে বাইরে তাকানোর ছলে সলোমনকে একবার দেখে নিলো রোয়েনা। ঘরের ভেতর গভীর ছায়া, কাল রাতের মতো আজ এই মুহূর্তেও সলোমনের চোখে রোয়েনার চেহারার কদর্য ভাবটুকু তেমন ধরা পড়লো না। কাপড়ের নিচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা স্তন, গুরু নিতম্ব, চওড়া পিঠ, পুরুষ্ট উরু, শুধু এই সবই দেখতে পেলো সে।

দাঁড়ালো রোয়েনা, দেয়ালের গায়ে একটা র‍্যাকের দিকে হাত বাড়ালো। সলোমনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সিগারেট ফেলে দিলো সে। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এগোলো রোয়েনার দিকে। হাত দুটো দিয়ে তাকে ছুঁলো সে। নিজের দিকে টানলো।

রোয়েনাকে ঘোরালো সলোমন। কাঠের মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে থাকলো রোয়েনা। চেহারায় কোনো ভাব নেই। সলোমনের বেয়াড়া আঙুলগুলো তার শরীরে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো, রোয়েনা বাধা দিলো না।

পাঁচ বছর কোনো মেয়ের গন্ধ পাইনি। সারা শরীরে তুমুল উত্তেজনা নিয়ে ভাবলো সলোমন। দীর্ঘ, কঠিন পাঁচটা বছর। হাতের কাছে এমন খাসা মাল পেয়ে কেন আমি নিজেকে বঞ্চিত করি, কোন্‌ অধিকারে? জন হেরিক আর রিড কোয়েনের কথা, রানার অদ্ভুত আচরণের কথা, সব ভুলে গেলো সে। কামনায়

অধীর হয়ে রোয়েনাকে নিজের বুকের ওপর টেনে আনলো। পিষতে লাগলো পাঁজরের সাথে।

ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠলো রোয়েনা। সেদিকে সলোমনের খেয়াল নেই। হিংস্র পশু যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ফড় ফড় করে রোয়েনার কাপড় ছিঁড়ে ফেললো সে। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। শূন্যে তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেললো সে রোয়েনাকে খড়ের গাদায়। ভুলে গেল তার দায়িত্বের কথা।

নিচের উপত্যকায়, মেইন রোড থেকে বাঁক নিয়ে ফার্ম হাউসের মেটো পথে নেমে এলো হোফার টুইডের কালো ফোর্ড।

সলোমনের ঘোর কাটলো। ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে চিৎ হলো সে, ছাদের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগলো। যা ঘটে গেল তার মধ্যে সূক্ষ্ম বা কোমল কোনো অনুভূতি ছিলো না, ছিলো পাশবিক উন্মত্ততা। তার পাশেই শুয়ে থাকলো রোয়েনা, চোখ জোড়া বন্ধ, তার নাকের নিচে ঠোঁটের ওপরটা ভেজা ভেজা। তার দিকে তাকিয়ে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো সলোমনের। মেয়েটা কুৎসিত, ধরে ফেলেছে সে। শুধু চেহারা নয়। নোংরা চুল, নোংরা মোজা, মুখের ভেতর পচা দুর্গন্ধ।

একটু সরে গেল সলোমন, সাথে সাথে চোখ মেললো রোয়েনা। জোর করে একটু হাসলো সলোমন। 'এই মেয়ে, ঠিক আছো তো?'

'জো, ওহ্ জো, তোমাকে আমি ভালোবাসি!' সলোমনের একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো রোয়েনা, মুখটা ঘুরিয়ে তার কাঁধে

ঠেকালো। পরমুহূর্তে আনন্দের আতিশয্যে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।

এ এমন এক মেয়ের কান্না, জীবনে যে কখনো ভালোবাসা বা কোমল ব্যবহার পায়নি কারো কাছে। কেউ তাকে কাছে ডেকে আদর করেনি, দুটো সান্ত্বনার কথা শোনায়নি। কিন্তু রোয়েনাকে বোঝার মতো ধৈর্য, গরজ, সূক্ষ্ম বোধশক্তি সলোমনের নেই। রোয়েনার কাছে গোটা জগৎটাই মায়া, সেই মায়ার জগতে সলোমন একমাত্র বাস্তবতা হয়ে দেখা দিয়েছে, স্বভাবতই সলোমনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবে সে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রোয়েনার কাঁধ চাপড়ে দিলো সলোমন, তারপর উঠে পড়লো। ট্রাউজার পরে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো সে। কি প্রসঙ্গে কথা বলা যায় ভাবতে গিয়ে নাহিদের কথা মনে পড়লো। 'তোমার সাথে নাহিদের কিছু হয়েছে নাকি? আসার সময় পথে দেখা হলো, মনে হলো খুব উত্তেজিত।'

খড়ের ওপর বসলো রোয়েনা। নোংরা হলেও ভরা যৌবন, চোখ ফেরাতে পারলো না সলোমন। তার শরীর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছে অনুভব করে নিজেকে চোখ রাঙালো সে। কাপড়টা তুলে নিয়ে পরতে শুরু করলো রোয়েনা। 'বাপের কালেও এমন ভালোবাসার কথা শুনিনি,' কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বললো সে। 'এটাই তোমার বৈশিষ্ট্য বুঝি? কাপড় না ছিঁড়ে ভালোবাসতে পারো না?'

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলো সলোমন। কঠিন সুরে

বললো, 'তোমাকে না আমি একটা প্রশ্ন করলাম।'

ব্লাউজের পকেট থেকে ছোট্ট একটা চিরুণী বের করে মাথা আঁচড়াতে শুরু করলো রোয়েনা। 'উনি জানতে চাইছিলেন আরো লোকজন এখানে আসে কিনা।'

'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হর্টন—এরা এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'নাহিদ আর কি জানতে চাইলো?'

'আমি ওদের চলে যেতে দেখেছি কিনা।'

সলোমনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'দেখেছো?'

মাথা নাড়লো রোয়েনা। 'আসে তো অনেক লোক, তারা কেউ কেউ দু'তিন দিন থেকে আবার চলে যায়। কিন্তু তোমার দুই বন্ধুকে আমি যেতে দেখিনি।'

'দুই বন্ধু?'

'জন হেরিক, আর রিড কোয়েন।'

'ওদেরকে তুমি যেতে দেখোনি?' কথাটার তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে আরো দু'সেকেণ্ড সময় লাগলো সলোমনের। তারপরই তার চোখ জোড়া আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। ফিসফিস করে বললো সে, 'জেসাস ক্রাইস্ট।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা শটগানের দুটো ব্যারেল পর পর বিস্ফারিত হলো। নিচের উপত্যকা থেকে, তুমুল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওপরে উঠে এলো আওয়াজটা।

দরজার দিকে ঘুরলো সলোমন। লাফ দিয়ে ছুটে এসে খপ্ করে তাকে ধরে ফেললো রোয়েনা। 'যেয়ো না, জো! যেয়ো না!

তোমাকে আমি ওখানে…।' আর্তস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠাস করে তার গালে চড় মারলো সলোমন। ছিটকে খড়ের গাদার ওপর পড়লো রোয়েনা। 'দেখ, মাগী, ফাঁদ পেতেছিস। দাঁড়া আসছি!'

ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সলোমন। এক মুহূর্ত পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকলো রোয়েনা, তারপরই চিৎকার করে উঠে সলোমনের পিছু পিছু ছুটলো সে।

দুই

পাহাড় থেকে ফার্মহাউসে নেমে এসে থমকে দাঁড়ালো রানা, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব, কি খুঁজছে তাও যেন ভালো করে জানে না। ওর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, জন হেনরিক আর রিভ কোয়েন যদি এখান থেকে কোথাও না গিয়ে থাকে, তাহলে এই বিশাল পাহাড়ী এলাকার যে-কোনো জায়গায় ওদের লাশ থাকতে পারে—কোথায় খুঁজবে সে? দুই পাহাড়ের মাঝখানে আছে খাদ, পাহাড়শ্রেণীর পিছনে রয়েছে বনভূমি আর জলা, খুঁজতে শুরু করলে পাঁচশো বছর লেগে যাবে কংকালগুলো পেতে।

ধীর পায়ে পাথুরে প্যাসেজে উঠে এলো রানা, এক মিনিট দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো কি করা যায়। অনুভব করলো, চারপাশ থেকে ওর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে গভীর নিস্তব্ধতা। ওর বাঁ দিকে একটা দরজা রয়েছে, ডান দিকে রয়েছে আরেকটা, ডাইনিং আর লিভিংরুমে যাওয়া যায়। প্যাসেজের শেষ মাথায়

রান্নাঘরের দরজা। হঠাৎ আরেকটা দরজা চোখে পড়লো, সিঁড়ি নিচে।

দরজাটা খুলতেই ভ্যাপসা একটা গন্ধ ধাক্কা দিলো নাকে। ভেতর দিকের দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচটা অন করলো রানা। একটা পাথুরে সিঁড়ি, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে নিচের দিকে। ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করে নিজেকে ধমক দিলো ও, এতো ভয় পাবার কি আছে? ভূত বিশ্বাস করি না। খুব বেশি হলে দু'একটা সাপ, আর এক-আধটা কংকাল দেখতে পাবো।

সিঁড়ির নিচে সরু, সাদা চুনকাম করা একটা প্যাসেজ। বাঁক নিয়ে আরেক প্যাসেজে চলে এলো রানা। দু'ধারেই সার সার স্টোররুম, বাতিল জিনিস-পত্র আর আবর্জনায় ঠাসা। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌছে হতাশ হলো রানা, পাতালপুরিতে আবিষ্কার করার মতো কিছু আছে বলে মনে হলো না। রুমগুলোয় উঁকি দিয়ে দেখেছে, একটা হাড় পর্যন্ত চোখে পড়েনি। মেঝেগুলো মসৃণ।

প্রথম প্যাসেজে ফিরে এলো রানা। সিঁড়ির দিকে এগোলো।

'হাওয়া খাওয়া হচ্ছে বুঝি?' সিঁড়ির মাথা থেকে ব্যঙ্গ করলো হোষ্কার টুইড। 'কিন্তু এ-জায়গাটা যে বড় দুর্গন্ধ!' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে, বগলের তলায় একটা ডাবল ব্যারেল শটগান।

সিঁড়ির গোড়ায় একবার শুধু একটু শ্লথ হলো রানার গতি, ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলো ও। 'হাওয়া খাচ্ছি না, বেড়াচ্ছি,' বললো ও। 'দুর্গন্ধের জন্যে এখানে যারা বাস করে তারা

দামী।'

পিছু হটে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল টুইড, চোখ-মুখ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত। 'মিঃ জো সলোমনকে কোথাও দেখছি না, যে?'

'আছে কোথাও আশপাশে।'

'আর রোয়েনা, আমার ছুছুন্দরী কন্যা?' জিভ আর টাকরা সহযোগে অশ্লীল একটা শব্দ করলো টুইড। 'হিশাবে বলে, ওরা একসাথে আছে, তাই না, মিঃ নাহিদ শাহ?' কনুই দিয়ে রানার পাঁজরে মৃদু একটা গুঁতো মারলো সে।

'থাকলেও আমি জানি না।'

লোকটা সারাক্ষণ হাসছে বটে, কিন্তু পরিবেশটা উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে। বিপদের মধ্যে রয়েছে রানা, যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তৈরি হয়ে আছে ও, যাই ঘটুক, সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। অস্পষ্টভাবে অনুভব করলো হাতের সেলাইগুলোর কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। যতোই তৈরি থাক ও, বিপদের সময় হয়তো মাত্র একটা হাত ব্যবহার করতে পারবে।

আরো এক পা পিছিয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো হোফার টুইড। 'পেছন দিকে, বুঝলেন,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আছে সে, যেন কি এক গোপন পুলক চেপে রাখতে পারছে না, 'মজার একটা জিনিস আছে। সবাইকে দেখাই না। কেউ নেই, আমরা একা, এখনই সুযোগ। আসুন।'

ঘুরলো সে, বেশ কিছুটা আগে আগে হাঁটতে শুরু করলো।

প্যাসেজ, তারপর রান্নাঘর হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। উঠনের এক ধারে থামলো টুইড, ছোটো একটা গেট খুলে ঢুকে আরেকটা উঠনে ঢুকলো। তার পিছু নিলো রানা।

প্রায় ফাঁকা উঠন, মাঝখানে শুধু একটা ঢাকনি লাগানো পুরনো কূপ, গোল করে ঘিরে আছে নিচু পাঁচিল। পাশেই দাঁড়িয়ে গরিলাসদৃশ ডুগান, কদর্য চেহারায় স্থির হয়ে আছে অশ্লীল হাসি, ঠোঁটের কোণ থেকে মোটা সুতোর মতো লালা ঝরছে। হাত দুটো একটু বাঁকা করে সামনে বাড়ানো, ভাবটা যেন কিছু ধরবে বলে অপেক্ষা করছে।

'আমাদের ডুগানের একটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনাকে বলেছি, মিঃ নাহিদ শাহ?' খিক খিক করে হাসলো টুইড। 'নারকেল ভাঙার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। তবে মুশকিল হলো, মানুষের মাথাকেও নারকেল বলে গণ্য করে ও।'

'তাই নাকি?' ডুগানের দিকে কঠিন চোখে তাকালো রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে, গেটের দিকে তাকালো ডুগান। লক্ষ্য করে আবার খিকখিক করে হাসলো টুইড। 'কোনো চিন্তা নেই, ডুগান, তোমার কাজ তুমি নিরাপদে সারতে পারবে। মিঃ সলোমনের কথা ভাবছো তো? তিনি লোভে পড়ে গেছেন, নারী-মাংস ফেলে আসতে পারবেন না।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'বিরোধী পক্ষকে দু'ভাগ করার জন্যে এই নারী মাংসের কোনো তুলনা হয় না, বুঝলেন। আমার রোয়েনা পটে আঁকা ছবি তা বলছি না, কিন্তু ওর শরীরে যেখানে যা থাকা দরকার সব আছে, একটু বরং বেশি বেশিই আছে। তাছাড়া, একটা কথা তো সত্যি,

আপনার বন্ধু টানা পাঁচ বছর ধরে উপোস আছেন। দেখতে হয়তো ভালো নয়, কিন্তু জিনিস যে খাসা তা তাকে স্বীকার করতেই হবে।' বিরক্তি নিলো সে, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাঁক ছাড়লো, 'তৈরি হও, ড্রগান! সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না!'

শটগানের ব্যারেলটা রানার পিঠ ছুঁলো, একই সাথে উঠনের ওপর ঝনাৎ করে আছড়ে পড়লো কুয়ার ঢাকনি। পিঠে শটগানের স্পর্শ পেতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। ঘুরলো ও, ব্যারেল ঢুকলো বগলের তলায়। ডান হাতের কিনারা দিয়ে টুইডের কানের নিচে, ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো রানা। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠলো টুইড, এলোমেলো পা ফেলে পিছিয়ে গেল। ডান হাতের হ্যাঁচকা টানে শটগানটা কেড়ে নিলো রানা। আঙুলের সাহায্যে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হ্যামার তুললো। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে ছুটে এলো ড্রগান, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। পিছন ফিরে সময় নষ্ট করলো না, সামনের দিকে ছুটলো। জানোয়ারটাকে বাধা দিতে হলে দু'জনের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক দরকার।

গেটের দিকে ছুটতে শুরু করে একবার শুধু আড়চোখে ড্রগান-কে দেখে নিলো রানা। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো জন্তু ধাওয়া করে আসছে, ঘৃণ্য চেহারা আক্রোশে বিকৃত, ছিঁড়ে আর ফেড়ে ফেলার জন্যে বিশাল দুই হাত লম্বা করে দিয়েছে। রানা তাকে এমন কি কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে দিলো না। জানে, অসুরটার সাথে গায়ের জোরে পারবে না সে। বগলের নিচে শটগান চেপে সবেগে

আধপাক ঘুরলো, বাঁ হাতের ওপর লম্বা হয়ে থাকলো ব্যারেল, বিকট শব্দের সাথে পর পর দুটো বুলেট বেরিয়ে গেল। প্রথম গুলিটা ডুগানের বুকে লাগলো, প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিলো পথের ওপর। দ্বিতীয় গুলি খসিয়ে দিলো মুখের অর্ধেকটা। পাথুরে মেঝেতে ছিটকে পড়লো মগজ, হাড়, আর রক্ত।

আশ্চর্য! তারপরও আছাড় খেলো না ডুগান। পিছু হটে নিচু পাঁচিলের গায়ে পড়লো সে, ধপ্ করে বসে পড়লো পাঁচিলের মাথায়। তারপর পিছন দিকে ঢলে পড়তে শুরু করলো শরীরটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গিয়ে বুকে ঠেকলো। পিছন দিকে ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে কুয়ার ভেতর নেমে গেল সে। কোনো শব্দ হলো না। কুয়ার নিচে থেকে একটা আওয়াজ উঠে এলো, মাত্র এক-বার ছলকে উঠলো পানি।

আবর্জনায় মুখ দিয়ে উপুড় হয়ে আছে হোফার টুইড, দেহটা মোচড় খাচ্ছে। গোঁ গোঁ করে গোঙাচ্ছে এখনো। একটা হাঁটু ভাঁজ করে তার পাশে নিচু হলো রানা, পকেট হাতড়ে এক মুঠো কার্ট্রিজ বের করলো। শটগান রি-লোড করে সিধে হলো ও, ঝেড়ে একটা লাথি মারলো টুইডের পাঁজরে। 'দাঁড়াও।'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো টুইড, পিছু হটে উঠনের পাঁচি-লের দিকে সরে গেল। তার সাথে সাথে এগোলো রানা, লোকটার চিবুকের নিচে শটগানের মাজ্‌ল্ ঠেকালো।

'জন হেরিক আর রিড কোয়েন, দু'জনেই ওই কুয়ার ভেতর আছে, তাই না?' টুইড ইতস্তত করছে দেখে শটগান ধরা ডান হাতটা ঝাঁকালো রানা, চিবুকের নিচে নরম মাংসে ব্যথা পেয়ে

ককিয়ে উঠলো টুইড। 'কি, সত্যি?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো টুইড। 'সত্যি—হ্যাঁ, সত্যি।'

'মোট ক'জন?' লোকটা আবার ইতস্তত করছে দেখে হ্যামার কক্ করলো রানা।

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো টুইড। 'মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে মেরো না!' অবোধ শিশুর মতো ফোঁপাতে লাগলো সে। 'বেশি না, মাত্র চারজন!'

'বেশি না!' দাঁতে দাঁত ঘষলো রানা, ট্রিগার টেনে দেয়ার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে দমন করলো। 'বাকি লোকরা নিরাপদে চলে যেতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ। আমার কোনো দোষ নেই, আমি শুধু হুকুম পালন করেছি।'

'তা বটে, তোমার আর কি দোষ! বাকি লোকগুলো এরপর কোথায় যায়?'

'আমি জানি না।' শটগানের ব্যারেল আবার ঝাঁকি খেলো, আতংকে চেঁচিয়ে উঠলো টুইড, 'ফর গডস্ সেক, সত্যি কথা বলছি—আমি জানি না। এখান থেকে দশ মাইল দূরে রাস্তার মোড়ে ওদের আমি নামিয়ে দিয়ে আসি। সেখান থেকে অন্য আরেক লোক ওদেরকে তুলে নিয়ে যায়।'

ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। বাড়ির ভেতর থেকে সলোমনের চিৎকার ভেসে এলো, 'নাহিদ—কোথায় তুমি?'

'বাইরে!' জবাব দিলো রানা।

এক মুহূর্ত পর গেটের বাইরে দেখা গেল সলোমনকে। 'কি,

ঘটছে কি এখানে ?'

'ওরা বলছিল কুয়ার ভেতর আমি নাকি খুব আরামে থাকবো, কথাটা সত্যি কিনা দেখার জন্যে ড়ুগানকে পাঠিয়েছি। নিচে তাকে জন হেন্রিক আর রিড কোয়েন অভ্যর্থনা জানাবে।'

টুইডের দিকে এগোলো সলোমন। 'শালা বানচোত!'

উঠনের মেঝেতে ঘষা খেয়ে পিছু হটার চেষ্টা করলো টুইড। 'আমাকে বাঁচাও, মিঃ নাহিদ ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও!' তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

সলোমনের চেহারায় নগ্ন উল্লাস। 'আরে, ভয় পাও কেন!' হাসছে সে। 'তোমাকে তো আমি আদর করবো।' হাঁটু গেড়ে টুইডের পাশে বসলো সে। একটা পা তুলে তার ডান কনুইয়ের ওপর রাখলো, নিশ্চল হয়ে গেল হাতটা। মুঠোর ভেতর তার একটা আঙুল ভরলো সলোমন, তারপর জোরালো এক চাপ দিয়ে আঙুলটা হাতের উল্টোপিঠে ঠেকালো। ছোট্ট একটা মৃদু শব্দ হলো মট্ করে।

ছটফট করতে লাগলো টুইড। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল চেহারা। তার পকেট হাতড়ে যা যা পেলো সব বের করে এদিক ওদিক ছুঁড়ে দিলো সলোমন। শুধু মানিব্যাগটা ফেললো না। খুলে দেখলো ভেতরে ষাট পাউণ্ডের মতো নোট রয়েছে। টাকাগুলো পকেট ভরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'কাজে লাগবে। কি বললো বানচোতটা ?'

'সবাইকে কুয়ায় ফেলা হয়নি। বেশিরভাগ মক্কেলকে বহাল তবিয়তে চলে যেতে দেয়া হয়েছে।'

'কোথায় ?'

'জানে না। দশ মাইল দূরে রাস্তার এক মোড়ে নাকি নামিয়ে দিয়ে আসে। আরেক লোক এসে তুলে নেয় তাদের।'

টুইডের দিকে ফিরে আবার নরম শব্দে হাসলো সলোমন। 'শালা ফাদার-ইন-ল, ভেবেছো ছেলে-ভুলানো কথা বিশ্বাস করবো ? জানো না, না ? কে ওদের তুলে নিয়ে গেল, আড়াল থেকে দেখোনি তুমি ? পিছু নাওনি ? মিথ্যে কথা বললে তোর আমি শালা সব ক'টা আঙুল··· ।'

রানার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো টুইড। 'মেরে ফেলবে, ও আমাকে মেরে-ফেলবে !'

'আমারও তাই ধারণা,' রানা নির্লিপ্ত। 'তোমার জায়গায় আমি হলে গড় গড় করে বলে ফেলতাম সব।'

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা ঝাঁকালো টুইড। তার চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ঠোঁটের কোণে আর চিবুক থেকে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রক্ত মুছলো সে। 'ঠিক আছে, বলছি। মক্কেল-দের আমি দু'বার অনুসরণ করি।'

'কি ঘটলো ?'

'একটা ফার্ণিচার ভ্যান এসে তুলে নেয় ওদের, শ্রুজবারি-র বাইরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয়।'

'তারপর ?'

'রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে থাকে ওরা, প্রতিবার একজনই ওদের নিতে আসে—অন্ধ একটা মেয়েলোক, সাথে গাইড কুকুর থাকে। তার নাম ব্লানশি—রুথ ব্ল্যানশি।

আলমা কটেজে থাকে সে, বাম্পটনে। মেয়েলোকটা আত্মা ডাকতে পারে, ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, আরো কি যেন সব…।'

দম ফুরিয়ে গেছে, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো রোয়েনা, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো সে। 'জো, জো তুমি…তোমাকে ওরা ‥।'

ঘুরলো সলোমন, মেয়েটার দিকে এগোলো। 'বাহ্, বাপ-বেটিতে জোড়া মিলেছিস ভালো। মেয়ে একজনকে আটকে রাখলো, বাপ আরেকজনকে কুয়ায় ফেলতে গেল। আমাকে ছিবড়ে বানিয়ে, তারপর বাপকে গিয়ে ধরতিস, এবার ওকে ফেলে দাও কুয়ায়—তাই না ? বেশ্যা, খানকি, ছিনাল। এরকম ক'জনকে খুন করেছিল, বল্ ?'

সলোমনের অস্থির মাথা আর চোখ জোড়াকে রোয়েনার উদভ্রান্ত দৃষ্টি সারাক্ষণ অনুসরণ করছে। তার দু'গাল বেয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে মাথা নাড়লো সে, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। সলোমনের বুকে হাত তুলে নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করলো। 'আমি জানতাম না, জো। বিশ্বাস করো আমি জানতাম না…।'

খপ্ করে রোয়েনার চুলের গোছা ধরে ফেললো সলোমন, মাথাটা পিছন দিকে নোয়ালো। 'কি ভেবেছিস আমাকে, কচি খোকা ?'

লম্বা তিনটে পা ফেলে কাছে চলে এলো রানা। 'ছাড়ো ওকে।' সলোমনকে ধমক দিলো। 'আসলে সত্যিই কিছু জানে না ও। সন্দেহ করতো, আর সে-কথা আমাকে বলাতেই এ-যাত্রা বেঁচে গেছি।'

ওদের পিছনে সুযোগটা কাজে লাগালো টুইড। পাঁচিলটা এক জায়গায় ভাঙা, ফাঁকটার দিকে ধীরে ধীরে এগোলো সে। কাছা-কাছি পৌঁছে হঠাৎ দৌড় দিলো। হুংকার ছাড়লো সলোমন, পিছু নিলো, কিন্তু খানিক পর ফিরে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। হোফার টুইডকে ধরতে পারেনি সে।

রানার মনে হলো সলোমনের বদলে সে গেলেই ভালো করতো।

বড় উঠনটায় ফিরে এলো ওরা, সলোমনের শার্টের আস্তিন ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো রোয়েনা। 'আমাকে তোমার সাথে নেবে, জো?'

'খুশি হই যদি আমাকে যেন্না করো!' বলে সজোরে রোয়েনাকে ধাক্কা দিলো সলোমন।

মাটিতে পড়ে গেল রোয়েনা, ব্যথাও পেলো, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলো না। প্রায় সাথে সাথে দাঁড়ালো সে, আবার খামচে ধরলো সলোমনের কনুইয়ের ওপরটা। 'কিন্তু আমাকে ফেলে তুমি যাও কিভাবে!' তার চেহারায় আবেদন: 'কি ঘটে গেছে তুমি জানো!'

'মানে? কি বলছে ও?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কি বলছে আমি কি জানি?' অধৈর্য হয়ে উঠলো সলোমন। 'বাড়ি থেকে কিছু খাবার আনি, তারপর আমরা চলে যাবো। বোধহয় ফোর্ডটা নিয়ে গেলেই ভালো হবে।'

'প্লিজ, জো!' সলোমনের পথ আটকালো রোয়েনা।

প্রচণ্ড রাগে হাঁটু ভাঁজ করলো সলোমন, রোয়েনাকে লাথি

মারবে। চোখে করুণ ভাব আর অবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটা, আত্মরক্ষার কথা একবারও ভাবলো না। হিংস্র আক্রোশে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে সলোমনের। লাথিটা ছুঁড়লো সে, সেই সাথে নিতম্বে প্রচণ্ড একটা লাথি খেলো। ছিটকে পড়লো সে, খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে পতনটা ঠেকালো রানা।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছে সলোমন। রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো সে। 'তুমি আমাকে মারলে!'

সলোমনের দিকে নয়, ভুরু কুঁচকে রোয়েনার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে মেয়েটা। ওকে দেখে যে-কোনো মানুষের মায়া হবে। মা মারা যাবার পর অভাগিনী একা আর অসহায় হয়ে পড়েছে। দেখতে কুৎসিত, কেউ ওকে ভালোবাসবে না। অন্তত এখানে, এই পাহাড়ি এলাকায় ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এখানে থাকলে কি পরিণতি হবে জানা কথা। আবার ফিরে আসবে টুইড, অন্তত শুধু রোয়েনার জন্যে হলেও ফিরে আসবে। বুড়ো লম্পটের ভোগের সামগ্রী হবে কচি মেয়েটা। সময় নষ্ট হচ্ছে বলে নিজের ওপর বিরক্ত হলো রানা, কিন্তু মেয়েটার কথা মন থেকে তাড়াতে পারলো না। মানবিক একটা সমস্যা, ওর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওকে সাথে নিলেও ঝামেলা। একটা বোঝা নৈ তো নয়। কে ওর দায়িত্ব নেবে?

এগিয়ে গিয়ে রোয়েনার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। ছুঁতে যা দেরি, রানাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো

ষ্ক্রুটা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'আপনার বন্ধুকে বোঝান, প্লিজ! ওর সাথে আমার···প্লিজ! আপনি আমার ধর্ম-ভাই, আপনার দুটো পায়ে পড়ি··· !'

একটা ঝাঁকি দিলো রানা। 'তুমি গাড়ি চালাতে জানো?'

কান্না ভুলে ঝট্ করে মুখ তুললো রোয়েনা। 'পারি। খুব ভালো পারি।'

'তারমানে?' খেঁকিয়ে উঠলো সলোমন। 'তোমার মতলবটা কি?'

'চিন্তার ব্যাপার আছে এখানে,' বললো রানা। 'পথে কোথাও যদি রোড-ব্লকের সামনে পড়ি আমরা? সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ফোর্ড নিয়ে এক মাইল সামনে থাকতে পারে রোয়েনা, পিছনে আমরা ক্যাটল ট্রাকে থাকলাম, রোড-ব্লক দেখতে পেলে ফিরে এসে ও আমাদেরকে সাবধান করতে পারবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো সলোমন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নিচু করলো। 'সেটা একটা কথা বটে! নাহ্, তোমার বুদ্ধি আছে।' রোয়েনার দিকে ফিরলো সে, নির্লজ্জের মতো হাসলো। 'কি বলেছি ভুলে যাও, ডার্লিং। কিন্তু বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারবে তো?'

বিস্ময় আর সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রোয়েনার চেহারা। 'তোমার জন্যে সব পারবো আমি, জো। একটা সুযোগ দিয়ে দেখো না!' রানার দিকে ফিরলো সে। 'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

একটু আড়ষ্টবোধ করলো রানা। এ-ধরনের সরল প্রশংসা বা স্বীকারোক্তি শুনতে অভ্যস্ত নয় ও।

পাহাড়ী পথ ধরে ট্রাকটা অদৃশ্য হতেই উদয় হলো হোফার টুইড। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পিছন দিক দিয়ে ফার্মহাউসে ঢুকলো সে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠনে এসে দাঁড়ালো, আঙুল ভাঙা হাতটা শরীরের পাশে মরা সাপের মতো ঝুলে আছে। নাকে-মুখে রক্ত, বুকে আর পাঁজরে ব্যথা, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ভাঙা আঙুল, যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখছে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে রান্নাঘরে ঢুকলো, সিঙ্কের ওপর মাথা নিচু করে পানির ট্যাপ ছাড়লো। তারপর যখন সিধে হয়ে তোয়ালের দিকে হাত বাড়াতে যাবে, দেখলো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট পিয়ারসন। 'হ্যালো, মি জনি,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বললো সে, 'আপনি আসবেন আমি আশা করিনি।'

'ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে দেখে যাই সব ঠিকঠাক মতো শেষ হলো কিনা,' পিয়ারসন ওরফে জনি বললো। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তুমি কোন্ যুদ্ধ থেকে ফিরলে? তৃতীয়?'

জোর করে হাসলো টুইড। 'হ্যাঁ, একটু ঝামেলা হয়েছিল।' তার মাথা বিদ্যুৎ বেগে কাজ করছে। 'তবে গোটা ব্যাপারটারই সুন্দর বিহিত করা গেছে। আপনি আমার টাকা এনেছেন তো?'

'বুড়ো খোকা, এরই মধ্যে ওদের তুমি বিদায় করেছ?'

জিজ্ঞেস করলো জনি। 'বলতেই হয়, এক্সপার্ট লোক তুমি। তা, কোথায় তারা?'

'কেন, পিছনের কুয়ায়।'

'একবার দেখতে চাইলে কিছু মনে করবে?'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো টুইড। 'কিছু দেখতে পাবেন বলে মনে হয় না। তবু যখন বলছেন…।' কাঁধ ঝাঁকালো সে। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, লোকটাকে দেখার পর থেকে পায়ে, হাতে, বুকে, পাজরে, কোথাও কোনো ব্যথা অনুভব করছে না সে। শুধু হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে—ভয়ে।

ছোটো উঠনে ঢুকলো ওরা, এখনো ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কুয়ার সামনে দাঁড়াতেই দুর্গন্ধে বমি পেলো জনির। রুমালে নাক-মুখ চেপে কুয়ার ভেতর উঁকি দিলো সে। এতো গভীর, নিচ পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। 'তাহলে ওদের তুমি এটার ভেতর ফেলেছো, কেমন, বুড়ো খোকা?'

'হ্যাঁ, জ্বী,' সবিনয়ে বললো টুইড।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জনি। 'আচ্ছা, তুমি তো জানো, তুমি একটা জঘন্য টাইপের মিথ্যুক—সেজন্যে তোমার নিজের ওপর ঘেন্না হয় না?'

চোখ জোড়া বিস্ফারিত করে টুইড কিছু বলতে গেল, একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো জনি। প্রথম থেকেই মিটিমিটি হাসছে সে, চোখ বাদে হাসিটা এখন সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। 'হেঁটে পাহাড় টপকে এখানে এলাম, বুড়ো খোকা,' বললো সে। 'নাহিদ শাহ আর জো সলোমনকে দেখলাম

তোমার ট্রাক নিয়ে পালাচ্ছে।'

কথাটা সত্যি, মিথ্যে বলছে না জনি। কিন্তু মিনিট কয়েকের জন্যে তার চোখে ফোর্ড গাড়িটা ধরা পড়েনি।

'তোমার না একটা মেয়ে আছে? সে কোথায়?'

ফিসফিস করে টুইড বললো, 'ঠিক জানি না। বোধহয় ভেগেছে।'

'তাই? বেশ, বেশ। তোমার হাত দেখছি খুব পিছলা, কাউকেই ধরে রাখতে পারো না,' ঠোঁট টিপে হাসলো জনি। 'বউ, মেয়ে, একজোড়া শিকার, সব হারিয়ে ফেললে। তা, রুথ ব্ল্যানশির কথা বলেছো ওদের? বলেছো, আলমা কটেজে থাকে সে, বাম্পটনে?' টুইডের চেহারা দেখেই উত্তর পেয়ে গেল জনি। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো সে। 'কাজটা বোকার মতো হয়ে গেল না, বুড়ো খোকা?' তার পকেট থেকে বেরিয়ে এলো ছুরিটা, ভোরের আলোয় ঝিক্ করে উঠলো ছুরির ফলা। ডগাটা টুইডের চিবুকের পাশে নরম মাংস স্পর্শ করলো, তারপর চোখের পলকে জিভ ভেদ করে ঢুকে গেল মগজে।

সাথে সাথে মারা গেল টুইড। এক হাতে তাকে খাড়া করে রেখে, টান দিয়ে ছুরিটা বের করলো জনি, ফলাটা টুইডের জ্যাকেটে ঘষে ঘষে মুছলো। তারপর ধাক্কা দিতেই পাঁচিলের মাথায় পড়লো লাশ, পিছন দিকে ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়ার ভেতর। ঘুরে হাঁটা ধরলো জনি, ভিজে চুল সরালো কপাল থেকে, আপনমনে হাসছে মিটিমিটি।

তিন

সবুজ একটা ট্রায়াম্প স্পিটফায়ার চালাচ্ছে জনি। ষাট মাইল স্পীড। পনেরো মাইল পেরিয়ে এসে ট্রাকটাকে দেখতে পেলো সে, আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটালো সেটাকে। আরো এক মাইল সামনে কালো ফোর্ড গাড়িটাও তার চোখে পড়লো, ড্রাইভিং সীটে বসে আছে রোয়েনা। কিছুই ভাবলো না জনি। টুইডের মেয়েকে কখনো দেখেনি সে, তাছাড়া, পলাতক মক্কেলদের সাথে মেয়েটার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করারও কোনো কারণ নেই তার।

ব্ল্যাকবার্ণ পেরিয়ে এসে, রাস্তার ধারের একটা কাফের সামনে থামলো জনি। সোজা টেলিফোন বক্সে ঢুকে লণ্ডনের ইউনিভার্সাল এয়ারপোর্ট-এর নাম্বারে ডায়াল করলো।

'হ্যালো, সুইটি। ভাবলাম তোমাকে জানানো দরকার কি ঘটেছে।'

'কি ঘটেছে?'

'আর বলো না। আমাদের বন্ধু টুইস্ট নাচতে গিয়েছিল,

আছাড় খেয়েছে।'

'আই সি।'

'প্যাকেট হুটো··· ।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ?'

'ওগুলো বাম্পটনে পৌছুবে।'

'খারাপ কথা। কি করবে বলে ভাবছো?'

'আগে শোনো কি করেছি,' বললো জনি। 'তারপর শোনো কি করবো। এখানকার শাখাটা বন্ধ করে দিয়েছি, বুঝলে? মহামান্য তো সেরকম নির্দেশই দিয়েছিলেন—কেউ ভুল করলে তার সাথে হিশেব চুকিয়ে ফেলো। প্যাকেট হুটো বাম্পটনে পৌঁছুবার আগেই ওখানে আমি পৌঁছে যাবো। ওগুলো রিসিভ করার জন্যে আমার ওখানে থাকা দরকার।'

অপরপ্রান্তের মার্জিত নারী-কণ্ঠ থেকে উত্তর এলো, 'আইডিয়াটা আমার পছন্দ হলো না। আমি বরং তাঁর সাথে পরামর্শ করি। তোমার নম্বরটা দাও, পনেরো মিনিটের মধ্যে রিং করবো।'

ফোন বক্স থেকে বেরিয়ে এসে কাউন্টারের সামনে, একটা টুলে বসে কফির অর্ডার দিলো জনি। যুবতী ওয়েট্রেস কফি দিয়ে যাবার সময় সুদর্শন খদ্দেরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। সুদর্শন এবং সুবেশী জনিকে মেয়েরা দেখলেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে জনি অন্য এক জগতে রয়েছে। মেয়েটা অনুভব করলো, তার শরীর ভেদ করে যুবকের দৃষ্টি বহুদূরে স্থির হয়ে আছে। খানিকটা হতাশ হয়েই নিজের কাজে

ফিরে গেল সে।

কাউন্টারের পিছনের দেয়ালে একটা আয়না, সেদিকে চোখ রেখে সিগারেট ধরালো জনি, কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া। ফার্ম-হাউসের ঘটনা ভুলে গেছে সে, অতীত তার কাছে গুরুত্বহীন। ভাবছে নিকট ভবিষ্যতের কথা। মহামান্য কাউন্ট কি তাকে সুযোগটা দেবেন? হাত দুটো নিশপিশ করে উঠলো তার। দু'চোখে অদ্ভুত এক তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি। কাউন্ট যদি অনুমতি দেন তাহলে জীবনে এই প্রথম একসাথে দু'জনকে খুন করার সুযোগ পাবে সে। দীর্ঘ তালিকায় আরো দুটো নাম যোগ হবে—নাহিদ শাহ, জো সলোমন।

জনি ওরফে রবার্ট পিয়ারসনের বয়স বত্রিশ। তার আট মাস বয়সে বাবাকে ছেড়ে আরেক লোকের সাথে চলে যায় মা। বাবা ছিলেন আর্মি কর্নেল, জনির পাঁচ বছর বয়সে আবার তিনি বিয়ে করেন। জনির এক ভাই হয়, তিন বছর বয়সে এক রহস্যময় দুর্ঘটনায় মারা যায় বাচ্চাটা। দু'ভাই একই ঘরে ঘুমাতো, এক-দিন সকালে উঠে দেখা গেল ছোটো ভাই বিছানায় মরে পড়ে আছে। কর্নেল তার ছোটো ছেলের গলায় কালচে দাগ দেখে-ছিলেন, কিন্তু কথাটা তিনি কাউকে বলেননি। এগারো বছরের জনিকে তিনি ভালো বুঝতে পারতেন না, কিন্তু সৎ মায়ের দিকে ছেলের তাকানোর ভঙ্গিটা তার ভালো লাগতো না। জনি হাসি-খুশি, কেউ তাকে কখনো মনমরা হয়ে থাকতে দেখেনি, কাঁদতেও দেখেনি। কর্নেলের মনে হতো, ছেলেটার মধ্যে আবেগ বা বেদনাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বাপ বলেই তিনি

লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন, ছেলেটা হাসি-খুশি হলেও, তার হাসি কখনোই চোখ স্পর্শ করে না।

সাত-পাঁচ ভেবে জনিকে তিনি বাড়িতে রাখলেন না, ভর্তি করে দিলেন বোর্ডিং স্কুলে। তারপর থেকে এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে, পেয়িং গেস্ট হিসেবে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে, দেশ-বিদেশে এক আর্মি স্টেশন থেকে আরেক আর্মি স্টেশনে অল্প কিছুদিন করে সময় কেটেছে জনির। কোথাও সে বেশিদিন একটানা থাকতে পারেনি। কারণ যেখানেই গেছে সেখানেই রহস্যময় কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বোর্ডিং স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে। ছেলেরা যে যার বাড়িতে চলে যাবে সবাই। দেখা গেল একজন বাদে সব ছাত্রই উঠেছে বাসে। হাডসন নেই কেন? জনি জানালো, তাকে তার বাবা এসে নিয়ে গেছেন। বাস ছেড়ে দিলো। এক হপ্তা পর স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেন একজন অভিভাবক, তার ছেলে হাডসন বাড়ি ফেরেনি কেন? স্কুল কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। খোঁজ খোঁজ। বোর্ডিং স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল, তালা খুলে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল হাডসন বাথরুমে মরে পড়ে আছে। আতংকে এবং খিদেতে মারা গেছে সে, বাইরে থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছিল বাথরুমের দরজা। জনির বাড়িতে পুলিশ এলো, হাসি-খুশি জনি জানালো, হাডসনের কথা বলেনি সে, বলেছিল নেলসনের কথা—শুনতে ভুল করেছে কেউ। তখন মাত্র বারো বছর বয়স জনির, স্কুল কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামালো না। ভুল বোঝাবুঝি এবং

দুর্ঘটনা বলেই মেনে নিলো সবাই।

আরেক স্কুলের ঘটনা। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা দিচ্ছে ছাত্ররা। এক ছাত্রের মাথার ওপর দিয়ে এসিড ভরা বোতল আনতে গিয়ে কেমন করে জানি সেটা হাত থেকে পড়ে যায়। ছেলেটার শুধু মাথা আর মুখ পোড়েনি, চিরকালের জন্যে অন্ধ হয়ে যায় সে।

পেয়িং গেস্ট হিসেবে প্রথম যে বাড়িতে ছিলো জনি সেখানে কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছিলো না। ছিলো এক পাল কুকুর-বিড়াল। রহস্যময় দুর্ঘটনায় একের পর এক তিনটে বিড়াল আর একটা কুকুর মারা যাওয়ায় বাড়ির লোকজন জনিকে বিদায় করে দেয়।

এরকম আরো অনেক ঘটনার জন্ম দিতে দিতে এক সময় লেখাপড়া শেষ করে আর্মিতে ভর্তি হলো জনি। ট্রেনিং পিরিয়ডে তার খুব সুনাম হয়। অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে, অথচ মুখের মিটিমিটি হাসিটা কখনো ম্লান হয় না। একটাই দোষ, আন-আর্মড কমব্যাট প্র্যাকটিস করার সময় প্রতিপক্ষকে এমন মার মারে যে প্রতিবার দু'একজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয় জনি, লেবাননে পাঠানো হয় তাকে। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে দু'জন শিয়া মুসলমানকে খুন করে ফেলে সে। সামরিক আদালতে বিচার হয় তার। কিন্তু বিচারক তার হাসি-খুশি চেহারা আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আচরণ দেখে বিভ্রান্ত হন, সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় জনি।

এরপর মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে বদলি হয় সে। স্পাই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন একজন ইহুদিকে ইন্টারোগেট করার দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। বদ্ধ ঘরের ভেতর তিন ঘণ্টা ছিলো ওরা, জনি বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল লোকটা মারা গেছে। কোনো রকম কেলেংকারি সৃষ্টি না করে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় জনিকে। আর্মির ডাক্তারদের পরামর্শে তার বাবা তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করেন, সেখানে সাইকিয়াট্রিস্টরা তাকে পরীক্ষা করে। দু'হপ্তা পর ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে চলে যায় জনি। সাইকিয়াট্রিস্টরা একবাক্যে রায় দেয়, রবার্ট পিয়ারসন মানসিকভাবে অসুস্থ—একটা সাইকোপ্যাথ। তার মধ্যে মানবিক কোনো ভাবাবেগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

মানুষ খুন করতে একটুও বাধে না জনির। খুন করা তার নেশা। এ-ধরনের একটা চরিত্র শয়তানরূপী কাউন্টের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কি।

বক্সের ভেতর ফোন বাজলো। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রিসিভার তুললো জনি। 'হ্যালো, সুইটি, শোনাও তোমার সুখবর।'

'বাম্পটনে যেতে পারো তুমি, কিন্তু ওখানে গিয়ে বলতে হবে প্যাকেট দুটো যেন গ্রস্টার-এ আমাদের কন্ট্যাক্টের হাতে পৌঁছায়। গ্রস্টার কন্ট্যাক্টের সাথে ফোনে যোগাযোগ করো, কি পেতে যাচ্ছে বলে দাও তাকে।'

'ফুল ট্রিটমেন্ট ?'

'অবশ্যই। আর জনি, একান্ত জরুরী অবস্থা না হলে মহামান্য চান না ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়ো তুমি। সে-রকম গুরু-

তর পরিস্থিতি দেখা দিলে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তুমি, কিন্তু আপাততঃ তোমার কাজ হবে গোটা ব্যাপারটার ওপর সতর্ক নজর রাখা, এবং রিপোর্ট পাঠানো।'

মুহূর্তের জন্যে চেহারা কালো হয়ে গেল জনির। 'ঠিক আছে, সুইটি।' তারপরই আবার তার মুখে ফিরে এলো হাসিটা।

স্পীডোমিটারের কাঁটাটাকে কোনোমতেই পঁয়ত্রিশের ওপর ওঠানো গেল না। প্রায় সাড়ে তিনটের সময় সামনে বাস্পটন দেখতে পেলো ওরা। সলোমনের কাঁধে টোকা দিলো রানা, ইঙ্গিতে দেখালো ফোর্ডের পাশে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজছে রোয়েনা। রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়, মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গা, গাড়িটাকে সেখানে দাঁড় করিয়েছে সে। ফোর্ডের পাশে থামলো ট্রাক। বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে ভিজছে রোয়েনা, তবু দু'গালের রাঙা ভাবটুকু ম্লান হয়নি। ভারি খুশি আর উত্তেজিত মনে হলো তাকে। ভেজা কাপড় গায়ের সাথে সেঁটে আছে, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সলোমন। একমুহূর্ত রানাও চোখ ফেরাতে পারলো না।

ক্যাব থেকে সুড়সুড় করে নেমে এলো সলোমন। রোয়েনার সামনে দাঁড়িয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করলো। 'কি রকম লাগলো?'

'চমৎকার,' বললো রোয়েনা। সলোমনের দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের ভিজে কাপড়ের দিকে চট করে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তারপর হাত দুটো ভাঁজ করলো বুকের ওপর। 'কোনো

অসুবিধে হয়নি।'

ট্রাক থেকে নেমে হেঁটে আসছে রানা। ওর দিকে ঘাড় ফেরালো সলোমন। 'ঠিকানাটা কি যেন?'

'আলমা কটেজ।'

'কোথায় সেটা?'

'কোথায় কে জানে। খুঁজে বের করতে হবে। রোয়েনা বরং এক চক্কর ঘুরে আসুক। কোন্ বাড়িটা জানার পর যাবো আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সলোমন, পকেট থেকে টুইডের মানিব্যাগ বের করে রোয়েনার হাতে পাঁচটা পাউণ্ড গুঁজে দিলো। 'তোমার পেট্রল শেষ হয়ে এসেছে। আসার সময় খবরের কাগজ আর সিগারেটও নিয়ে এসো।'

ফোর্ড নিয়ে চলে গেল রোয়েনা। ট্রাকের ক্যাবে উঠে পড়লো ওরা দু'জন।

'ভাগ্য ভালো যে এখন পর্যন্ত কোনো রোড-ব্লকের সামনে পড়তে হয়নি,' বললো সলোমন।

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'ক্রাইডেথর্প থেকে দুশো মাইল দূরে চলে এসেছি। এখুনি ওরা এতো দূরে খুঁজবে না।'

'তাহলে এই লক্কড়মার্কা ট্রাক বাদ দিলেই হয়। মেয়েটাকে ভাগিয়ে দিই, তারপর ফোর্ডটা ব্যবহার করি।'

রাগ সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। 'মেয়েটাকে এখনো আমাদের দরকার। ভেবেছো খবরের কাগজে ওরা তোমার ছবি ছাপেনি? লোকজনের সামনে পড়লেই ধরা খেয়ে যাবে।'

অসন্তুষ্ট হলো সলোমন। তবে যুক্তিটা খণ্ডাতে পারলো না। 'বোধহয় তোমার কথাই ঠিক।'

সিটে হেলান দিলো রানা, পা দুটো যথাসম্ভব লম্বা করে দিয়ে শেষ সিগারেটটা ধরালো। মাথার ভেতর অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এ পর্যন্ত বেশ ভালোই এগিয়েছে সে। ডাকাতি করে জেলে গেছে, জেলখানা থেকে সলোমনের সাথে হাসপাতালে গেছে, হাসপাতাল থেকে পালাতেও কোনো অসুবিধে হয়নি। সলোমনের টাকার হদিশ জেনে নিয়ে বিদায় নিলো জনি, রোয়েনা ওদেরকে নিয়ে গেল ফার্মহাউসে। ফার্মহাউসে গিয়ে জানা গেল হোফার টুইড একটা খুনী, জেলখানা থেকে কয়েদীদের বের করে এনে কাউন্ট তাদের মেরে ফেলে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বদরুল হাসান ফার্মহাউস থেকে নিরাপদে চলে যেতে পেরেছে। তাকে খুন করার নির্দেশ হোফার টুইড পায়নি। কারণটা কি?

বদরুল হাসান রিপ হুটন নয়, সে ছদ্মবেশী একজন বাঙালী, ব্যাপারটা ফাঁস হতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। তারপরও তাকে মেরে না ফেলার কি কারণ? মেরে ফেলাই যখন এদের রীতি?

কেন ভাবছে সে যে হাসান বেঁচে আছে? এমনও তো হতে পারে কাউন্টের পরবর্তী স্টেশনে সারা হয়েছে কাজটা!

হাসান প্রসঙ্গ ভুলে থাকার চেষ্টা করলো রানা।

হোফার টুইড কাউন্টের সাথে বেঈমানী করায় ওদের খুব সুবিধে হয়ে গেছে। টুইডের কাছ থেকে বাস্পটনের ঠিকানাটা না

পেলে গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে যেতো। ডাকাতি করে জেল খাটা, শান দেয়ার মেশিনে হাত ছ'্যাঁক করা, ঝুঁকি নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালানো, সবই বিফলে যেতো। হাসানের খোঁজ না পেয়েই, কাউন্টের পরিচয় না জেনেই, লণ্ডনে ফিরে যেতে হতো ওকে।

তবে এরপর কি ঘটবে তার ওপর নির্ভর করছে সাফল্য। অন্ধ একজন মহিলা, রুথ ব্র্যানশি, কতোটুকু কি জানে সে?

বৃষ্টি কমেছে, রাস্তা থেকে নেমে এলো ফোর্ড। দেখেই ট্রাকের ক্যাব থেকে নেমে পড়লো সলোমন। ছুটে এলো রোয়েনা, বুকের সাথে চেপে ধরে আছে এক কার্টন সিগারেট, আর খবরের কাগজ। ট্রাকের ক্যাবে উঠলো সে, সলোমন আরেক পাশে বসলো।

'আলমা কটেজ শহরের এদিকটায়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রোয়েনা, আনন্দ আর উত্তেজনায় ছটফট করছে। 'বাড়িটার সামনে দিয়ে এই মাত্র গাড়ি চালিয়ে এলাম। মেইন রোডের ডান দিকে একটা গলি আছে, বাঁক থেকে দুশো গজের মতো লম্বা। গলির মাঝামাঝি জায়গায় বাড়িটা। দেখতে যা সুন্দর না!'

খবরের কাগজের ভাঁজ খুললো সলোমন, অমনি তার দিকে লাফ দিয়ে উঠলো মুখটা। ছবিটা জেলখানায় থাকতে তোলা নয়, অনেক আগের, সুটেড-বুটেড অবস্থায় কোর্টরুমে ঢুকতে যাবার আগের মুহূর্তে তোলা হয়েছিল। ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার উদ্দেশে সহাস্যে হাত নাড়ছে সলোমন।

'পোজটা মন্দ নয়, কি বলো ?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন, কণ্ঠস্বরে গর্বের ভাবটুকু গোপন থাকলো না। 'আবার আমি ব্যাটাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি, হাঃ-হা !'

রানার সামনে সলোমন যেন হঠাৎ করে নিজের মুখোশ খুলে ফেললো। অপরাধের প্রতি দুর্বার ঝোঁক, ভয়ানক একটা কিছু ঘটিয়ে বসে নিজের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাকুল ইচ্ছে, এ-সবের ভেতরই লুকিয়ে থাকে আত্মধ্বংসের বীজ। কিন্তু রানা কিছু বললো না। সলোমনের ছবির নিচে ওরও একটা ছবি ছাপা হয়েছে, তবে একেবারে ছোটো, প্রায় স্ট্যাম্প সাইজ।

সলোমন দুঃখ করলো, 'তোমার কথা ওরা যেন ভুলেই গিয়েছিল। ছবিটায় এমনকি তোমার চেহারাও আসেনি।'

'সেজন্যে আমি খুশি,' বললো রানা। 'লোকে দেখলেও আমাকে সহজে চিনতে পারবে না। আরো খুশি হতাম কিছুই যদি ছাপা না হতো।'

'পাগল নাকি !' নির্ভেজাল বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সলোমন। 'পুলিশকে ঘোল খাওয়াবো, অথচ মানুষ জানবে না, তা কি হয় ? নিজেকে এতো ছোটো ভেবো না তো। কতো আয়োজন, কতো কষ্ট, তারপর না জেল থেকে পালাতে পেরেছি ? এরকম বাহাদুরি ক'জন দেখাতে পারে !'

রানা চুপ করে থাকলো।

'ও, বুঝেছি, ওখানে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছো।' কাগজটা ভাঁজ করে পায়ের কাছে ফেলে দিলো সলোমন। 'চলো, খাওয়া যাক।'

'ওখানে বিপদ হতে পারে, বলা যায় না। দু'জনের যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'খাঁটি কথা,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে রোয়েনার কাঁধে ভারি একটা হাত রাখলো সলোমন। 'আমি বরং থেকে যাই, মেয়েটাকে পাহারা দেবো।'

ক্যাব থেকে সবাই নামলো ওরা। রানা বললো, 'এক ঘণ্টার মধ্যে যদি না ফিরি, তুমি যাবে।'

'তখনো যদি এখানে আমি থাকি,' ঠাট্টা করলো সলোমন, নাকি ব্যঙ্গ, ঠিক বোঝা গেল না।

'কথাটা যখন মনে করিয়ে দিলে,' বললো রানা, 'সম্পদের একটা ভাগ দিয়ে দাও আমাকে। ফিরে এসে তোমাকে যদি না পাই, নিজের পথ নিজে দেখে নেবো।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করলো সলোমন, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে পকেট থেকে টুইডের মানিব্যাগটা বের করলো। 'কোনো আপত্তি নেই।' গুণে পঁচিশ পাউণ্ড, আর কিছু খুচরো পয়সা রানার হাতে তুলে দিলো সে। 'কিন্তু এখন আমি জানবো কিভাবে যে তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে না?'

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রানা। হন হন করে হাঁটতে শুরু করে বললো, 'জানার কোনো উপায় নেই।'

মেয়েটার দিকে তাকালো সলোমন। চোখে লজ্জা নিয়ে তাকালো রোয়েনা, ভিজে চকচক করছে মুখ। তার কোমর জড়িয়ে ধরে, কাপড়ের ওপর দিয়ে পাঁজরের নিচের মাংসে মৃদু চাপ দিলো সলোমন। চোখ নামিয়ে নিলো রোয়েনা।

'এসো, সোনা-মণিক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। ট্রাকের পিছনে, কেমন? একটু বিশ্রাম নিই?'

'তুমি যা বলো, জো,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আগে আগে হাঁটলো রোয়েনা।

ট্রাকের পিছনে ওঠার সময় ট্রাউজারের বোতাম খুললো সলোমন। উত্তেজনায় হাত দুটো কাঁপছে।

চার

গলির কিনারা থেকে বেশ খানিকটা পিছনে বাড়িটা। খয়েরি পাথরে তৈরি, অর্ধেকটাই ঢাকা পড়ে আছে আইভি লতায়। সরু, লম্বা বাগান বৃষ্টিতে ভিজছে, ফুল বলতে সময়ের আগে ফোটা কিছু ড্যাফোডিল। পোর্চে উঠে ছোট্ট একটা নেমপ্লেট পড়লো রানা: রুথ ব্ল্যানশি—শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে দেখা হবে।

দরজায় নক করলো রানা। ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এলো—কেউ যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে হাঁটছে। চাপা একটা গোঙানির আওয়াজও পাওয়া গেল। তারপর নিস্তব্ধতা। খানিক পর মেঝেতে ছড়ি ঠোকার আওয়াজ হলো, এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। কবাট খুলে গেল। দোরগোড়ায় বুড়ি এক মহিলা।

কম করেও আশি বছর বয়স হবে, হলুদ ফুলের শুকিয়ে যাওয়া পাপড়ির মতো মুখ, মাথার পিছনে খোঁপা করা সোনালি চুল। স্কার্টের সাথে টুইডের স্যুট পরে আছে বৃদ্ধা, গোড়ালি ছুঁই ছুঁই করছে স্কার্ট। বাঁ হাতে ছড়ি, ডান হাতে কুকুরের কলার।

জীবনে এতো সুন্দর ডোবারম্যান দেখেনি রানা। কালো।

ওটার গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এলো, যেন দূরে কোথাও গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে। কলার ধরা হাতটা ঝাঁকি দিলো বৃদ্ধা। 'শান্ত হও, টিম। হ্যাঁ, বলুন কে?'

কথার সুরে মৃদু অস্ট্রিয়ান টান লক্ষ্য করলো রানা। কলার ধরে ঝাঁকি দেয়ার সময় সামনের দিকে একটু এগিয়ে আসায় ঝাপসা, ধোঁয়াটে চোখ দুটো পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা।

'এলাম, ভাবলাম আপনি যদি খানিকটা সময় দেন আমাকে,' বললো রানা।

'আপনি আমার পরামর্শ চান—প্রকেশনালি?'

'হ্যাঁ, জী।'

'কিন্তু আমি শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলেই মক্কেলদের সাথে কথা বলি। খুব সতর্ক থাকতে হয়। এ-সব ব্যাপারে আইনের খুব কড়াকড়ি।'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কিনা,' বললো রানা। 'আবার কবে আসা হবে ঠিক নেই। সত্যিই খুব উপকার হতো। আপনার অনেক প্রশংসা শুনে ভাবলাম…'

'আই সি!' বৃদ্ধা ইতস্তত করতে লাগলো। 'আপনার নাম?'

'নামের কোনো গুরুত্ব নেই,' বললো রানা। 'গুরুত্ব যদি থাকে তো সেটা গন্তব্যের।'

'কোথায় সেটা?'

'ব্যাবিলন।'

স্থির পাথর হয়ে গেল বৃদ্ধা, তারপর সামান্য একটু পিছিয়ে

গেল সে। 'তুমি বরং ভেতরে এসো, ইয়ংম্যান।'

দেয়ালে ওক কাঠের চকচকে প্যানেল, বিশাল আয়নার পাশে টেবিলের ওপর চীনামাটির টবে রঙচঙে ফুল ফুটে আছে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে কুকুরের কলারটা ছেড়ে দিলো বৃদ্ধা, রানার পাশে চলে এলো ডোবারম্যান।

'এদিকে।' হলরুমের আরেক দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো বৃদ্ধা, মনেই হয় না অন্ধ।

দেখেই বোঝা যায় কামরাটা লাইব্রেরী, তিন দিকের দেয়ালে অনেকগুলো বুক-শেলফ ভর্তি বই আর বই। একধারে ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে। জানালার কাঁচ ভেদ করে বাইরে চলে গেল রানার দৃষ্টি। বৃষ্টি ভেজা গাছপালার ওপাশে আঁকা-বাঁকা নদী বয়ে যাচ্ছে।

ছোটো একটা গোল টেবিলের পিছনে, চেয়ারে বসলো বৃদ্ধা, হাত তুলে সামনের একটা চেয়ার দেখালো। রানা বসতেই কুকুরটাও নিচু হলো, স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে।

'কে তুমি, ইয়ংম্যান?' রুথ র‍্যানশি জিজ্ঞেস করলো।

'তাতে কি কিছু এসে যায়?'

'হয়তো যায় না,' কাঁধ ঝাঁকালো বৃদ্ধা। 'দেখি, তোমার হাতটা দাও আমাকে।'

মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে পড়লো রানা। 'জানতে পারি কেন?'

'আমার জন্যে ব্যাপারটা জরুরী। তুমি নিশ্চয়ই জানো মানুষের নিয়তি বলে দিতে পারি আমি? ভবিষ্যৎ দেখতে পাই?'

রানার হাত ধরলো বৃদ্ধা, ধরে রাখলো হালকাভাবে। বৃদ্ধার হাত ঠাণ্ডা, মসৃণ, কোনো কারণ ছাড়াই দাদী-মা, মখমল, গোলাপ-জল, আর আগরবাতির কথা মনে পড়ে গেল রানার। তারপর হঠাৎ শক্ত চাপ অনুভব করলো হাতে। অনেকটা যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়ে চমকে গেল ও। লক্ষ্য করলো, বৃদ্ধার চোখ জোড়া আচমকা বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। তারপর, আগাম কিছু বুঝতে না দিয়ে, খালি হাতটা তুলে রানার মুখ স্পর্শ করলো। আঙুলগুলো আলতো স্পর্শে ঘুরে বেড়ালো সারা মুখে।

'খারাপ কিছু নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো বৃদ্ধা, পাকা ভুরু জোড়া এখনো কুঁচকে আছে। 'অন্য রকম আশা করেছিলাম, এই আর কি।' এক মুহূর্ত পর হাতটা ছেড়ে দিলো সে। 'তোমাকে এখানে পাঠালো কে?'

'তাতে কিছু এসে যায়?'

'না, পাসওয়ার্ড তো বলেছোই—কিন্তু তোমাকে আমি আশা করিনি।'

'তারমানে কি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না?'

হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো রুথ ব্ল্যানশি। 'তোমাকে পরবর্তী স্টেশনে পাঠাবার কোনো আয়োজন করা হয়নি। যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা নেই।'

'আমার সাথে গাড়ি আছে।'

'ও—তুমি একা?'

ইতস্তত করলো রানা। 'হ্যাঁ।'

ধোঁয়াটে, ঝাপসা চোখ জোড়া যেন রানার অন্তর ভেদ করে

গেল। সাথে সাথে টের পেলো ও, মিথ্যে বলে ধরা পড়ে গেছে।

'তাহলে সাহায্য করতে পারবেন আপনি ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে হয় পারবো। অন্তত বলে দিতে পারবো কোথায় তুমি যাবে। তবে তাতে তুমি যা খুঁজছো তা পাবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার—আরেক প্রসঙ্গ।'

রানার মনে হলো, বৃদ্ধা তাকে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করলো। মৃদু হাসলো ও, বললো, 'ঝুঁকি যদি থাকেও, সেটা আমাকে নিতে হবে।'

'তাহলে পিছনের ডেস্কে যাও, ডান দিকের ওপরের দেরাজটা খোলো। অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড পাবে, একই রকম সব, একটা তুলে নাও। তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, ভিজিটিং কার্ডে কি লেখা আছে আমি জানি না, জানতে চাইও না।'

রানা দাঁড়াতেই অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠলো ডোবারম্যান। গ্রাহ্য না করে ডেস্কের পিছনে এসে দাঁড়ালো ও। দেরাজ খুলে ভেতর থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করলো। কার্ডের চারদিকে কালো একটা বর্ডার। লেখাগুলো মাঝখানে। লং ব্যারো ক্রেম্যাটরিয়াম অ্যাণ্ড হাউস অভ রেস্ট—এড নিকলস—ডাইরেক্টর। ফোন : ফেঞ্চ টু থ্রি নাইন।

'এবার তুমি চলে যাও, ইয়ংম্যান।'

মুখ তুলে তাকালো রানা, ভুরু কোঁচকালো, দু'আঙুলে ধরা রয়েছে ভিজিটিং কার্ডটা। বিপজ্জনক কিংবা অশুভ, কিছু একটা আছে এখানে। আড়ষ্ট বোধ করলো রানা। পরিবেশটা অস্বস্তিকর। ও এক চুল নড়েনি, অথচ কুকুরটা সিধে হয়ে চাপা আও-

য়াজ করলো গলার ভেতর। সাবধানে এক পা পিছু হটলো রানা। খুনী কুকুর, বুঝে ফেলেছে ও। একবার যদি হামলা করে, থামাতে হলে মেশিনগান লাগবে। যার নাম ডোবারম্যান পিনশার।

'তোমাকে আমি চলে যেতে বলেছি, ইয়ংম্যান,' আবার বললো রুথ ব্ল্যানশি। 'টিম তোমাকে পথ দেখাবে।'

যেন বৃদ্ধার সব কথাই বুঝতে পারে, সাথে সাথে দরজার দিকে এগোলো কুকুরটা। তাকে অনুসরণ করে রানা বললো, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যাডাম ব্ল্যানশি। আপনি সত্যি আমার খুব উপকার করলেন।'

'সেটা এখনো দেখতে বাকি আছে, ইয়ংম্যান,' শান্ত গলায় বললো বৃদ্ধা। 'এবার যাও।'

৭

পাবলিক টেলিফোন বক্সটা গলির মাথায়, চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো রানা। রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার নম্বরে ডায়াল করলো ও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইন পাওয়া গেল। নতুন অফিস ইনচার্জ মৃণাল সেন রিসিভার তুললো, অপারেশনাল চীফ সোহানা চৌধুরীকে চাইলো রানা।

'মাসুদ ভাই, আপনি!' সবিস্ময়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো মৃণাল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বললো, 'জলদি, মৃণাল, সোহানাকে দাও।'

'দিচ্ছি, মাসুদ ভাই...।'

খট করে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হলো, তারপরই শোনা গেল

সোহানার জলতরঙ্গ কণ্ঠস্বর, 'খোদার কাছে হাজারো শোকর। কেমন আছো তুমি, রানা?' রীতিমতো হাঁপাচ্ছে ও।

'কবে আমি খারাপ ছিলাম? শ্রুজবারি থেকে বলছি, হাতে সময় কম। ফেন্স—নাম শুনেছো জায়গাটার?'

'না। একটু ধরো, দেখে বলছি।' দেড় মিনিটের মাথায় আবার লাইনে ফিরে এলো সোহানা। 'গ্লস্টারের ঠিক বাইরে।'

'ওখানেই এখন যাচ্ছি আমরা। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো চলছে। শোনো, মিঃ ম্যানফ্রেডকে বলে আজই বি. এস. এস. হেডকোয়ার্টার আর আমাদের অফিসের সাথে একটা হটলাইনের ব্যবস্থা করো, স্ট্র্যাম্বলার সহ। যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর সাহায্য দরকার হতে পারে আমার, কিন্তু ওদের ওখানে আমি ফোন করবো না—ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে ডাবল এজেন্ট না থাকাটাই আশ্চর্য। তাঁকে বলবে, এরপর যখন ফোন করবো, আমার হাতে সম্ভবত দু'চার সেকেণ্ডের বেশি সময় থাকবে না, এবং সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে।' রানা জানে, নোট নিচ্ছে সোহানা।

'ঠিক আছে,' বললো সোহানা। 'আর কিছু?'

'না।'

'রানা, হাসান কি...?'

'এখনো জানি না,' বললো রানা।

'কাউন্টের...?'

'এখনো জানি না। ছাড়ছি।'

মৃদু, কোমল একটা শব্দ হলো। চুমোর আওয়াজ। 'ভালো

থেকো।'

'কবে ছিলাম না? এই, বুধবার সন্ধ্যের সময় তৈরি থেকো, তোমাকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাবো।'

'কি!'

'আমি কখনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি?' রিসিভার নামিয়ে রেখে ফোন বক্স থেকে বেরিয়ে এলো রানা। আবার ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নাকে হাত চাপা দিয়ে বিকট শব্দে হ্যাঁচ্চো করলো ও। গাড়ি দুটোর কাছে পৌঁছে দেখলো, ভ্যানে বসে আছে রোয়েনা, ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাতের ভেতর সিগারেট নিয়ে টানছে সলোমন। রানাকে দেখে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলো সে। 'কি হলো?'

'বিশেষ কিছু না। বুড়ি শুধু এই কার্ডটা দিলো।'

কার্ডটা পড়ে মুখ তুললো সলোমন। 'এর মধ্যে বুড়ির কোনো চাতুরি নেই তো?'

'কি করে বলি!'

'তাহলে আমরা বিপদে পড়তে পারি।'

'পারি।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো সলোমন, চিন্তিত। 'তবে, ওরা অন্তত পুলিশ ডাকবে না।'

'তা ডাকবে না,' বললো রানা। 'এটা ওদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধ।'

ফোর্ডের ড্যাশবোর্ডে পুরনো একটা এ. এ. বুক পাওয়া গেল, খসখস করে সেটার পাতা ওল্টালো সলোমন। 'গ্লস্টারের ঠিক

বাইরেই ফেন্স,' ঘোষণা করলো সে। 'এই ধরো, পঁচাত্তর মাইল। ফোর্ডে করে গেলে ঘণ্টা দুই লাগবে।'

'আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম,' বললো রানা। জঙ্গলের দিকে তাকালো ও। 'ভেতরে কোথাও ট্রাকটাকে রেখে আসলে এই আবহাওয়ায় সহজে কারো চোখে পড়বে না।'

'চমৎকার,' ঘাড় কাত করলো সলোমন। 'আমিই রেখে আসছি,' গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ট্রাকের দিকে চলে গেল সে।

হুইলের পিছনে বসলো রানা। 'সলোমন খুব ফুর্তিতে আছে, ব্যাপারটা কি?'

চোখ নামিয়ে নিলো রোয়েনা। তার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। রানার মনে হলো, আরে, দেখতে ততো খারাপ নয় তো! তারপরই মনে পড়লো—লাভ মেক্স্ ইভেন অ্যান আগলি উওম্যান লাভলি...।

সর্বনাশ, হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠলো রানা। এ যে দেখছি গোদের ওপর বিষফোঁড়া! এমনিতেই মাথার ওপর ঘোরতর বিপদ, তার ওপর রোয়েনা আর সলোমনের সম্পর্ক জটিল হতে চলেছে। কি যে আছে কপালে!

রানার পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই কবাটের মতো খুলে গেল একটা বুক-শেলফ, ভেতর থেকে মিটিমিটি হাসি নিয়ে বেরিয়ে এলো জনি। টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো সে। 'বুড়ি খুকি, তোমাকে ধন্যবাদ,' বললো সে। 'গোটা ব্যাপারটা

বেশ সুন্দরভাবে সামলেছো।'

'সুন্দর কিনা সেটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।'

'বললো সাথে কেউ নেই, তারমানে মিথ্যে কথা বলে গেল। আমার ধারণা গলির মাথায় অপেক্ষা করছে সলোমন। তোমার ফোনটা ব্যবহার করলে কিছু মনে করবে?'

'আমাকে তুমি ব্যবহার করেছো। ফোন ব্যবহার করতে বাধা দিই কিভাবে?'

'পেট কেঁপেছে? নাকি বড় বেশি উকুন? কথায় এতো ঝাঝ কেন, বুড়ি খুকি?' একটা নম্বরে ডায়াল করলো জনি, অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পেয়ে বললো, 'এড নিকলস? প্যাকেট ছুটো পথে রয়েছে। হ্যাঁ, ফুল ট্রিটমেন্ট। পরে আমি তোমার সাথে দেখা করবো।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো সে, দস্তানা জোড়া পরলো। 'এবার আমাকে কেটে পড়তে হয়, বুড়ি খুকি। আসবো, আবার আমি আসবো।'

গাঢ় একটা ছায়ার মতো জনিকে পাশ কাটিয়ে এগোলো ডোবারম্যান, রুগ্ন ব্র্যানশির হাত শুঁকলো। 'আমার তা মনে হয় না,' হঠাৎ বললো বৃদ্ধা।

'মানে?' জনি হাসছে।

'মানে তুমি আর আমার কাছে আসবে না।'

'বুড়ি খুকি, নিজের পায়ে কুড়োল মারতে চাও? সেই উনিশ শো ছেচল্লিশ থেকে জাল পাসপোর্ট আর ভুয়া কাগজ-পত্র নিয়ে এখানে কারবার করছো। পুলিশে একটা খবর দিলে...।'

'তুমি ভুল বুঝছো,' বললো বৃদ্ধা। 'হঠাৎ করে আমি দুঃসাহসী

হয়ে উঠেছি, ব্যাপারটা তা নয়। তোমাকে অগ্রাহ্য করার জন্যে যে শক্তির দরকার এই বয়সে আমার তা নেই। প্রথমে নাৎসীরা আমাকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু সে-কথা কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। এখন তোমরা আমাকে ব্যবহার করছো, কিন্তু আমি অসহায়। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম, আমার সাথে দেখা করা তোমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।'

জনি কৌতূহল প্রকাশ করলো, 'জানতে পারি, কেন?'

'কারণ তুমি মারা যাবে।'

বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে থাকলো জনি, হাসিটা ঝুলে আছে ঠোঁটে। 'তামাশা করছো, বুড়ি খুকি?'

'তুমি জানো করছি না। আমার মধ্যে সাইকিক পাওয়ার আছে। ভবিষ্যতের ঘটনা বলে দিতে পারি। মৃত্যু তোমাকে চিহ্নিত করেছে। পরিষ্কার অনুভব করছি আমি।'

অবাক ব্যাপার, কেন যেন কথাগুলো জনি হেসে উড়িয়ে দিতে পারলো না।

জনি যে কথাগুলো বিশ্বাস করেছে, হঠাৎ করে তা বুঝে ফেলে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলো রুথ ব্র্যানশি।

'তুমি অমঙ্গলের প্রতীক, বুড়ি খুকি,' বললো জনি, তার হাতে বেরিয়ে এলো ছুরিটা, আলো লেগে ঝিক্ করে উঠলো ফলা। 'আমার আগে তোমাকে যদি যমের বাড়ি পাঠাই, তাহলে?'

মনে হলো দূরে কোথাও গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে, আসলে আওয়াজটা বেরিয়ে এলো ডোবারম্যানের গলা থেকে। কুকুরটার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। আলতো করে সেটার গায়ে হাত

বুলালো বৃদ্ধা। 'সম্ভব নয়। তার আগে টিম তোমাকে খুন করবে।'

'সেই সাথে প্রমাণ হয়ে যাবে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ছিলো? বুড়ি খুকি, জানতে ইচ্ছে করে, কুকুরটা কি শুধু তোমার প্রটেকশনের জন্যে, নাকি আরো কাজ-কাম উদ্ধার হয়?' অশ্লীল শব্দে হাসলো সে, ছুরিটা চালান করে দিলো পকেটে। 'না, ব্র্যানশি, হাজার হোক তুমি পুরনো পাপী, তোমার প্রাপ্য চোখ-ঝলসানো মৃত্যু। আর আমার মৃত্যুর কথা যদি বলো, তাকে আমি খুঁজতে যাবো কোন্ দুঃখে? আগেও আমাদের দেখা হয়েছে। আমার মুখ তার চেনা।'

শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল জনি, তার পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

পাঁচ

সেলুনে যেমন চুল ছাঁটা হয়, ক্রেম্যাটরিয়ামে তেমনি লাশ পোড়ানো হয়। পোড়াবার আগে এমবামিং রুমে রাখা হয় লাশ। ওখানে প্রাণহীন দেহের যত্ন নেয়া হয়। সুগন্ধী মাখানো থেকে শুরু করে মৃতদেহের ভেতর থেকে নানা অঙ্গ-প্রতঙ্গ বের করা পর্যন্ত সবই এই-যত্নের আওতায় পড়ে।

চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। এমবামিং রুমে একা কাজ করছে এড নিকলস, তার রাবার অ্যাপ্রনে রক্ত লেপ্টে রয়েছে। নিজের হাতে এ-ধরনের কাজ না করলেও চলে তার, কিন্তু কাজ-পাগল লোক সে, আর তাছাড়া এ-ধরনের একটা কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারার মধ্যে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি আছে।

এই মুহূর্তে যুবতী এবং কুমারী একটা মেয়ের লাশ নিয়ে কাজ করছে এড নিকলস। লাশের ভিসেরা বের করছে সে। এই কাজে সবাই রাবার গ্লাভ পরে, সেটাই নিয়ম, কিন্তু নিকলস জিনিসটা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। নগ্ন হাত দিয়ে

মানুষের নাড়িভুঁড়ি, ফুসফুস-হৃৎপিণ্ড, ইত্যাদি ছুঁতে পারার মধ্যে আলাদা মজা আছে।

অ্যাবডোমেন থেকে সমস্ত কিছু দক্ষতার সাথে বের করে আনলো নিকলস। এখন সে পাঁজরের ভেতর যা কিছু আছে, অত্যন্ত সাবধানে একে একে বের করে আনছে। শিস দিচ্ছে না, তবে নাক থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা গরম বাতাস সে রকমই আওয়াজ করছে। কি এক অদ্ভুত লোভ নাকি তৃপ্তিতে কে জানে, চোখ জোড়া চকচক করছে তার। হাত দুটো কনুই পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি।

তার পিছনে খুলে গেল দরজা, লম্বা হাড্ডিসার এক লোক ঢুকলো ভেতরে। লোকটার গাল বসা, চোখ দুটো গর্তের ভেতর, শুকনো ফ্যাকাশে চেহারা, যেন কতো বছর খেতে পায়নি। নিকলসের মতো সে-ও একটা রাবার অ্যাপ্রন পরে আছে। 'আমি কোনো সাহায্যে আসবো, মিঃ নিকলস?' জানতে চাইলো সে।

'আজ রাতে আর মেয়েটাকে খোঁচাবো না, মাইকেল,' বললো নিকলস। 'মগজে হাত দেবো কাল। এখন আমাকে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হবে, হিশাবে অনেক গোলমাল আছে। ধরো দেখি, ওকে ট্যাংকে শুইয়ে দিই।'

হোস পাইপের পানি তাক করে লাশটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলা হলো, তারপর দু'জন ধরাধরি করে ফরম্যালডিহাইড ভরা প্রকাণ্ড এক কাঁচের ট্যাংকে নামিয়ে দিলো। ছলাৎ করে মৃদু শব্দের সাথে ডুবলো লাশটা, বার কয়েক পাক খেলো, তারপর

তলা থেকে দুই কি দেড় ফুট ওপরে স্থির হয়ে গেল। লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়লো মাথার পিছনে আর দু'পাশে।

'স্রেফ একটা অপচয়, তাই না, মিঃ নিকলস?' দীর্ঘশ্বাস ফেললো মাইকেল। 'মেয়েটা সত্যি অপরূপ সুন্দরী ছিলো।'

'সুন্দর হোক বা কুৎসিত, ছুঁড়ি হোক আর বুড়ি, সবাইকেই এই অবস্থায় পৌঁছুতে হবে, মাইকেল,' সহাস্যে বললো নিকলস। 'আর সবাই চলে গেছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তাহলে তোমারও চলে যাওয়া দরকার। আমি···আমার তো এখনো অনেক কাজ বাকি।'

'আপনি বললে···'

'কোনো দরকার নেই তার, আমি একাই হিশেব মেলাতে পারবো।'

মাইকেল হাসলো। 'ভালোই হলো, স্যার। স্ত্রীকে বলে এসেছি আজ রাতে ওকে বাইরে খেতে নিয়ে যাবো··· ।'

'মিচেল্যার স্ট্রিটের গোল্ডেন ড্রাগনে যাও তাহলে,' পরামর্শ দিলো নিকলস। 'সব আইটেমই ওরা খুব ভালো করে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। তাই যাবো।'

মাইকেল চলে যেতে সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে হাত থেকে রক্ত ধুলো নিকলস, অ্যাপ্রন খুলে সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকলো। উলঙ্গ হয়ে গোসল করলো সে। শাওয়ারের গরম পানি পেশীগুলোর টান টান ভাব দূর করে দিলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নরম একটা শাদা শার্ট পরলো সে, কালো টাই বাঁধলো গলায়,

সবশেষে সুন্দর একটা স্যুট পরলো। তুষার সাদা চুল তার, সোনালি ফ্রেমের চশমায় দারুণ মানালো। এখন তাকে লং ব্যারো ক্রেম্যাটরিয়াম অ্যাণ্ড হাউস অভ রেস্ট-এর ডিরেক্টর বলে মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকবে না। ম্যাট ইসটনের সাথে তার এই চেহারার এখন আর মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। ম্যাট ইসটন অর্গানাইজড ক্রাইম সিণ্ডিকেটের পক্ষে দু'আড়াই বছর কাজ করে তিন বার জেল খেটেছে, কিন্তু তারপর পেরিয়ে গেছে দুই যুগেরও বেশি সময়।

সময় এবং পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এমবামিং রুম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগোলো নিকলস। মেঝেতে পুরু কার্পেট, গোড়ালি পর্যন্ত পা ডেবে যায়। দু'পাশের দেয়ালে ওক কাঠের প্যানেল। চারদিক ঝকঝক তকতক করছে। শেড পরানো ল্যাম্প থেকে কোমল, মৃদু আলো আসছে। হ্যাঁ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলতে দেদার টাকা খরচ করেছে সে। জীবনাবসানের পর কতো মানুষের শেষ বিশ্রামের জায়গা এটা, সব কিছু রুচিসম্মত, সুন্দর, আর চোখ ঝলসানো না হলে চলবে কেন। অথচ কেউ কি ভাবতে পারে গোটা প্রতিষ্ঠানটাই আসলে একটা অপরাধের ফসল ?

ম্যারিয়ন ওয়াকার ছিলো নিঃসঙ্গ বিধবা, চোখে কম দেখতো, বয়স হয়েছিল সত্তরের ওপর। ব্যাংকে ছিলো স্বামীর রেখে যাওয়া দু'লাখ পাউণ্ড, তার সুদ আর নিজের মাসিক পেনশন থেকে যা পেতো একা মানুষ খুবই ভালো দিন কাটছিল। এই সময় বন্ধুর ছদ্মবেশে তার জীবনে ঢুকলো শনি। বৃষ্টি ঝরা এক সকালে রাস্তা

পার হতে যাবে সে, দয়ার শরীর নিয়ে এগিয়ে এসে তার মাথায় ছাতা ধরলো এক যুবক।

ফরেস্ট হিলের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গেল ম্যাট ইসটন। গাড়ি চালায়, ফাই-ফরমাশ খাটে, রান্নাবান্না করে, সব কাজেই তার প্রচুর উৎসাহ। বৃদ্ধার প্রিয়পাত্র হয়ে ভেতরে ঢুকলো সে, তারপর দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা নিয়ে একটু একটু করে এগোলো। ধর্মোপদেশ দিয়ে শুরু করলো সে। পাপীদের জন্যে কি শাস্তি অপেক্ষা করছে, কোন্ কাজটা পাপ কাজ, এ-সবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো ম্যারিয়ন ওয়াকার। প্রয়োজনের তুলনায় কম খেলে, আত্মপীড়নে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে পাপ-মুক্তির সম্ভাবনা আছে, কথাগুলো মেনে নিয়ে অনুশীলন শুরু করলো সে। ওদিকে খাবারের সাথে স্লো-পয়জন দিয়ে যাচ্ছে ম্যাট ইসটন। দিনে দিনে শরীর ভেঙে পড়লো বৃদ্ধার। সে বুঝলো, দিন ফুরিয়ে এসেছে। ম্যাট ইসটন তাকে অভয় দিয়ে বললো, তার জন্যে সারা জীবন প্রার্থনা করবে সে। মারা যাবার ক'দিন আগে বাড়ি, ব্যাংকের টাকা, পেনশন, সমস্ত কিছু ইসটনের নামে উইল করে দিলো বৃদ্ধা। সে মারা যাবার পর দূর সম্পর্কের এক ভাইঝি সম্পত্তি আদায় করার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু আইন তাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারলো না।

হাতে টাকা আসার সাথে সাথে বদলে গেল লোকটা। প্রথম সুযোগেই বাড়িটা বিক্রি করে দিলো, সমস্ত টাকা তুলে নিলো ব্যাংক থেকে। সবশেষে নামটাও বদলে ফেললো।

সব কিছুই বেশ চমৎকারভাবে শুরু হলো। ব্যবসা তুঙ্গে, দু'-হাতে টাকা কামাচ্ছে এড নিকলস। কিন্তু অনেক বছর পর হঠাৎ করে তার জীবনে উদয় হলো রবার্ট পিয়ারসন ওরফে জনি। দেখা গেল ম্যাট ইসটন সম্পর্কে কিছুই তার অজানা নেই। কাজেই তার কথায় নাচতে রাজি হতে হলো নিকলসকে। রাজি হলো, কিন্তু মনে মনে তৈরিও থাকলো, সুযোগ আর সুবিধে মতো কাঁটাটা উপড়ে ফেলবে সে।

মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় নতুন কেনা ইনসিনারেটর মেশিনটার কথা মনে পড়লো তার। মাত্র গত হপ্তায় বসানো হয়েছে ওটা। একটা মানবদেহকে পুড়িয়ে ছাই করতে স্রেফ পনেরো মিনিট সময় নেবে। পুরনো মেশিনটায় কাজ করতে নানা রকম অসুবিধে হচ্ছিলো। ওটা সময় নিতো দেড় ঘণ্টা। তাছাড়া, অনেক সময় খুলি আর পেলভিস ভেঙে টুকরো না করে দিলে ঠিকমতো পুড়তো না। জনির কথা আবার মনে পড়লো তার। সুদর্শন, কিন্তু লম্বা-চওড়া নয় সে—তার বেলায় নতুন মেশিনটা সম্ভবত দশ মিনিটের বেশি নেবে না।

অফিসে ঢোকার মুখে মেয়েটাকে দেখতে পেলো নিকলস, রিসেপশন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পায়ের আওয়াজে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরলো সে। 'আমি মিঃ এড নিকলসের সাথে দেখা করতে চাই।'

'আমিই। বলো কি করতে পারি?' আপাদমস্তক খুঁটিয়ে মেয়েটাকে দেখলো নিকলস। অল্প বয়স, দেখতে কুৎসিত, পরনে নোংরা কাপড়চোপড়। এখানে কেন এসেছে ও, কোন্ বুদ্ধিতে?

জানে না, এখানে শুধু ধনী লোকদের লাশ পোড়ানো হয় ?

'আমার এক আত্মীয়া···তার ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

'তোমার কে ?'

'দাদী-মা।'

'সদ্য মারা গেছে ?'

'আজ সকালে। আমার ইচ্ছে দাদী-মার খুব যত্ন নেয়া হোক। আপনি মিঃ এড নিকলস ?'

'হ্যাঁ, আমিই সে,' নিকলস দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মনে মনে ভাবলো, একেই বলে গরীবের ঘোড়া রোগ। মেয়েটার দৈন্য দশা দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেলো তার। তারও হাভাতের ঘরে জন্ম হয়েছিল। 'শোনো, মেয়ে—তোমার এই শোকে আমি বড় জোর আন্তরিকভাবে সান্ত্বনা দিতে পারি। তুমি বোধহয় জানো না, এখানে আমরা স্পেশালাইজড সার্ভিস দিয়ে থাকে। বিস্তর খরচের ব্যাপার··· ।'

দাঁত দিয়ে একবার নখ খুঁটলো মেয়েটা, তারপর মুখ তুলে বললো, 'দাদী-মার ইন্সুরেন্স করা আছে।'

'জানতে পারি কতো টাকার ?'

'এক হাজার পাউণ্ড। ওতে হবে না ?'

মেয়েটার ব্যাকুল দৃষ্টি নিকলসের অন্তর ছুঁয়ে গেল। বেশির-ভাগ অপরাধীর মধ্যেই হাতে অগাধ টাকা আসার পর মানবিক গুণের পরিচয় দেয়ার একটা ঝোঁক চাপে, সে-ধরনের একটা ঝোঁক এই মুহূর্তে নিকলসের মধ্যেও চাপলো। মেয়েটার কাঁধে আস্তে

করে একটা হাত রাখলো সে, অভয় দিয়ে হাসলো, বললো, 'ঠিক আছে, কি করা যায় দেখবো। কাল সকালে এসো, মন ভালো থাকলে তোমার কাছ থেকে কোনো টাকাই আমি নেবো না।'

'কাল সকালে?' হতাশ হলো মেয়েটা। 'কিন্তু আমি যে আজ রাতেই সব ব্যবস্থা করে যেতে চেয়েছিলাম!'

'কিন্তু আমি একেবারে একা, স্টাফরা সবাই বাড়ি চলে গেছে।' মেয়েটার চেহারা কালো হয়ে যাচ্ছে দেখে দয়া হলো তার। 'ঠিক আছে, কতোক্ষণই বা লাগবে। এসো, আমার অফিসে এসো। কাগজ-পত্রে সই করতে হবে।'

পথ দেখিয়ে মেয়েটাকে অফিস রুমে নিয়ে এলো নিকলস। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে সাজানো ঘরটা দেখলো মেয়েটা। ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসলো নিকলস, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালো। খানিক ইতস্তত করে বসলো মেয়েটা।

ডেস্ক-ডায়েরী খুললো নিকলস, ঝর্ণা কলম খুলে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম বলো।'

'টুইড, রোয়েনা টুইড।'

'ঠিকানা?'

'ঠিক জানি না,' ঝট্ করে মুখ তুললো নিকলস। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রোয়েনা আবার বললো, 'বাড়িটা ব্যাবিলনে যাবার পথে পড়ে আর কি।'

ঘরের ভেতর জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো। রোয়েনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নিকলস, স্নেহমাখা হাসিটুকু অদৃশ্য হয়েছে আগেই। 'আচ্ছা!' ডায়েরীটা বন্ধ করলো সে, দেরাজ

খুলে রেখে দিলো, একই হাত দিয়ে পয়েন্ট থ্রি-টু অটোমেটিকটা ধরলো, তারপর ধীরে ধীরে পকেট ভরলো সেটা। রোয়েনা ব্যাপারটা টেরই পেলো না।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো নিকলস। 'এসো আমার সাথে।'

দাঁড়াতে গিয়ে রোয়েনা অনুভব করলো তার পা দুটো কাঁপছে। আতংকে ঘামতে শুরু করলো সে। এরপর কি করতে হবে তার জানা নেই। নিকলস তার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় ভয়ার্ত চোখে তাকালো সে, করুণা প্রার্থনার ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে চেষ্টা করলো।

'ভয় পাবার কিছু নেই,' অভয় দিলো নিকলস। 'দোতালায় বসে কথা বলবো আমরা।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, নিকলসের পিছু পিছু দোতালায় উঠে এলো রোয়েনা। চামড়া মোড়া একটা দরজার সামনে থামলো নিকলস, কবাট মেলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো এক-পাশে।

ঘরের ভেতর ছায়া বেশি আলো কম। ইতস্তত করতে করতে পা বাড়ালো রোয়েনা। ফরম্যালডিহাইডের গন্ধ ঢুকলো নাকে। মৃদু আলোয় ট্যাংকের ভেতর লাশটা দেখে এক পা পিছু হটলো সে। পিছনে ক্লিক শব্দের সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো রোয়েনা। তাকে পাশ কাটিয়ে এগোলো নিকলস। নির্লিপ্ত চেহারা। বড় একটা মেহগনি কেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে ক্ষুরের মতো ধারালো একটা স্ক্যালপেল তুলে নিলো সে, আলোর নিচে খুঁটিয়ে

পরীক্ষা করলো ফলার কিনারা, ভুরু জোড়া কুঁচকে থাকলো মুহূর্ত। তারপর খপ্ করে রোয়েনার কোটের সামনেটা খামচে ধরলো, টান দিয়ে নিজের বুকের ওপর নিয়ে এলো তাকে, দুই মুখের মাঝখানে এক কি দেড় ইঞ্চি ফাঁক। গলার চামড়ায় ধারালো স্ক্যালপেলের স্পর্শ পেয়ে শিউরে উঠলো রোয়েনা।

'কে তুমি? তোমার সাথে আরেকজনের থাকার কথা, সে কোথায়? জলদি বলো, নয়তো এখুনি তোমার গলা কাটবো।'

পাগলের মতো হয়ে গেল রোয়েনা। নিকলসকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার জুড়ে দিলো।

লং ব্যারো এস্টেটের গেট থেকে একশো গজ দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা বট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ডটা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটার বিশাল কাঠামো দেখতে পেলো সলোমন, আলো জ্বলছে পোর্চে। একে বৃষ্টি, তার ওপর রাত, বেশি কিছু আর দেখা গেল না। এই সময় অন্ধকারে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। পাশে এসে দাঁড়ালো রানা।

'গেটে একটা নোটিশ ঝুলছে,' বললো ও। 'রোজই ছ'টায় বন্ধ হয়ে যায়। বাজে ক'টা?'

'সোয়া ছ'টা,' লিউমিনাস ডায়ালে চোখ রেখে বললো সলোমন।

'ঘুর ঘুর করার সময় দেখলাম গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল এক লোক। তবে গাড়ি-বারান্দায় আরো একটা গাড়ি আছে—দূর থেকে দেখে মার্সিডিজ বলে মনে হলো।'

'মালিক ছাড়া আর কে মার্সিডিজ ব্যবহার করবে।'

'ঠিক,' বললো রানা। 'কিন্তু যাই বলো, আমার কিন্তু খুঁতখুঁত করছে।'

'ভাবছো আমরা আসবো জেনে ছুরিতে শান দিচ্ছে ওরা?' ঝাঁঝের সাথে বললো সলোমন। 'হয়তো তাই, কিন্তু ঝুঁকি না নিয়েই বা আমাদের উপায় কি?'

'উপায় নেই, কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা সাবধান হতে পারি,' বললো রানা, ফোর্ডের জানালা দিয়ে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে রোয়েনার দিকে তাকালো। 'তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারো, বুঝলে। চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'অবশ্যই,' বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলো রোয়েনা। 'কি করতে হবে বলে দিন শুধু।'

'সোজা ভেতরে ঢুকে গিয়ে এড নিকলসকে চাইবে। তারপর কি করতে হবে শিখিয়ে দিলো রানা। 'সুযোগ পেলে ব্যবিলন শব্দটা উচ্চারণ করবে, এটাই তোমার আসল কাজ।'

'আমরা কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'আমি পিছন থেকে বাড়িটায় ঢুকবো,' বললো রানা। 'তুমি সামনে দিয়ে বা ডান-বাম যে-কোনো এক দিক দিয়ে,' রোয়েনার দিকে ফিরলো ও। 'তোমার কাছেপিঠেই আমরা থাকবো। কি, পারবে বলে মনে করো?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালো রোয়েনা। তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সলোমন।

'তোমার কোনো ভয় নেই, ডার্লিং,' বললো সে। 'কেউ

তোমার গায়ে আঁচড়টি কাটলে আমি তার ঘাড় মটকাবো।'

এ-সবই ফাঁকা বুলি, তবে রোয়েনা সরল বিশ্বাসে সলোমনের কনুই আঁকড়ে ধরলো। 'আমি জানি, জো। তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

নির্দয় সলোমন শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে প্রতিবাদ করলো না। মনে মনে ভাবলো, বেশ্যা মাগী বলে কি! মেয়েটার কাঁধ চাপড়ে দিলো সে, অভয় দিয়ে হাসলো। 'আমাকে দরকার হলেই চেঁচাবে, এক ছুটে পৌঁছে যাবো আমি।'

পরিস্থিতি অন্য রকম হলে হো হো করে হেসে উঠতো রানা, হাসলো না শুধু মেয়েটার করুণ অবস্থার কথা ভেবে। ভাবাবেগে বিচলিত হবার সময় এটা নয়, কাজেই তাড়া লাগালো ও, 'এবার যাও, রোয়েনা। কেউ বাধা না দিলে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়বে। আর মনে আছে তো, আমরা তোমার কাছেপিঠেই থাকবো।'

ছয়

গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে স্রোতস্বিনী নদীর মতো কলকল ছলছল শব্দে ছুটে চলেছে পানি, গেটের পাশে গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা আর সলোমন। ধাপ কটা বেয়ে পোর্চে উঠলো রোয়েনা, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না। পোর্চের আর্ধেক মাথায় কাঁচ লাগানো দরজা, রিসেপশন রুম, ভেতরে আলো জ্বলছে। একটা ডেস্কের কোণ, খানকয়েক চেয়ার দেখা গেল।

সলোমনের দিকে ফিরলো রানা। 'আমি পিছন দিয়ে ঢুকি, তুমি এদিক দিয়ে পারো কিনা দেখো।' বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত হারিয়ে গেল ও।

গেটের ভেতর ঢুকে রডোডেনড্রন ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে এগোলো সলোমন। সিঁড়ি বেয়ে একজন লোককে নামতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, পোর্চ থেকে মাত্র দশ-বারো গজ দূরে। লোকটার পরনে গাঢ় রঙের স্যুট, অস্বাভাবিক সাদা চুল মাথায়। রোয়েনার সাথে এক মিনিট কথা বললো সে। তারপর

দু'জনেই বাঁ দিকের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ঝোপের ভেতর দিয়ে আরো খানিক সামনে বাড়লো সলোমন।

ধাপ ক'টার পাশে ছায়ায় দাঁড়ালো সে, একটা পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে থাকলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার রিসেপশনে বেরিয়ে এলো লোকটা রোয়েনাকে নিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ওরা।

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সলোমন, কি করবে ভাবছে। এই প্রথম সে উপলব্ধি করলো, হাসপাতাল ছেড়ে পালাবার পর থেকে সিদ্ধান্ত যা নেয়ার সব রানাই নিয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টির বেগ বেড়ে যাওয়ায় গা বাঁচাবার জন্যে ধাপ বেয়ে পোর্চে উঠে পড়লো সে, কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো রিসেপশনে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কান পাতলো সলোমন। গোটা বাড়িতে কবরের নিস্তব্ধতা। ধীরে ধীরে এগোলো সে, মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো। সিঁড়ির মাথায় উঠেছে, এমনি সময়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে উঠলো রোয়েনা।

পালাবার জন্যে সাথে সাথে ঘুরলো সলোমন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার আর্তনাদ করে উঠলো রোয়েনা। সলোমনের পরবর্তী আচরণ স্রেফ হয়তো রিফ্লেক্স অ্যাকশন, কিংবা হয়তো নিজেকে নিয়ে তার যে গর্ব আছে সেটারই অবদান। চামড়া মোড়া দরজা খুলে তীরবেগে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। রোয়েনা আর সেই লোকটা, দু'জনেই দরজার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। একটা

বেঞ্চের ওপর রোয়েনাকে পেড়ে ফেলেছে নিকলস, ধারালো স্ক্যালপেলটা রোয়েনার গলার ওপর নামছে।

তারস্বরে চিৎকার করছে রোয়েনা, সলোমনের নাম ধরে ডাকলো একবার। পিছন থেকে নিকলসের কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো সলোমন, ঘোরালো, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো বেঞ্চের ওপর। স্প্রিঙের মতো লাফ দিয়ে সলোমনের বুকের ওপর পড়লো রোয়েনা। তার চেহারা ভয়ে কদাকার হয়ে উঠেছে। অভয় দিয়ে তার পিঠে হাত বুলালো সলোমন। বেঞ্চ থেকে উঠলো নিকলস, সিধে হলো, পিস্তল সহ হাত বের করলো পকেট থেকে।

রোয়েনার বিপদে জড়িয়ে পড়ায় নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো সলোমনের। আত্মরক্ষার ব্যাকুল আগ্রহে রোয়েনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েই দরজার দিকে ছুটলো সে।

একটা মাত্র গুলি করলো নিকলস। ট্যাংকের পুরু কাঁচে নিখুঁত একটা ফুটো তৈরি হলো, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো ফরম্যালডিহাইডের মোটা একটা ধারা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে সলোমন। ধীরে ধীরে সিধে হলো সে। শান্ত কণ্ঠে পিছন থেকে নিকলস বললো, 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। হাত দুটো মাথার ওপর,' রোয়েনাকে সামনের দিকে একটু ঠেলা দিলো সে। 'হাঁটো, দু'জনেই।'

করিডর ধরে এগোলো সলোমন। পাশে থাকলো রোয়েনা, দু'পাটি দাঁত ঠক ঠক আওয়াজ করছে। রানার ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। সলোমন ভাবলো, গুলির আওয়াজ শুনে এক মাইল

দূরে সরে গেছে নাহিদ। রাগ হলো তার, কিন্তু আবার এ-কথাও ভাবলো যে নাহিদের জায়গায় সে হলেও ঠিক তাই করতো। অন্য কারো জন্যে মৃত্যুর মুখে কোন্ বোকা দাঁড়াতে চায়?

নিকলসের নির্দেশে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো ওরা। রিসেপশনে অনেকগুলো দরজা, তার একটা দিয়ে হলঘরে ঢুকলো তিনজন। আলো জ্বাললো নিকলস। সলোমন দেখলো, একটা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ধাপগুলো নিচের দিকে নেমে গেছে, নিচেটা দেখে মনে হলো এককালে জায়গাটা সম্ভবত ওয়াইন সেলার ছিলো, কিছু দিন হলো দেয়ালগুলো রঙ করা হয়েছে সাদা আর কালোয়। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় এক দিকের দেয়ালে জটিল একটা সুইচবোর্ড দেখলো সলোমন। উল্টোদিকের দেয়ালে কয়েকটা স্টীল আভনডোর। ব্যাখ্যা করার দরকার হলো না, সলোমন বুঝতে পারলো ক্রেম্যাটরিয়ামে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। কেন, তাও বলে দেয়ার দরকার করে না। পরিবেশটা গুমোট, তবু আকস্মিক ঠাণ্ডায় হি হি করতে লাগলো সে।

নিচে নেমে নিকলস বললো, 'পা দুটোকে এবার একটু বিশ্রাম দাও,' ঘুরে ওদের সামনে চলে এলো সে। 'তোমরা জানো, কোথায় রয়েছো?'

'লেকচার মারতে হবে না,' খেঁকিয়ে উঠলো সলোমন। 'আমাকে নিয়ে কি করতে চাও বলো তাড়াতাড়ি।'

'কেন, কোথাও যাবার তাড়া আছে নাকি?' হাসতে লাগলো নিকলস। 'লাশ নিয়ে কারবার আমার, তারা কোথাও যেতে

পারে না,' দেয়ালের একটা সুইচের দিকে হাত বাড়ালো সে। আচমকা একটা যান্ত্রিক গর্জন শোনা গেল, জোরে টান দিয়ে স্টীল ডোর-গুলোর একটা খুলে ফেললো নিকলস। ভেতরে দাউ দাউ আগুন দেখা গেল, চারদিকের ইটের গাঁথুনি থেকে হিসহিস শব্দে লকলকিয়ে উঠলো নীলচে শিখা। খোলা দরজার মুখেই আর্মা-রড গ্লাসের আবরণ।

'দশ মিনিট,' বললো নিকলস। 'তার বেশি লাগবে না। তার-পর থাকবে শুধু এক মুঠো ছাই।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে সলোমনের গায়ে ঢলে পড়লো রোয়েনা, বাধ্য হয়ে তাকে ধরে ফেলতে হলো। ওদেরকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে নিকলস, চেহারায় নগ্ন উল্লাস। সিঁড়ির দিকে পিঠ দিয়ে থামলো সে। 'একেই আমরা ফুল ট্রিটমেন্ট বলি। অন্যদের কাছ থেকে পাঁচশো পাউণ্ড করে নিই, তোমরা পাচ্ছো বিনা পয়সায়।'

রোয়েনা সিধে হয় দাঁড়াতে পারছে না দেখে ঠেলা দিলো সলোমন, হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ে গেল সে। 'কোথাও ভুল হয়েছে তোমার,' নিকলসকে বললো সলোমন। 'আমি ব্যাবি-লনে যাবো, কাউন্টের সাথে আমার একটা চুক্তি হয়েছে।'

সলোমনের দিকে একটা আঙুল তাক করলো নিকলস। 'বোকা নাকি!'

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো,' আবেদনের সুরে বললো সলোমন। 'কাউন্টকে আমি আমার টাকার হদিশ বলে দিয়েছি। চুক্তিমতো...।'

'হয়, এরকম হয়,' সবজান্তার মতো মাথা ঝাঁকালো নিকলস।

'কোনো কোনো লাশ বেঁকে বসে,' খোলা স্টীল দরজা দিয়ে গনগনে আগুনের দিকে তাকালো সে। 'কোনো কোনোটা তো ওখানে গিয়ে রীতিমতো নৃত্য শুরু করে দেয়।'

পরমুহূর্তে নিকলসের ঘাড়ে ভূত সওয়ার হলো। সিঁড়ি দিয়ে নামেনি, রেইল টপকে ঝাঁপ দিয়েছে রানা। কাঁধে রানাকে নিয়ে বসে পড়লো নিকলস, সাবলীল ভঙ্গিতে তার ঘাড় থেকে নেমে দু'পা সামনে হেঁটে গেল রানা, ছিটকে পড়া পিস্তলটা তুলে ঘুরে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে হুংকার ছেড়ে পা তুলেছে সলোমন নিকলসের পাঁজর লক্ষ্য করে।

'রক্তখেকো ছারপাকা!' নিকলসের মুখে, পাঁজরে, পেটে, যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই লাথি মারছে সলোমন। 'ডাইনির মাথার উকুন! তোর মাকে আমি···।'

দু'জনের মাঝখানে চলে এলো রানা, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সলোমনকে। 'মুখ খারাপ করো না তো! সরো, ওর সাথে কথা বলতে দাও আমাকে।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে, চোখ রাঙিয়ে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'নিজের সময় মতো এলে, তাই না?'

কথাটা গায়ে মাখলো না রানা। নিকলসকে ধরে দাঁড় করালো ও, ঠেলে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসালো। নিকলস মার খেয়ে ঘোরের মধ্যে রয়েছে, যান্ত্রিক ভঙ্গিতে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছলো সে।

'আমার নাম নাহিদ শাহ, আমার সাথে ও জো সলোমন,' হাতের পিস্তল নেড়ে বললো রানা। 'তুমি সম্ভবত জানো আমরা

কে।'

মাথা ঝাঁকালো নিকলস। 'ম্যানিংহ্যাম হাসপাতাল থেকে কাল পালিয়েছো তোমরা। কাগজে পড়েছি আমি।'

'আমরা আসবো তুমি জানতে?'

নিকলসকে ইতস্তত করতে দেখে ঘুসি বাগিয়ে এক পা সামনে বাড়লো সলোমন। 'আমার সাথে কথা বলতে দাও।'

কুঁকড়ে চেয়ারের পিছনে সরে গেল নিকলস। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুখের সামনে একটা হাত তুললো। 'ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই। আপনারা যা জানতে চান সব আমি বলবো।'

সলোমনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ঠিক আছে, একটা সুযোগ দাও ওকে।' প্রশ্নটা আবার করলো ও, 'আমরা আসবো তুমি জানতে?'

মাথা ঝাঁকালো নিকলস। 'আজ বিকেলে আমি একটা ফোন পাই। কেউ আসবে জানতাম, কিন্তু আপনারা দু'জন কিনা জানতাম না।'

'কে তোমাকে ফোন করে?'

'সে নিজের নাম বলে জনি। এর বেশি তার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'চেহারার বর্ণনা দাও।'

'সুদর্শন, মার্জিত আচরণ,' কাঁধ ঝাঁকালো নিকলস। 'দেখে মনে হবে অভিজাত।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালো সলোমন। 'ডাক্তার

টেনিসন ?'

'ওরফে জনি। হ্যাঁ, তার মতোই শোনাচ্ছে বটে,' আবার রানা নিকলসের দিকে ফিরলো। 'সে আসবে কিনা জানো ?'

'পরিষ্কার করে কিছু বলেনি।'

আভনগুলো দেখার জন্যে সরে গিয়েছিল সলোমন, ফিরে এসে জানতে চাইলো, 'জনি যাদের পাঠায়, তাদের সবাইকে ফুল ট্রিটমেন্ট দাও তুমি ?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লো নিকলস। 'ওদের বেশিরভাগকে ট্রিটমেন্ট দিতে হয় আমার। বাকিদের পাঠিয়ে দিই আরেক স্টেশনে।'

নিখাদ আতংকে সলোমনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। 'বেশিরভাগকে!' রানার দিকে ফিরলো সে। 'ফর গডস সেক, খোশ-গল্প বাদ দিয়ে যা জানার তাড়াতাড়ি জেনে নাও। এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নাই। বেজন্মা কুকুরটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'বাকিদের কোথায় তুমি পাঠিয়েছো ?' নিকলসকে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'পরবর্তী স্টেশনটা কোথায় ?'

'আমি কোনো ঠিকানা জানি না,' ইতস্তত না করেই বললো নিকলস। 'এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসি। সাধারণত প্রতিবার একটা ভ্যান এসে তুলে নিয়ে যায় ওদের।'

'তারমানে আড়াল থেকে দেখেছো তুমি।'

মাথা ঝাঁকালো নিকলস। 'কিন্তু পিছু নিইনি। ভ্যানের

রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখেছি, তারপর আমার এক বন্ধুকে দিয়ে নম্বরটা চেক করিয়েছি। গাড়িটা গুডউইন নামে এক লোকের। তার ছোট্ট একটা বোটইয়ার্ড আছে।'

'কোথায়?'

'ডোরসেট কোস্টে, লুলওয়ার্থের কাছে, জায়গাটার নাম আপটন মাগনা। এখান থেকে প্রায় নব্বুই মাইল দূরে।'

উত্তেজিতভাবে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'মনে হচ্ছে এই ঠিকানাটাই আমরা খুঁজছি, নাহিদ। রাস্তার ওটা শেষ মাথা হতে পারে।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নিকলসের দিকে। আচমকা লোকটার মাথায় পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে হ্যামার কক করলো ও। 'শালা মিথ্যুক!'

আতংকে নীল হয়ে গেল নিকলস, তোতলাতে শুরু করলো, 'স-সত্যি, স-সত্যি। মা-মায়ের কি-রে!'

আক্রোশে দাঁত চাপলো সলোমন। 'তোর তো মা-ই ছিলো না, বানচোত!' বলেই চেয়ারটার পায়ায় পা বাধিয়ে টান দিলো, ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল নিকলস।

মেঝেতে পড়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো সে, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'তুমি চাও, সলোমনের হাতে তুলে দিই তোমাকে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো নিকলস। উঠে বসলো সে, বললো, 'যা বলবেন...।'

'রিড কোয়েন, জন হেরিক, আর রিপ হটন—এদের সম্পর্কে

কি জানো তুমি ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'রিড কোয়েন ? জন হেব্রিক ?' মাথা নাড়লো নিকলস।
'এদের কথা জানি না। তবে রিপ হুটনকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল।'

'কোথায় সে ?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমার চোদ্দপুরুষের কিরে, তাকে আমি রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'তারপর ? সেই একই ভ্যান তাকে তুলে নিয়ে যায় ?'

'তাই নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু দেখার জন্যে আমি সেখানে ছিলাম না।'

নিকলসের দিকে আরো ক'সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো রানা। লোকটার একটা বিহিত করা দরকার, কিন্তু হাতে এই মুহূর্তে আরো জরুরী কাজ রয়েছে। পরে।

পিস্তলটা পকেটে ভরে রোয়েনার দিকে ফিরলো রানা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে মেয়েটা। তার একটা হাত ধরলো ও, বললো, 'চলো, বেরোনো যাক।'

'মড়াখেকোটার কি হবে ?' নিকলসের পাঁজরে পায়ের খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'ওর কোনো ক্ষমতাই নেই আমাদের ক্ষতি করে,' বললো রানা। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি তা যদি বলে দেয়, ওরা জানতে চাইবে ঠিকানাটা আমরা পেলাম কোথায়। তারপর কতোক্ষণ বাঁচবে বলে তোমার ধারণা ?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো নিকলস, কথা-

টার তাৎপর্য উপলব্ধি করে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। তার ভাব দেখে কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সলোমন।

'তোমার বুদ্ধিকে নমস্কার, নাহিদ। তবে আমার ধারণা ওর খানিকটা বিশ্রাম দরকার,' ছুটে গিয়ে নিকলসের মাথার পাশে লাথি মারলো সলোমন।

মেঝের ওপর গড়ান খেলো নিকলস, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো। অস্পষ্টভাবে দেখলো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে তিনজনের দলটা। তারপর জ্ঞান হারালো সে।

সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যথাটা। গভীর অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করলো নিকলস। কে যেন তার গালে বার-বার চড় মারছে, নাম ধরে ডাকছে। চোখ মেলে রবার্ট পিয়ারসন ওরফে টেনিসন ওরফে জনির মুখটা চোখের সামনে ভাসতে দেখলো সে।

'তোমার চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে, বুড়ো খোকা। সম্ভবত এসে আবার চলে গেছে ওরা, তাই না?'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করলো নিকলস। 'তিনজন ছিলো ওরা,' ঘড়ঘড় করে উঠলো তার কণ্ঠস্বর। 'তোমার কথা-মতো দু'জন নয়। সাথে একটা মেয়েও ছিলো।'

'ও, খোঁজ তাহলে পাওয়া গেল! প্রিয় জনি, ভুল-ভাল তোমারও দেখি হচ্ছে! দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, গাড়িটা বিগড়ে গিয়েছিল পথে, পৌঁছুতে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল!' নিকলসকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো সে, বসিয়ে দিলো চেয়ারে। 'কতোক্ষণ

হয়ে গেছে ওরা ?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিকলস দেখলো প্রায় সাতটা বাজে। 'আধ ঘণ্টা, তার বেশিও হতে পারে।'

'হুঁ। কোথায় যেতে হবে তুমি ওদের বলেছো, তাই না? গুডউইনের বোটইয়ার্ড, আপটন মাগনা?' তাকিয়ে থাকলো নিকলস, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না, মাথায় দপ দপে ব্যথাটা চিন্তা শক্তি ভোঁতা করে দিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেললো জনি। 'কাজটা তুমি ভালো করোনি হে।'

'আমার আর কোনো উপায় ছিলো না,' ক্লান্তস্বরে বললো নিকলস। 'না বললে ওরা আমাকে খুন করতো। এখনো সময় আছে, ইচ্ছে করলে ওদের তুমি ধরতে পারো।'

'ধরতে যে পারি সে আমার জানা,' বললো জনি। 'দুটো বিশেষ সুবিধে আছে আমার। নতুন একটা গাড়ি, বলতে পারো পক্ষীরাজ। আর, ঠিকানাটা আমার চেনা। ওদের অসুবিধে হলো, অলিগলি ধরে যেতে হবে, চেক করতে হবে প্রতিটা সাইনপোস্ট—তাছাড়া, ডোরসেট এলাকাটা এক রকম গোলকধাঁধা বলতে পারো। বিশেষ করে রাতে।' জনি পিছন দিকে সরে যেতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো নিকলস। 'তোমাকে নিয়ে অসুবিধেটা কি জানো, বুড়ো খোকা? তোমার ধারণা তুমি খুব বুদ্ধি রাখো, আসলে তা নয়—হয়তো চতুর, কিন্তু বুদ্ধিমান নও। বিশ্বাস করো, কাজটা করে আমি কোনো তৃপ্তি পাবো না। বলতে পারো, তিক্ত কর্তব্য পালন করছি।'

নিকলসের খুলির গোড়ায় ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড এক রদ্দা

মারলো জনি। ছোট্ট একটা কান্নার আওয়াজ বেরুলো কি বেরুলো না, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো নিকলস। তাকে পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নিলো জনি।

খোলা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সুইচ অফ করলো সে। ভেতরে আগুন নিভে গেল। কাঁচের দরজা খুলতেই সাত ফুট লম্বা বেস প্লেট পিছলে বেরিয়ে এলো বাইরে। নিকলসকে তাতে শুইয়ে দিলো জনি, হাত দুটো শরীরের পাশে সিধে করে দিলো। তারপর ঠেলা দিয়ে প্লেটটা আবার ঢোকালো ভেতরে, বন্ধ করলো কাঁচের দরজা।

সিগারেট ধরাবার জন্যে থামলো জনি, তারপর অন করলো সুইচ। দাউ দাউ অগ্নিশিখা চারদিক থেকে উদবাহু নৃত্য শুরু করে দিলো, অন্ধকার থেকে লাফ দিয়ে সেই আগুনের মাঝখানে উঠে এলো নিকলস। চোখের পলকে আগুন তাকে গ্রাস করলো। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত কাপড়চোড় গায়েব। তারপর, অবিশ্বাস্য বটে, নিকলসের একটা হাত বগলের কাছ থেকে খাড়া হয়ে গেল। যেন জ্বলন্ত একটা মশাল। শরীরটা নড়ে উঠলো, সেই সাথে মশালটাও।

চোখে-মুখে গভীর আগ্রহ নিয়ে দু'মিনিট দৃশ্যটা উপভোগ করলো জনি। তারপর স্টীল ডোর বন্ধ করে দিলো। ডায়ালের কাঁটা ঘুরিয়ে ম্যাক্সিমামে রাখলো সে, সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল ওপরে।

রস্টারের উল্টোদিকে, এক মাইল এগিয়ে একটা ফোন বক্সে

ঢুকলো সে। ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের নাম্বারে ডায়াল করলো।
'হ্যালো, সুইটি। বলতে খারাপ লাগছে, ব্যাপারটার সুরাহা হয়নি এখনও। বন্ধুরা ডোরসেটের পথে রয়েছে।'

নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'দুঃখজনক। কি করবে ভেবেছো কিছু ?'

'এখন থেকে গোটা ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে হবে। চেষ্টা করবো ওরা যাতে বাহনটা পায়, বরাবর সবাই যেটা ব্যবহার করে। যাক ওরা রওনা হয়ে। এমন কলকাটি নেড়ে রাখবো, তীরে আর ভিড়তে হবে না।'

'খুব বেশি দূর যেতে দেয়া হয়ে যাচ্ছে না ?'

'কি করে ? বোট যদি মাঝপথে ডুব দেয় ?'

'যা ভালো বোঝো করো। মেসেজটা আমি জায়গা মতো পৌঁছে দিচ্ছি।'

'সেই সাথে আমার হয়ে মহামান্যকে একটু বলো, বুড়ি খুকি, ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট করার জন্যে আরেকটা বোটে আসছি আমি। ব্রেকফাস্টের সময় ওখানে আমাকে পাওয়া যাবে।'

'বলবো তাঁকে।'

লাইন কেটে গেল, শিস দিতে দিতে গাড়িতে ফিরে এলো জনি।

সাত

আপটন মাগনা জেলেদের একটা গ্রাম, এককালে সুখ্যাতি এবং গুরুত্ব থাকলেও, কমতে কমতে লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'শোর মতো, ক্ষুদে হারবারে খুব বেশি হলে দু'চারটে বোট দেখা যায়।

পচন ধরা বাঁশের স্তূপ, নড়বড়ে কাঠের ঘর, পানি থেকে তোলা ভগ্নদশা কয়েকটা বোট, আর একটা পাথুরে জেটি নিয়ে গুডউইনের বোটইয়ার্ড। বোটগুলোকে দেখে কেউ বলবে না ওগুলো আবার পানিতে নামবে কোনোদিন।

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় গ্রামে ঢুকলো জনি, গাড়ি নিয়ে মেইন রোড ধরে এগোলো সে। খানিক সামনে চুনকাম করা একটা পাবলিক হাউস পড়লো, পিছনে গাড়ি রাখার জায়গা। গাঢ় ছায়ায় স্পোর্টস কার-টা রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো জনি।

বাড়িটার সদর দরজার ডানদিকে একটা জানালা, ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজার পাশেই সাইনবোর্ড—রবার্ট গুডউইন—বোটবিল্ডার—ইয়টস ফর হায়ার। তিনটে ধাপ টপকে পোর্চে

উঠলো জনি, জানালা দিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে।

কামরার অর্ধেকটা দখল করে আছে টেবিল-চেয়ার, বাকি অর্ধেকটা বিছানা-পত্র। সমস্ত জিনিস এলোমেলো হয়ে আছে। কাঠের রিসেপশন ডেস্কের পিছনে ছোটো একটা টেবিল, তার ওপাশে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে গুডউইন। টেবিলের ওপর এঁটো বাসনকোসন ছড়িয়ে রয়েছে, বোধহয় পুরো হপ্তা ওগুলোয় কারো হাত পড়েনি।

গুডউইনের বয়স হবে ষাটের মতো, এতো বেশি মোটা যে হাসি পায়। সারা গায়ে বনমানুষের মতো লম্বা লম্বা চুল। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো লোকটা, এবং অবাক হয়ে জনি দেখলো, একজোড়া ক্রাচ টেনে নিয়ে বগলের নিচে গুঁজে দিলো সে। টেবিল থেকে এনামেলের একটা মগ নিলো, ক্রাচে ভর দিয়ে এগোলো স্টোভের দিকে। স্টোভে কফি পট বসানো রয়েছে। তার ডান পা-টা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঝুলে থাকলো মেঝের ওপর।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো জনি। বিস্মিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো গুডউইন, এক হাতে মগ, আরেক হাতে কফি পট। 'আপনি, মিঃ জনি! আপনাকে আমি আশা করিনি!'

'পায়ে কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো জনি।

কাঁধ ঝাঁকালো গুডউইন। 'কি আর বলবো, কপাল মন্দ। কাল রাতে ইয়ার্ড থেকে ফেরার সময় লোহার স্তূপে ঠোকর খেয়ে পড়ে যাই।'

'বরাবরের মতো গলা পর্যন্ত মদ গিলেছিলে। কতোটা খারাপ?'

'এক থোড়া হাড় ভেঙে গেছে।'

'খুব ভালো! আমার প্ল্যানের জন্যে দারুণ সুবিধে হলো।' গোল্ডেন শানের খবর কি? পানিতে নামানো যাবে?'

'আপনার হুকুম মতো ওটাকে আমি সব সময় তৈরি রাখি, মিঃ জনি। এবার কি আপনি পাড়ি দেবেন?'

বেঢপ আকৃতি, লাল চোখ, চোখের নিচে পুঁটুলি, ফোলা গালে জেগে থাকা আঁকাবাঁকা শিরা, ইত্যাদি দেখেই বলে দেয়া যায় লোকটা কুঁড়ের বাদশা, ব্যর্থতার সীল-ছাপ্পড় মারা জীবন। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শন আগন্তুককে খুশি করার একটা ব্যাকুল আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল তার মধ্যে। একমাত্র কারণ, এই আগন্তুকের কল্যাণে আজও একেবারে দেউলিয়া হয়নি সে।

'আমি না,' বললো জনি। 'তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছোট্টো একটা দল আসছে। দু'জন পুরুষ, একটা মেয়ে। সেই একই পাসওয়ার্ড আওড়াবে। ওরা চাইবে তুমি ওদের পার করে দেবে।'

গুডউইনকে সন্দিহান দেখালো। 'হুকুম মানতে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু এই পা নিয়ে···মানে··· ।'

'বললাম না, তুমি পা ভাঙায় আমার খুব সুবিধে হলো? যেতে না চাওয়ার জন্যে ওই পা একটা অজুহাত হিশেবে কাজ করবে। ওরা এলে ব্যথায় কাতরাবে তুমি, ব্যথা হোক বা না হোক। ওদের অন্তত একজন বোট সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বুঝলে? এম. টি. বি-তে ছিলো, প্রাক্তন পেটি অফিসার। প্রয়োজনে তোমার গোল্ডেন শান নিয়ে দুনিয়াটা একবার চক্কর দিয়ে আসতে

পারবে সে।'

'তারমানে আপনি সত্যি চান লোকগুলো নিজেরাই বোট নিয়ে রওনা হোক?'

'এতোক্ষণে বুঝেছো। পথ আর গন্তব্য জানতে চাইবে ওরা, দুটোই জানিয়ে দেবে তুমি,' মিটিমিটি হাসিটা জনির সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, শুধু চোখ বাদে। 'আরে না, অবশ্যই তারা ওখানে পৌঁছুবে না। তবে আশায় বুক বেঁধে খানিকটা পথ দিক না পাড়ি, ক্ষতি কি?'

'আর আপনি?'

'তোমার যতোটুকু জানা আছে, আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। ব্যবস্থা ইত্যাদি করার জন্যে গোল্ডেন সানে যাচ্ছি আমি। তীর ধরে ফিরে আসবো। বলা যায় না, সময়ের আগে পৌঁছে যেতে পারে ওরা,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো জনি। দশ পাউণ্ডের বিশটা নোট রাখলো টেবিলে। 'বাকি অর্ধেক কাজ হলে, ঠিক আছে, বুড়ো খোকা?'

টাকাগুলো তাড়াতাড়ি পকেট ভরে ফেললো গুডউইন। 'একশো বার ঠিক আছে, মিঃ জনি। ধন্যবাদ, মিঃ জনি। আপনি যেভাবে বললেন ঠিক সেভাবেই সব কাজ হবে।'

'তা না হলে চলবে কেন,' বলে ঘুরে দাঁড়ালো জনি, তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ক্রাচে ভর দিয়ে সিঙ্কের পাশে কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো গুডউইন, কবাট খুলে ভেতর থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করলো। আলোর সামনে ধরে দেখলো বোতলে ইঞ্চি

ধেড়েক হুইস্কি রয়েছে। বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিলো সে। যে-টুকু আছে এক ঢোকে গিলে ফেলে বোতলটা ছুঁড়ে দিলো এক কোণে। টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। আসুক ওরা।

পাথুরে জেটির কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো জনি, লাফ দিয়ে পড়লো গোল্ডেন সানের ডেকে। জেটির মাথায় নগ্ন একটা বালব থেকে হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে, পিচ্ছিল হয়ে আছে ভিজে ডেক, সাবধানে পা ফেলে এগোলো সে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নামার সময় ব্যস্ত হাতে খুলে ফেললো রেইনকোটটা। সময় কম, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

প্যাড লাগানো বেঞ্চের তলায় হাত গলিয়ে একটা লকার খুললো সে, ভেতর থেকে অ্যাকুয়ালাং সহ কয়েকটা স্কিন-ডাইভিং ইকুইপমেন্ট বের করে সেন্টার টেবিলে রাখলো।

এরপর ডেকে হাঁটু গেড়ে নিচু হলো জনি, খালি লকারের পিছনের দেয়াল হাতড়ে বোতাম টিপে দিতেই ক্লিক করে আওয়াজের সাথে খুলে গেল একটা গোপন কম্পার্টমেন্ট। ভেতরে খড় ভর্তি বাক্সে একটা স্টার্লিং সাব-মেশিন গান, দুটো অটোমেটিক রাইফেল, কয়েকটা গ্রেনেড, আর ছ'টা লিমপেট মাইন রয়েছে।

একটা মাইন বের করে চেক করলো জনি। হাত ঘড়িতে সময় দেখলো, দশটা বাজতে চলেছে। মাইনের টাইম সুইচটা পুরো এক পাক করে মোট চারবার ঘোরালো সে। তারপর আণ্ডার-অয়্যার বাদে বাকি সব কাপড়চোপড় খুলে ফেললো। অ্যাকুয়ালাং

পরে বেরিয়ে এলো ডেকে।

এক হাতে বুকের কাছে লিমপেট মাইন ধরে রেইল টপকে পানিতে নামলো জনি। কনকনে ঠাণ্ডা পানি, কিন্তু গ্রাহ্য না করে পানির তলা দিয়ে বোটের পিছন দিকে এগোলো সে।

জেটির নগ্ন বালব থেকে খুব কম আলো নামছে পানির তলায়, তবু ঝাপসাভাবে হলেও হাত দুটো দেখতে পেলো জনি। প্রপেলারের কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিয়েছে সে। লিমপেট মাইনের শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেট ইস্পাতের খোলে শক্তভাবে আটকে গেছে। মাস্কের ভেতর মিটিমিটি হাসি দেখা দিল জনির মুখে। কাজটা শেষ করে সন্তুষ্ট বোধ করলো সে।

ডেক পেরিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে যাবার সময় একটা আওয়াজ শুনে থমকে গেল জনি। বাঁক নিয়ে ইয়ার্ডের দিকে ঘুরলো একটা ভ্যান, কাঠের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। আলো নিভলো, বন্ধ হলো ইঞ্জিন। আর কিছু দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো না জনি, তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো সেলুনে।

স্কিন-ডাইভিং ইকুইপমেন্ট লকারে তুলে রাখলো সে, ব্যস্ত হাতে কাপড় পরলো, গায়ে রেনকোট চড়াতে চড়াতে বেরিয়ে এলো ডেকে। শুনতে পেলো, জেটি ধরে কারা যেন এগিয়ে আসছে। রেইল টপকে লাফ দিলো সে, তীরে উঠে অন্ধকারে মিশে গেল।

ফোর্ডের ইঞ্জিন বন্ধ করার পর নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মতো

বাজলো রানার কানে। চারদিকে অন্ধকার, ছাদের ওপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। 'রাস্তার শেষ মাথা?' অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো ও।

'দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বর জায়গাটার কথা ভুলে গেছে,' মন্তব্য করলো সলোমন। ঠিক তখনই আলোকিত জানালার পাশে খুলে গেল দরজা, ক্রাচে ভর দিয়ে পোর্চে বেরিয়ে এলো গুড-উইন।

'কে ওখানে?'

গাড়ি থেকে নেমে সামনে বাড়লো রানা, পাশে থাকলো সলোমন, দু'পা পিছনে রোয়েনা। ধাপের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো ছোট্ট দলটা। 'আমরা ব্যবিলনে পৌছুবার চেষ্টা করছি,' বললো রানা। 'শুনলাম আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো গুডউইন। ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে থাকলো। কে এই সুদর্শন যুবক? কি তার অপরাধ? প্রশ্নগুলো তাকে বিচলিত করে তোলার আগেই ঝেড়ে ফেললো মন থেকে। এতোসব জেনে আমার কি লাভ? জনি আমাকে টাকা দেয়, জনি আমার দ্বিতীয় ঈশ্বর। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'আপনারা বরং ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলো গুডউইন, স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো বড় করে। ভেজা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। চোখে কৌতূহল নিয়ে একে একে তিনজনের দিকে তাকালো। বাকি দু'জন কে? প্রথমজনের সাথে কোনো মিল নেই ওদের।

'আমি কোনো খবর পাইনি,' বললো সে। 'কারো আসার কথা থাকলে ওরা আমাকে বেশ কিছুক্ষণ আগে জানায়।'

'আমরা স্পেশাল,' বললো রানা। 'আপনাকে জানাবার সময় হয়নি।'

চেহারায় সন্দেহ ফুটিয়ে তুলে কাঁধ ঝাঁকালো গুডউইন। 'কি জানি! বোট অবশ্য তৈরি হয়ে আছে—বরাবর তাই থাকে। কিন্তু আপনারা···ঠিক বুঝতে পারছি না। এদিকে কাল রাতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছি, হাঁটাচলা করতেই জান বেরিয়ে যাচ্ছে, লয পিয়েরে-তে যেতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'লয পিয়েরে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কোথায় সেটা?'

'অ্যালডারনে-র বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, চ্যানেল আই-ল্যাণ্ডস-এ,' বলে উঠলো সলোমন। তার দিকে অবাক হয়ে তাকালো রানা। 'তুমি ভুলে যাচ্ছো, নাহিদ। নেভী থেকে বেরিয়ে এসে চ্যানেলেই তো ব্যবসা করতাম আমি। নিজের হাতের রেখাগুলোর মতোই সমস্তটা চিনি আমি।'

'উনি ঠিক বলেছেন,' বললো গুডউইন। 'জায়গা তেমন কিছু না। মাইলখানেক লম্বা, এক দিকে পাহাড়ের পাঁচিল তিন চার শো ফিট উঁচু। একটাই সম্ভাব্য অ্যাংকোরেজ, দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। পুরনো একটা জেটি আছে। ব্যস, আর কিছু না।'

'তোমাকে টাকা দেয় কে?'

'জনি নামে এক লোক। দু'তিন মাসে এক-আধবার আসে, বেশিরভাগ সময় কথা হয় টেলিফোনে।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে তাকালো সে। 'আশ্চর্য, আপনাদের ব্যাপারটা

আমাকে সে জানালো না কেন!'

'জানাবে,' বললো সলোমন। 'আর, তোমার টাকাও তুমি পেয়ে যাবে। কথা দিচ্ছি। বোটটা কি ধরনের?'

'মটর ক্রুজার—গোল্ডেন সান। ত্রিশ ফুটি, একেরবুন তৈরি করেছে। টুইন স্ক্রু, স্টীল হাল।'

চেহারায় প্রশংসার ভাব নিয়ে সলোমন বললো, 'বোট বটে একখানা! পাওয়ার?'

'পেনটা পেট্রল ইঞ্জিন। ম্যাক্সিমাম টোয়েনটি-টু নট স্পীড। তবে, আজ রাতে নয়। আবহাওয়া তেমন সুবিধের মনে করি না।'

'রিপোর্ট কি বলে?'

'উইণ্ড ফোর্স থ্রি টু ফোর। ঝমঝম বৃষ্টি। সকালে কুয়াশা।'

'কোনো ব্যাপারই নয়।'

সলোমনের দিকে তাকালো রানা। 'সামলাতে পারবে তো?'

'কি বলছো! ওটা নিয়ে আমি আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারি।'

'কাজটা ভারি কঠিন হবে, মিস্টার,' মাঝখান থেকে বললো গুডউইন। 'ওটার রেঞ্জ মাত্র ছয়শো মাইল, রিজার্ভ ট্যাংকস।'

নিঃশব্দে হাসলো সলোমন। 'যথেষ্ট, তারপরও দু'চারটে দ্বীপে ঢুঁ মারা যাবে। তুমি একেবারে ঝামেলা মুক্ত হয়ে গেলে। ঘরে বসে পায়ের যত্ন নাও।'

ইতস্তত করতে লাগলো গুডউইন। 'কি করবো বুঝতে পারছি না। বোটটা তো আমার নয়, মিঃ জনির।'

হাত বাড়িয়ে গুডউইনের কাঁধ খামচে ধরলো সলোমন, ঝুঁকে শ্বাস টানতেই হুইস্কির গন্ধ পেলো সে। গুডউইনকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে হোফার টুইডের মানিব্যাগটা বের করলো। পাঁচ পাউণ্ডের দুটো নোট টেবিলে রেখে বললো, 'আসার সময় রাস্তার ধারে একটা পাব দেখলাম। বাজি রেখে বলতে পারি, চেষ্টা করলে এই পা নিয়েও ওখানে তুমি পৌঁছতে পারবে।'

টাকাগুলো হাতে নিয়ে ইতস্তত করতে লাগলো গুডউইন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে ভরলো। 'ঈশ্বর জানেন, কোনো বিকল্প নেই,' দেরাজ খুলে ভেতর থেকে এক কপি চ্যানেল পাইলট বের করলো সে। 'আপনাদের পথে তিনটে আলো পাবেন, এক লাইনে রেখে এগোলে পথ ভুল হবে না।'

বইটা তুলে নিয়ে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'আমরা অপেক্ষা করছি কেন?'

ওদের পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, কেঁপে উঠলো কাঠের ঘর। চেয়ারে বসে সিলিঙের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো গুডউইন, তার মুখটাকে মাঝখানে রেখে একটা নীল মাছি ভন ভন করে উড়ে বেড়াতে লাগলো। খানিক পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সেগুলোর দিকে। ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে, ক্রাচে ভর দিয়ে দরজার দিকে এগোলো। এক ঢোক মদ খাওয়া দরকার, কিংবা এক বোতল। অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে ওদের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে জানে সে। ভুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে। শুধু ওদেরকে নয়, মিঃ রানিকেও।

আট

জেটির মাথায় গোল্ডেন সানের বো দুলছে। লম্বা, ঢালু ডেক হাউসের দিকে তাকিয়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল সলোমনের মনে। নতুন খেলনা পাওয়া শিশুর মতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। 'মাই গড, আমার তর সইছে না! এরকম একটা বোট পেলে আর চাই কি!'

মাথা নাড়লো রানা। 'ব্যাপারটা খুব সহজে মিটে গেল।'

'মানে? কিসের কথা বলছো তুমি?'

'বাধা তো দিলোই না, বরং আমাদের সাহায্য করলো গুড-উইন। মেলে না, সলোমন। আমি বরং একবার দেখে আসি মাতাল বনমানুষটা কি করছে।'

'তোমার খুশি,' বললো সলোমন। 'আমি কিন্তু নোঙর তোলার জন্যে তৈরি হচ্ছি। দশ মিনিট, তার বেশি দেরি করলে আমাকে পাবে না।'

রানা জানে, সলোমন তাই করবে, তবু তর্ক করে সময় নষ্ট

করলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো, অন্ধকার বোটইয়ার্ডের দিকে হারিয়ে গেল।

পরিষ্কারভাবে কিছু ধরতে না পারলেও, গুডউইনের ইতস্তত আচরণ রানার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। কথাগুলো যেন মুখস্থ বলে গেছে লোকটা।

গুডউইনের উদ্দেশ্য কি জানা দরকার, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেডের সাথে যোগাযোগ করা। দ্বীপে পৌছুবার পর প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিপদকে ভয় পায় না ও, কিন্তু বিপদ কাটাবার জন্যে আগে থেকে সাবধান না হওয়াটা মস্ত বোকামি হবে। সম্ভবত রাস্তার শেষ মাথায় পৌছে গেছে ওরা। পেলে এখানেই পাওয়া যাবে হাসানের খবর। হয়তো কাউন্টের সাথেও দেখা হবে।

ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে এগোলো রানা, তারপর অন্ধকার ছায়ায় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটু পর নিচু ঝোপের আড়ালে বসে পড়লো ও, ক্রাচে ভর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে গুডউইন।

মাথা নিচু করে হাঁটছে লোকটা। রানাকে পাশ কাটিয়ে গেল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিলো রানা। গ্রামে একটা মাত্র পাব, ভেতরে ঢুকে গেল গুডউইন। রানা থামলো না, মোড় পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ঢুকলো টেলিফোন বক্সে।

রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় ডায়াল করতেই সাড়া পাওয়া গেল সোহানার। মাত্র দু'চারটে কথা হলো।

'তুমি ভালো ?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'আছি। হটলাইন ?'

'রেডি। কথা বলো।'

তারপরই উইলিয়াম ম্যানফ্রেডের গলা পেলো রানা। 'মিঃ রানা ? কোথায় আপনি ?'

'আপটন মাগনা—লুলওয়ার্থ-এর কাছে ছোটো একটা ফিশিং পোর্ট। টেপ রেকর্ডার অন করুন। এখুনি আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি, যাবো লয় পিয়েরে নামে একটা দ্বীপে। অ্যালডারনে থেকে বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এ। জায়গাটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানতে চাই, তিন মিনিটের মধ্যে।'

'কমপিউটরের সাথে এরইমধ্যে কানেকশন দেয়া হয়েছে,' বি. এস. এস. চীফ বললেন। 'উত্তর আসার আগে আর কি বলবেন, বলুন।'

'ওয়াইকেহেড ফার্ম, ওর্কশায়ার-এর কাছে সেট্‌ল-এ হোফার টুইড নামে এক লোক আছে। আল্লাই জানে ওখানে কতো লোককে কুয়াটায় ফেলেছে সে। হাড়গুলো হয়তো উদ্ধার করতে পারেন। এরপর রুথ ব্ল্যানশি, বুড়ি মহিলা। শ্রুজবারি-র কাছে বাম্পটনে থাকে সে, আলমা কটেজে। বুড়ির জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু জড়িয়ে পড়া তার উচিত হয়নি।'

'আর কেউ ?'

'এড নিকলস। লং ব্যারো হাউস অভ রেস্ট নামে তার একটা ক্রেম্যাটরিয়াম আছে। গ্লস্টারের কাছে। তারপর, রবার্ট

গুডউইন। এখানে একটা বোটইয়ার্ড চালায়।'

রানা থামতেই ম্যানফ্রেড বললেন, 'আপনার ইনফরমেশন আসতে শুরু করেছে। লয় পিয়েরে দ্বীপটার মালিক হলো স্টেটস অভ গুয়ের্ণসি। লিজ নিয়েছে, দু'বছরের জন্যে, কাউন্ট মাভো বুয়ার্দ। দ্বীপে একটাই বাড়ি।'

'নামটা আগে কখনো শুনেছি নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'পরিচিত নাম?'

'সম্ভবত শুনেছেন। শুধু মিলিয়নস পাউণ্ডের প্রজেক্টে ফাইন্যান্স করেন ভদ্রলোক। ট্যাক্স, লাইসেন্স, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট, ইত্যাদি নিয়ে প্রায়ই ঘাপলা করেন। ফ্রড স্কোয়াড বেশ কয়েকবারই ইনভেস্টিগেশন চালিয়েছে, তবে গভীর জলের মাছ বলে নাগাল পাওয়া যায়নি। নিজে কিছুই করেন না, সমস্ত কিছু বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে চালান। শোনা যায়, পঞ্চাশজন ম্যানেজার বা সেক্রেটারী আছে তাঁর, কারো বেতন দশ হাজার পাউণ্ডের কম নয়। আরো গুজব, তারাও সবাই নাকি কাউন্ট বুয়ার্দকে দেখেনি কখনো। ভদ্রলোকের অনেক ফার্মের একটা ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট, তিনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ-সব আপনার কাজে লাগবে?'

'ওখানে না পৌঁছে বলতে পারছি না। আমার সাহায্য দরকার হতে পারে, চাওয়ার সাথে সাথে পেতে হবে। খুব ছুটতে পারে এমন এক জোড়া ন্যাভাল এম. টি. বি. হলে ভালো হয়। সম্ভব?'

'এখুনি আমি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের সাথে কথা বলছি,'

ম্যানফ্রেড বললেন। 'আপনি যদি ওগুলোর সাথে রেডিওতে কথা বলতে চান, সাধারণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করবেন। আপনার কল সাইন হবে—টপ মোস্ট। বেস্ট অভ লাক, মিঃ রানা। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফোন বক্স থেকে বেরিয়ে বোটইয়ার্ডের দিকে ফিরে চললো রানা। ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে, হঠাৎ আলোকিত জানালায় একটা ছায়া পড়তে দেখে স্যাঁৎ করে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলো ও। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এলো এক লোক। দেখেই তাকে চিনতে পারলো রানা—ডঃ টেনিসন ওরফে জনি।

রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক তাকালো জনি, আপনমনে মিটিমিটি হাসছে।

পকেট থেকে নিকলসের পিস্তলটা বের করলো রানা।

বোটইয়ার্ডের দিকে এগোলো জনি। রানাকে পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর দাঁড়ালো, কাঠির মাথায় জ্বলে উঠলো বারুদ, সিগারেট ধরিয়ে আবার হাঁটতে থাকলো সে। তার পিছনে উঠে দাঁড়ালো রানা, দ্রুত পায়ে চলে এলো পিঠের কাছে। জনির খুলির নিচে নরম মাংসে পিস্তলের মাজ্‌ল্ ঠেকালো ও। 'সেই যে রাস্তার ওপর ছেড়ে দিলে, তারপর একদম খবর নেই। কেমন আছো, জনি?' মাজ্‌ল্‌টা সরিয়ে নিলো রানা। জনি ঘুরতে যাবে, পিস্তলটা উল্টো করে তার চাঁদিতে বাড়ি মারলো ও।

পড়ে যাচ্ছিলো জনি, ধরে ফেলে ডান কাঁধে তুলে নিলো রানা। ঠিক সেই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠে রাতের নিস্তব্ধতাকে

ভেঙে খান খান করে দিলো গোল্ডেন সানের ইঞ্জিন। কাঁধে বোঝা নিয়ে অন্ধকার জেটির দিকে ছুটলো রানা।

ধাপ বেয়ে গোল্ডেন সানে নামছে রানা, নোঙর তোলা বাদ দিয়ে ছুটে এলো সলোমন, কাঁধ থেকে বোঝা নামাতে সাহায্য করলো রানাকে। 'মাইরি বলছি, আমি পাগল হয়ে যাবো!' হাত-পা ছড়িয়ে ডেকে পড়ে থাকা জনির দিকে চোখ রেখে বললো সে। 'আমাদের পুরনো দোস্ত ডাক্তার টেনিসন না?'

'নিশ্চয়ই আরো অনেক নাম আছে ওর,' বললো রানা। 'গুড-উইনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তুলে নিয়ে এলাম। ভাবলাম দ্বীপটা সম্পর্কে হয়তো কিছু বলতে পারবে।'

'আপাততঃ একটা কেবিনে রাখো,' পরামর্শ দিলো সলোমন। 'পরে কথা বলানো যাবে। আগে আমি এই জায়গা থেকে কেটে পড়তে চাই। রোয়েনা সাহায্য করবে তোমাকে।'

জনির পা ধরলো রোয়েনা, তার বগলের নিচে হাত গলিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে চললো রানা। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে এলো নিচে। তিনটে কেবিনের একটায় ঢোকানো হলো তাকে, বাঙ্কে শুইয়ে দিয়ে দুই গোড়ালি আর দুই কব্জি এক করে বাঁধা হলো কর্ড দিয়ে।

দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুরলো রানা, রোয়েনার ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মায়া লাগলো। একের পর এক ধকল সামলে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মেয়েটা। তার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো রোয়েনা। জোর করে হাসলো একটু।

'না,' মাথা নিচু করলো সে। 'মিঃ নাহিদ?'

'কিছু বলবে?'

'না,' বলেই ওপর নিচে মাথা দোলালো রোয়েনা। 'হ্যাঁ,' ঢোক গিললো একটা।

'এ-ধরনের অনুভূতি আমার আগে কখনো হয়নি,' নিচু গলায় বললো রোয়েনা। 'মানে, এই প্রথম; আমার জীবনে আগে কখনো কোনো পুরুষ আসেনি।'

রানা তাকিয়ে থাকলো। কিছুই ওর বলার নেই। বললেও রোয়েনা বুঝবে না। বা শুনবে না।

'আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারছি না,' রানার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ালো মেয়েটা। 'লাশ পোড়ানোর ঘরে নিকলসকে ও কি বললো জানেন? বললো, ওর ব্যাপারে নিকলস নাকি ভুল করছে। অথচ আমিও সেখানে ছিলাম। আমার যেন মনে হলো, শুধু নিজের জন্যে নিকলসকে অনুরোধ করছিল ও। যেন আমার ভালো-মন্দে ওর কিছু আসে যায় না। নাকি ভুল হয়েছে আমার?'

'এখন এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়,' বললো রানা। 'বুঝতেই পারছো, বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা। তবে, আমি যতোটুকু বুঝি, সম্ভব হলে সম্পর্কটাকে হালকা করে দেখতে চেষ্টা করো। মনে রেখো, মানুষের সব আশা পূরণ হয় না।'

আহত দৃষ্টি মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো রোয়েনা।

অস্বস্তি বোধ করলো রানা। বললো, 'গ্যালিটা খুঁজে বের করতে পারবে? আমাদের সবাইকে একটু কফি খাওয়াও না।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে প্যাসেজওয়ে ধরে চলে গেল মেয়েটা। চিন্তিতভাবে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। কে জানে কি আছে মেয়েটার ভাগ্যে। ঘটনার শেষটা যেরকমই হোক, বিরাট একটা আঘাত পেতে যাচ্ছে বেচারি। শুধু যে মন ভাঙবে তাই নয়, তার কোনো আশ্রয়ও নেই।

কিন্তু আমি থাকতে মেয়েটা পানিতে পড়তে পারে না, নিজে-কে স্মরণ করিয়ে দিলো রানা। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে, নেভিগেশন লাইটের আলো গায়ে মেখে রূপালি পারদের মতো হয়ে উঠেছে ফোঁটাগুলো। হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে নিঃশব্দে হাসলো সলো-মন। মহাফুর্তিতে আছে সে।

'এই আমরা রওনা হলাম,' বলে হঠাৎ করে পাওয়ার বাড়িয়ে দিল সলোমন, জ্যান্ত ইঞ্জিন শক্তি পেয়ে গর্জে উঠলো। বড় একটা ইউ টার্ন নিয়ে হারবারের মুখের দিকে ছুটলো গোল্ডেন সান।

ঢেউ আর স্রোতের মধ্যে পড়তেই কাত হয়ে গেল মাস্তুল, জলোচ্ছ্বাস ঝাপটা মারলো জানালায়। স্টারবোর্ডের দিকে একটা স্টীমারের লাল আর সবুজ নেভিগেশন লাইট দেখা গেল। স্পীড দশ নটে নামিয়ে আনলো সলোমন, অন্ধকারের ভেতর ছুটে চললো গোল্ডেন সান।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ব্লাডি মার্ভেলাস!' সলোমনের কণ্ঠস্বর উল্লাসে অধীর। 'এরই

নাম জীবন, কি বলো? এখন শুধু কাউন্টের সাথে দেখা হলেই পাওনাটা বুঝে নিতে পারি। তারপর আমাকে আর পায় কে!'

রাত বারোটার দিকে জনির সাথে কথা বলার জন্যে নিচে নামলো রানা। দরজা খুলে আলো জ্বাললো, ঘুরে দাঁড়াবার আগেই মাথার পিছনে কালো একজোড়া চোখের দৃষ্টি অনুভব করলো ও।

'তোমাদের জন্যে একটা সুখবর ছিলো,' রানা ঘুরতেই বললো জনি।

গুরুত্ব না দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছো?'

'যেমন রেখেছো,' ঝাঁঝের সাথে বললো জনি। 'মাথার খুলি ভেতর দিকে ডেবে গেছে, আমার সবচেয়ে ভালো শার্টটা রক্তে ভিজে যা তা অবস্থা!'

'আর বলো না, কেঁদে ফেলবো,' দু'হাত দিয়ে ধরে জনিকে বসালো রানা। হাতের বাঁধন খুলে দিল। রোয়েনার হাত থেকে কাপটা নিয়ে বাড়িয়ে দিলো। 'এটুকু খেয়ে নাও।'

কয়েকটা চুমুক দিলো জনি। 'যাই বলো, চায়ের কোনো বিকল্প নেই। আমার ধারণা, চ্যানেল ধরে এগোচ্ছি আমরা?'

'তোমার ধারণা নির্ভুল।'

'ক'টা বাজে?'

'এই ধরো বারোটা—কেন?'

হাসিটা জোরেই শুরু করলো জনি, পরমুহূর্তে ব্যথায় বিকৃত হলো চেহারা, তবু জোর করে হাসতে লাগলো। 'তারমানে

ফেরার আর কোনো পথ নেই—পয়েন্ট অভ নো রিটার্নে পৌঁছে গেছি।'

'কি বলতে চাও?'

'ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলতে পারো,' দুর্বল হাসি জনির ঠোঁটে। 'তোমরা যে আপটন মাগনা-য় আসছো, আমি জানতাম। তোমরা চলে আসার পর এড নিকলসের সাথে দেখা করি আমি।'

'এবং আপটন মাগনায় তুমি আমাদের আগে পৌঁছাও। গুডউইন আমাদের সাথে অভিনয় করছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। ঠিক দশটার পরপরই গোল্ডেন সানের খোলে আমি একটা লিমপেট মাইন আটকে দিয়েছি। চার ঘণ্টা পর ফাটার কথা। তারমানে তোমাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'তুমি···তোমার?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার জন্যে ব্যাপারটা বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে,' জনির চেহারা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

জনির গোড়ালি থেকে কর্ড খুলে নিয়ে রানা বললো, 'ডেকে চলো। তাড়াতাড়ি।'

ওরা যেন নাগরদোলায় চড়েছে—একটা করে দশ-বারো ফিট উঁচু ঢেউ ছুটে এসে বোটকে তুলে নিচ্ছে মাথায়, পানির ঢাল বেয়ে পরমুহূর্তে নামিয়ে দিচ্ছে গভীর খাদের তলায়, তারপর আরেকটা ঢেউ ছুটে আসছে, এভাবেই চলছে সারাক্ষণ। জলোচ্ছ্বাস এখন শূন্যে ভাসমান চাদরের মতো, ডেকের গায়ে আছাড়

খেয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি হচ্ছে। জনিকে নিয়ে হুইলহাউসে ঢুকলো ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সলোমন। রানার সামনে জনিকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। 'ও এখানে কেন?'

রানার মুখে খবরটা শুনে কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সলোমন, কিন্তু চেহারা থেকে অনিশ্চিত ভাবটা লুকাতে পারলো না। 'ওর কথা তুমি বিশ্বাস করতে বলো? শালা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকালো জনি। 'বিশ্বাস করাবার জন্যে আমি কারো পায়ে ধরে কাঁদছি না,' মিটিমিটি হাসছে সে।

মাথা নাড়লো রানা। 'কথাটা সত্যি, সলোমন।'

রানা আর জনির পিছন থেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো রোয়েনা।

'এই মাগী, চুপ কর!' খেঁকিয়ে উঠলো সলোমন। 'এমন মার মারবো···।'

কান্না থামালো রোয়েনা। ধরা গলায় বললো, 'আমি তোমার কথা ভেবে কাঁদছি, জো। তোমাকে আমি হারাতে পারবো না···।'

থ্রটল টেনে নিচু করলো সলোমন, বোটের স্পীড তিন কি চার নটে নামিয়ে আনলো। অটোমেটিক পাইলটের সুইচ অন করে পুরোপুরি ওদের দিকে ঘুরলো সে। রানার নিঃশব্দ ইঙ্গিত পেয়ে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল রোয়েনা, চোখ মুছতে মুছতে।

'বেশ, করলাম বিশ্বাস,' বললো সলোমন। 'এখন তাহলে কি করা?'

'খোলে আটকেছো, তার মানে অ্যাকুয়ালাং আর স্কিন-ডাই-

ভিং গিয়্যার ব্যবহার করেছো তুমি। কোথায় সেগুলো?'

কাঁধ ঝাঁকালো জনি। 'আমি না বললেও ওগুলো তুমি খুঁজে পাবে। সেলুনে আছে—বেঞ্চের তলায় একটা লকারে।'

'তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল, নাহিদ!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো সলোমন। 'ওটার কাছে পৌছুতে পারলে ডিফিউজ করা পানির মতো সহজ।'

'হতাশ করার জন্যে দুঃখিত,' বললো জনি। 'শুধু যদি ওটাকে খোল থেকে তোলা যায় তবেই ডিফিউজ করা যাবে, কিন্তু তোলার মতো ক্যাসিলিটি বা ইকুইপমেন্ট নেই এখানে।'

'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, তাই না?' প্রশ্ন করলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো জনি। 'ইস্পাতের খোল, কাজেই খুঁচিয়ে ওটাকে তোলা যাবে না। বেশি চেষ্টা করতে গেলে সময়ের আগেই হয়তো ফেটে যাবে।'

'কি ধরনের লিমপেট ওটা?'

'হঠাৎ আমরা টেকনিক্যাল ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছি, তাই না? কিন্তু কোনো লাভ নেই। ওহ-হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি তো আবার স্থল বাহিনীর লোক—ভাড়াটে সৈনিক ছিলে।'

চোখ পাকিয়ে জনিকে মারতে এলো সলোমন। 'প্যাচাল পাড়বি না। যা জিজ্ঞেস করছে উত্তর দে।'

সলোমনের বুকে একটা হাত ঠেকিয়ে বাধা দিলো রানা। জনিকে বললো, 'আমি শুধু সামরিক বাহিনীর লোক ছিলাম না, নৌবাহিনীর লোকও ছিলাম। পানিতেও যুদ্ধ করেছি।'

'ম্যার্টিনেট মার্ক ফোর,' বললো জনি।

বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, এরকম অট্টহাসি শেষ কবে হেসেছে মনে পড়ে না রানার। পরম স্বস্তির ঢেউ উঠলো শিরায় শিরায়, বিপুল উচ্ছ্বাস দমিয়ে রাখা গেল না।

'ব্যাপারটা কি? কার হাসি কে হাসে?' থতমত খেয়ে গেছে জনি।

'বলতে পারো তোমার দুর্ভাগ্য, আরো কিছু সময় বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে,' বললো রানা। সলোমনের দিকে ফিরলো ও। 'মিনিট দশেকের জন্যে বোট থামাও, অ্যাকুয়ালাং পরে পানিতে নামবো আমি।'

'তারমানে কি মাইনটা তুমি ডিফিউজ করতে পারবে?'

'কেন পারবো না? ফিরে আসি, তখন ব্যাখ্যা করবো। তুমি শুধু বাঁদরটার দিকে লক্ষ্য রেখো।' হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল ও।

অন্ধকার পানি ভয়ানক ঠাণ্ডা, খোলের গা ঘেঁষে স্টার্নের দিকে এগোলো রানা। বিশেষ খুঁজতে হলো না, খানিক হাতড়াতেই পেয়ে গেল মাইনটা। টাইম সুইচে আঙুল রেখে কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকলো ও, তারপর সুইচের চারদিকে আঙুল বুলালো। জনি যদি চার ঘণ্টা পর বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়ে থাকে, মোট তাহলে চার পাক সুইচটা ঘুরিয়েছে সে। সর্বমোট বারো বার ঘোরানো যেতে পারে, অর্থাৎ ইচ্ছে করলে সময়টা আট ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে পারে রানা।

ধীরে ধীরে সুইচটা ঘোরাতে শুরু করলো ও। সেই সাথে গুণতে থাকলো। এক সময় আটকে গেল সুইচ, আর ঘুরবে না। খোলের গায়ে পায়ের ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে এলো রানা, মাথা তুললো পানির ওপর।

সলোমন আর রোয়েনা রেইলের ওপর দিয়ে উঠতে সাহায্য করলো ওকে। রোয়েনা ওর বাঁ হাত ধরেছে, হাতটায় একটু বেশি টান পড়ায় ব্যথা পেলো রানা, ঝনঝন করে উঠলো সারা শরীর।

'কি হলো, নাহিদ?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলো সলোমন।

'কিছু না,' এড়িয়ে গেল রানা। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে জনির দিকে তাকালো ও। জনির হাত দুটো সামনে, কর্ড দিয়ে বাঁধা। 'জানলে পানির মতো সোজা। মার্টিনেট অল্প মেয়াদের টাইম বোমা। শুধু নেভী নয়, আর্মিও ব্যবহার করে। টাইমিং ডিভাইসের দৌড় ম্যাক্সিমাম বারো ঘন্টা। প্রায় কিছুই করতে হয়নি, আমাকে। সুইচটা ঘুরিয়ে নিউট্রাল জোনে উঠিয়ে দিয়েছি।'

'তারমানে ওটা আর ফাটবে না?'

'নিশ্চিত থাকো, বিস্ফোরণে মারা যাচ্ছি না আমরা।'

'কতো কিছুই না শেখার বাকি থাকে,' বললো জনি। 'লয পিয়েরেতে কখন আমরা পৌঁচাচ্ছি?'

'সাড়ে সাতটা—একটু আগে বা পরে,' বললো সলোমন। 'কেন?'

'স্রেফ তর সইছে না,' বললো জনি, মিটিমিটি হাসিটা আবার

ফিরে এসেছে তার ঠোঁটে। 'আমার ধারণা সবার জন্যেই ওখানে মস্ত একটা হাসির অ্যাটম বোম অপেক্ষা করছে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নেমে গেল সে, নিচ থেকেও তার শিসের শব্দ শুনতে পেলো ওরা।

নয়

কাঁধে ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ মেলে দেখলো, ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে রোয়েনা। সেলুনের একটা লম্বা বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। মেঝেতে পা নামিয়ে উঠে বসলো, রোয়েনার হাত থেকে ধূমায়িত কাপটা নিয়ে চুমুক দিলো কফিতে। 'ধন্যবাদ, রোয়েনা। ক'টা বাজে বলো তো?'

'ছ'টা।'

'গড, এতোক্ষণ ঘুমিয়েছি!'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এলো রানা, এক হাতে কফির কাপ। স্টারবোর্ডের দিকে, রেইলের বাইরে নাচানাচি করছে সাগর, মাঝে মধ্যে লাফ দিয়ে ডেকে আছড়ে পড়ছে ফেনাসহ। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সেই সাথে ঝাপটা দিচ্ছে বাতাস। বার বার স্টারবোর্ডের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে ডেক, রেইল ধরে তাল রাখতে রাখতে হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে একবার দেখলো সলোম।।

'কেমন ঘুমালে?' ক্ষীণ অভিযোগের সুরে জানতে চাইলো সে।
'হাতের ব্যথাটা বেড়েছে,' বললো রানা। 'তবে ব্যবহার করতে পারবো। এবার তুমি খানিক বিশ্রাম নিতে পারো।'
'আমি আসলে সময়টা দারুণ উপভোগ করছি। ঘন্টাখানেক হলো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে সাগর। শান্ত হবার আগে আরো খানিক অশান্ত হবে বলে মনে হয়।'
'তাতে আমাদের পৌঁছুতে কতটা দেরি হবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।
'তুমি একটু হুইলটা ধরো, চার্ট দেখে বলছি।'
পাইলটের সিটে বসলো রানা, সলোমন চার্ট-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দু'একটা হিশেব কষে পেন্সিলটা রেখে দিলো সে, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। 'আরো বৃষ্টি-হয় আগে পৌঁছুবো আমরা। অবশ্য নির্ভর করছে আবহাওয়া বদলায় কিনা তার ওপর। কিছুক্ষণ সামলাতে পারবে তো?'
'না পারার কি আছে।'
'আসছি, দেখি রোয়েনা আমাকে কিছু খেতে দিতে পারে কিনা। পরে আমরা আলাপ করবো, কেমন?'
ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা।
'কিসের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি এখনো আমরা জানি না, নাহিদ,' বললো সলোমন। 'আমার মনে হয় জনির পেটে পা দিলে কিছু বেরুবে।'
মাথা ঝাঁকালো রানা। 'দেখা যাক।'
পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সিটে হেলান দিলো রানা।

হুইলে একটা হাত রেখে সিগারেট ধরালো ও। এরইমধ্যে অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করেছে। পানির শেষ প্রান্তে আলোর ক্ষীণ একটু আভা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো রানা, যেন এরপর কি ঘটবে দেখার চেষ্টা করছে।

একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য যতো বিপদই আসুক, সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে জো সলোমন। লোকটাকে দেখার আগে থেকেই পছন্দ হয়নি রানার। ডোশিয়ে পড়েই লোকটা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মায় মনে। দেখার পর সে ধারণা বদলায়নি, বরং আরো দৃঢ় হয়েছে। ফ্রাইডেথর্প জেলখানার কথা মনে পড়লো। একই সেলে ছিলো ওরা, ধীরে ধীরে কৌশলে সলোমনের বিশ্বাস অর্জন করেছে ও। খবরের কাগজ আর বিনোদন পত্রিকাগুলোয় তার সম্পর্কে যাই বলা হোক, আসলে সলোমন রবিন হুড নয়। নিজের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বন্ধুত্ব, চক্ষুলজ্জা, ভালোবাসা, একসাথে সব বিসর্জন দিতে পারে সে।

মেয়েটিকে নিয়েই ভয় রানার। সলোমন যে কতোটুকু নিষ্ঠুর হতে পারে রোয়েনার সে ধারণা নেই।

পাঁচ বছর বন্দী জীবন কাটিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে সলোমন, আবার তাকে বন্দী করার চেষ্টা হলে সামনে যাকে পাবে তাকেই কচুকাটা করবে সে।

হাসপাতালের ঘটনাটা মনে পড়লো রানার। জনির পিস্তলটা ওর হাতে পড়েছিল বলে, তা না হলে সলোমন ওকে অবশ্যই

সাথে নিতে রাজি হতো না। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, নাহিদ-কে সাথে না নিলে তারও পালানো হবে না। অথচ মেশিনশপে দু'বার মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে রানা—অন্তত গুরুতর আহত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে।

রোয়েনার কথা আবার ফিরে এলো মনে। সরল মেয়েটা যদি ওর প্রশ্নের উত্তর না দিতো বা অন্যভাবে দিতো, তাহলে হয়তো ওদের দু'জনকেই টুইডের কুয়ায় পড়ে মরতে হতো। অথচ রোয়েনাকে সলোমন রাস্তায় ফেলে আসতে চেয়েছিল। মেয়েটা কাজে আসবে, রানা এই যুক্তি না দিলে অনেক আগেই তাকে ভাগিয়ে দিতো সলোমন।

ক্রেম্যাটরিয়ামে আরেকবার সলোমনকে বাঁচিয়েছে রানা। অথচ ওকে বাদ দিয়েই বোট নিয়ে রওনা হয়ে যাচ্ছিলো সে। এমন একটা লোক, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বিবেচনার মধ্যে রাখে না। এ-ধরনের একটা লোক যদি টের পায়, রানা তাকে আবার জেলখানায় ফেরত পাঠাতে চাইছে, কী মূর্তি ধারণ করবে কল্পনা করতেও ভয় লাগে।

দ্বীপের কথা ভাবলো রানা। কি আছে ওখানে কে জানে। তেমন কোনো অস্ত্র নেই ওদের হাতে, কাউন্টের সাথে কি দিয়ে লড়বে ওরা? লড়াই যে একটা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ওদের একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে বুদ্ধি—উপস্থিত বুদ্ধি।

তবে সলোমনের ওপর ভরসা করা উচিত হবে না। ওর ভোঁতা কুবুদ্ধি কোনো কাজে আসবে না।

হাসান কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা, কিছুই জানা নেই।

হাসান হয়তো জিম্মি হয়ে আছে কাউন্টের হাতে। তা যদি থাকে, রানার প্রথম কাজ হবে তাকে উদ্ধার করা। আর সব তুচ্ছ। হাসানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট। তারপর কাউন্টকে বন্দী করতে পারলে সেটা হবে উপরিপাওনা।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা, চেহারায় বাঁধন ছেঁড়া হাসি আর বৃষ্টির পানি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো সলোমন। 'এতো আনন্দ বোধহয় জীবনে কখনো পাইনি, নাহিদ। বুঝতে পারিনি পাঁচ বছর ধরে কি হারাচ্ছিলাম! সরো, সরো, আমাকে হুইল ধরতে দাও!'

সিট থেকে উঠে এসে দরজার গায়ে হেলান দিলো রানা। পুব দিকে ঘন কালো মেঘ জমেছে, আরো খারাপ হবে আবহাওয়া। বোটের স্পীড বাড়িয়ে দিলো সলোমন। আপনমনে হাসতে লাগলো সে।

তার আনন্দে সাড়া না দিয়ে পারলো না রানা। 'একটা কথা ঠিকই বলেছো। ফ্রাইডেথর্পে কুকুরের মতো বেঁচে ছিলাম আমরা।'

'ফ্রাইডেথর্প?' মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সলোমন, যেন জায়গাটা কোথায় স্মরণ করার চেষ্টা করলো। 'তাহলে শুনে রাখো, নাহিদ। দুনিয়ার কেউ আমাকে সেখানে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। দরকার হলে আত্মহত্যা করবো আমি, এই বোট ডুবিয়ে দিয়ে হাঙরের খোরাক হবো, কিন্তু ফিরে আর যাচ্ছি না।'

নিজের অজ্ঞাতেই ভয়ংকর একটা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে

বসেছে সলোমন।

বিষণ্ণ বোধ করলো রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল ও।

রোয়েনার সাথে বসে একটা স্যাণ্ডউইচ আর এক কাপ কফি খেলো রানা। তারপর দেখতে এলো জনিকে। দেয়ালের দিকে মুখ করে বাঙ্কে শুয়ে আছে সে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরলো। আগের চেয়ে অনেক ম্লান দেখালো তাকে। মিটিমিটি হাসিটাও অদৃশ্য হয়েছে।

'কি হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো রানা, ধরে বসালো।

'সাগর আমার জন্মশত্রু,' ঢোক গিলে বমি বমি ভাবটা দূর করলো জনি। 'সী-সিকনেস।'

কেবিন থেকে তাকে বের করে আনলো রানা। প্যাসেজ হয়ে সেলুন ঢুকলো ওরা। মৃদু ধাক্কা দিয়ে জনিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো রানা। 'কফি চলবে?'

'আমরা বন্ধু হতে পারলে মন্দ হতো না,' ক্ষীণ একটু হাসলো জনি। 'কিন্তু তা নই।'

নিঃশব্দে ইঙ্গিত করলো রানা, এনামেলের মগে কফি ঢেলে বাড়িয়ে দিলো রোয়েনা। কর্ড বাঁধা দুই হাত দিয়ে মগটা ধরে মুখের সামনে তুললো জনি। 'কতোক্ষণ পেটে থাকবে জানি না —দেখা যাক।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে জনির ঠোঁটে গুঁজে দিলো রানা। 'এবার আমরা কথা বলবো।'

'তাই ? কি কথা শুনতে চাও, বুড়ো খোকা ?'
'লয় পিয়েরে-তে কি দেখবো আমরা ? কাউন্টকে পাবো ওখানে ?'
'পেলে বলবো তোমাদের কপাল মন্দ।'
'রিপ হটনকে ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে, তাই না ?'
ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালো জনি। 'এর আগেও তুমি তার কথা জানতে চেয়েছো।'
'কারণটাও পরিষ্কার,' বললো রানা। 'জন হেরিক আর রিড কোয়েনকে এতো দূর আসতে দেয়া হয়নি, মেরে কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছে। পথে যার সাথেই কথা হয়েছে, রিপ হটনকে খুন করার কথা স্বীকার করেনি কেউ। জানতে ইচ্ছে করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হলো কেন!'
'আমি জানি না।'
'কোথায় আছে তাও জানো না ?'
'কিছুই জানি না,' জনির চেহারায় জেদের একটা ভাব লক্ষ্য করলো রানা।
'তারমানে বলবে না।'
কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকালো জনি।
'দ্বীপে কাউন্টের সেট-আপটা কি রকম ?'
আবার একটু হাসলো জনি। 'এ-সব প্রশ্নের উত্তর তুমি আশা করতে পারো না, বুড়ো খোকা। যাই ঘটুক, আমি মহামান্য কাউন্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো।'
'মহামান্য ?'

'আমরা যারা তার কাজ করি, তাদের কাছে।'

রানা গম্ভীর হলো। 'তুমি আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছো। চাই না, কিন্তু উপায় নেই। যাই, সলোমনকে পাঠিয়ে দিই।'

মিটিমিটি হাসলো জনি। 'তাকে আমি একবিন্দু ভয় করি না, বুড়ো খোকা।'

'করা উচিত। কারণটা বলি। সলোমনের তুলনায় আমি স্রেফ অ্যামেচার। সলোমন জানে, পুলিশ একবার ধরতে পারলে আবার অন্তত পনেরো বছরের জন্যে বন্দী থাকতে হবে তাকে। দ্বিতীয়বার আর পালানো সম্ভব হবে না, প্রতিটি সেকেণ্ড ওর ওপর সতর্ক নজর রাখা হবে।'

'তাতে কি?'

'সেটা ঠেকাবার জন্যে দরকার হলে সলোমন তোমাকে জবাই করবে।'

জনির চেহারায় ভয়ের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, তবে হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ঠোঁট থেকে, সামান্য একটু কুঁচকে উঠলো দুই ভুরুর মাঝখানটা। সলোমনের কথা নয়, রুথ র‍্যানশির কথা ভাবছে সে। বুড়ির ভবিষ্যদ্বাণীটা মনে পড়ে গেছে। আপনমনে মাথা ঝাঁকালো। না, এতো সহজে বুড়ির কথা ফলতে দেবে না সে। মৃত্যু যদি আসেই, খুঁজে বের করে নিক ওকে— স্বেচ্ছায় সে ধরা দিতে যাবে না। 'ঠিক আছে,' শান্ত সুরে বললো সে। 'কাউন্ট দ্বীপে থাকতে পারেন, নাও পারেন। সত্যি আমি জানি না। সাধারণত বোটে করে আসেন না তিনি।

প্রাইভেট হেলিকপ্টার আছে।'

'লণ্ডনের ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট ? ওটা তো কাউন্ট মাভো বুয়ার্দের একটা প্রতিষ্ঠান, তাই না ?'

চোখ জোড়া বড় করলো জনি, তারপর কুঁচকে সরু করলো। 'মাই গড। বুড়ো খোকা, এটা তুমি জানলে কিভাবে ? তার মানে আরো অনেক কিছু জানো।' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো সে। 'শুরু থেকেই তোমাকে আমার ভালো লাগেনি—নিজেও বোধহয় জানো না, তোমাকে ঘিরে অদৃশ্য একটা আলো আছে—অশুভ একটা রশ্মি।'

'বাড়িতে ক'জন লোক আছে কাউন্টের ?'

'সব সময় সবাই থাকে না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো জনি। 'বেশিরভাগ সময় শুধু একজন কেয়ারটেকার থাকে—এক এক সময় এক একজন। এখন সম্ভবত হরি নামে বিশ্বস্ত এক লোক আছে। মহামান্যের বডিগার্ড হিসেবেও কাজ করে সে।'

'হরি ? পুরো নাম কি ? লোকটা ভারতীয় ?'

'ভারতীয় কিনা জানি না, পুরো নামটাও কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে জানি মহামান্য কাউন্টের সাংঘাতিক ভক্ত সে। কাউন্টও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রায়ই বলেন, হরি আমার খুব প্রিয় ছাত্র।'

'ছাত্র ?'

'মনে হচ্ছে অবাক হলে ?' মিটিমিটি হাসছে জনি।

'তারমানে কি তোমার কাউন্ট...।'

'হ্যাঁ, তিনি একজন শিক্ষকও বটেন। দুঃখিত, এ-ব্যাপারে

আর কিছু জিজ্ঞেস করো না আমাকে।'

প্রফেসর? প্রফেসর কবীর চৌধুরী? কিন্তু তা কি করে হয়! রানা নিজ চোখে দেখেছে, টেনে পানির তলায় নিয়ে গেল তাকে হাঙরগুলো।

কিন্তু সত্যিই কি দেখেছে? হাঙরগুলো তার চারপাশে লাফা-লাফি করেছিল। একটা হাঙর বারবার খাবলা দিয়ে কবীর চৌধু-রীর গা থেকে মাংস তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো। একটা চোখ খোয়া গেল, তাও দেখেছে রানা। সবশেষে একটা হাত ছিঁড়ে নিয়ে গেল! তারপরও ব্যারিয়ারের দিকে এগিয়ে আসছিল কবীর চৌধুরী, একটা চোখ দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো রানার দিকে। তারপর···তারপর?

তারপর রানা কিছুই দেখেনি। পানির তলায় ডুবে গেল কবীর চৌধুরী, মনে হলো হাঙরই বুঝি তাকে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু আর দেখার ছিলোই বা কি? হাঙর ছাড়া আর কি-ই বা তাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে ওখানে?

জনিকে কেবিনে রেখে দরজায় তালা দিলো রানা, রোয়েনাকে নিয়ে প্যাসেজ ধরে রওনা হলো হুইলহাউসের দিকে। পথে রোয়েনা বললো, 'লোকটাকে আমার ভয় করে, মিঃ নাহিদ।'

'ভয় কিসের—আমি আছি না?' হঠাৎ থেমে রোয়েনার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'এই, তোমার চোখ দুটো টকটকে লাল কেন? কেঁদেছো, নাকি ঘুমাওনি?'

মাথা নিচু করলো রোয়েনা, কথা বললো না।

'কাঁদলেও তোমার মনের আশা পুরণ হবার নয়,' একটু কঠিন

সুরেই বললো রানা। 'তারচেয়ে ওর কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করো। আরেকটা কথা। কোথায় যাবে, কি করবে, এ-সব কথা না ভাবলেও পারো। আশ্রয়ের দরকার হলে কোনো চিন্তা নেই। তোমাকে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।'

কথাগুলো বলেই রানা বুঝলো, ভুল হয়ে গেল। চেহারায় গোঁয়ার্তুমির ভাব নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রোয়েনা। রানার একটা কথাও তার পছন্দ হয়নি।

'আমাদের সাথে থাকতে হবে না, যাও তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও,' বলে একাই ডেকে উঠে এলো রানা। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, তবে সাগর আগের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লো ও, কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করে আবার নেমে এলো নিচে। সারির প্রথম কেবিনে জনি রয়েছে, তৃতীয়টায় পাওয়া গেল রোয়েনাকে। দেয়ালের দিকে মুখ করে বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে সে। ফুলে ফুলে উঠছে তার পিঠ। কেবিনে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, তারপর একটা চাদরের ভাঁজ খুলে রোয়েনার পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিলো। যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকলো মেয়েটা, পাশ ফিরে তাকালো না। তার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

হুইলহাউসে ফিরে এলো রানা। সকালের আবছা আলোয় সলোমনের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, যদিও তার আনন্দ উল্লাসে এতোটুকু ভাটা পড়েনি। রানাকে দেখেই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে একগাল হাসলো সে। 'এইমাত্র আলডারনে-র সাথে যোগাযোগ করেছিলাম।'

'আর কতোক্ষণ?'

'আধ ঘণ্টা। সাগর শান্ত হয়ে গেছে কাজেই ফুল পাওয়ারে ছুটছি আমরা। একটাই উদ্বেগের বিষয়—কুয়াশা।'

'তোমার ধারণা সিরিয়াস হয়ে উঠবে?'

'বলা কঠিন, তবে আসছে খুব জোরেশোরে। ভালো দিকও একটা আছে। দ্বীপ থেকে ওরা কেউ দেখতে পাবে না যে আমরা আসছি।'

'জনির সাথে এইমাত্র কথা বলে এলাম।'

'কিছু বের করতে পারলে?'

'কাউণ্ট হেলিকপ্টারে আসা-যাওয়া করে।'

'দ্বীপে এখন আছে?'

'ও নাকি জানে না।'

মাথা নাড়লো সলোমন। 'বিশ্বাস করি না। আমি যাই পেটে পা দিই গিয়ে।'

'দরকার নেই। আমার ধারণা সত্যি কথাই বলছে। তাছাড়া, ভয়-ডর নেই, কথা আদায় করা কঠিন। বাড়িটায় প্রায় সময় শুধু একজন কেয়ারটেকার থাকে।'

'তাহলে কি করা হবে ভাবো,' বললো সলোমন। 'চার্টটা ভালো করে দেখেছি আমি, গুডউইন ঠিকই বলেছিল। জেটি-ই একমাত্র সম্ভাব্য অ্যাংকারেজ। কিন্তু ওখানে ভিড়লে বিপদে পড়তে পারি।'

'ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। একটা আইডিয়া আছে মাথায়। এসো, চার্টটা আবার একবার দেখি।'

অটোমেটিক পাইলট অন করে রানার পাশে চলে এলো সলোমন। 'যদি ভেবে থাকো অন্য কোথাও ভিড়তে পারবে, ভুল করবে। চার্টটা আমি বারো বার পরীক্ষা করেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'আগে শোনোই তো। পশ্চিম ঢালে একটা গর্তের ভেতর বাড়িটা। আমরা যদি পুব দিকে যাই, উঁচু পাঁচিলগুলো ওদিকেই, তাহলে কেউ দেখতে পাবে না, বিশেষ করে কুয়াশার মধ্যে।'

দ্রুত মাথা নাড়লো সলোমন। 'পুব দিকে কোথাও অ্যাংকারেজ নেই।'

'হয়তো তাই,' বললো রানা, 'কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে ছোটোখাটো প্রচুর জায়গা আছে, ক্যাপ্টেন সাহস করলে কোনো ছোটো একটা ডিঙ্গি ভিড়াতে পারবে।'

দ্বিধায় পড়ে দুলতে লাগলো সলোমন। 'শুনে মনে হয় যুক্তি আছে, কিন্তু এদিকের পানি আমি খুব ভালো করে চিনি, নাহিদ। পাহাড়-পাঁচিলগুলোর নিচে অসম্ভব ফেনা থাকবে, তলায় লুকিয়ে আছে ডুবো-পাথর, কাছাকাছি যাবার আগেই উল্টে যাবে বোট।'

'তবু হয়তো ওদিকে না গিয়ে আর কোনো উপায় থাকবে না,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'সময় হলে বোঝা যাবে।'

দশ

ধোঁয়াটে, কালচে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে বোট, যেন অনন্তকাল ধরে। ঘন ঘন বিস্ফোরণের আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে উঠলো, দূরে কোথাও যেন বিরতিহীন বজ্রপাত ঘটছে—আসলে তা নয়, ফেনিল সাগির-তরঙ্গ প্রচণ্ড আক্রোশে বিস্ফোরিত হচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে।

গোল্ডেন সান দুই কি তিন নট গতিতে এগোচ্ছে, নিস্তেজ হয়ে আছে এঞ্জিন। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সলোমন, ব্যগ্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে, বিপরীত মুখী স্রোতধারা অনুভব করে বুঝতে পারছে, পাহাড় আর বোটের মাঝখানে দূরত্ব খুব বেশি নয়।

বোটের নাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। আচমকা সামনে একটা হাত লম্বা করে দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ও। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসের শক্তিশালী ঝাপটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল

ঘন কুয়াশার খানিকটা পর্দা, ঠিক সামনেই উন্মোচিত হলো শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যটা—কালো চকচকে পাহাড়-পাঁচিল।

সম্ভবত দুশো গজ দূরে ওগুলো, মাথার দিক ধোঁয়াটে কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢাকা, হাজার হাজার পাথুরে খোপ আর কার্ণিশে গিজগিজ করছে সামুদ্রিক পাখি। পাঁচিলগুলোর গোড়ায় প্রকৃতি ফুঁসছে, এবড়োখেবড়ো পাথরের গায়ে জ্যান্ত সাগর যেন ব্যাকুল ব্যগ্রতায় আত্মাহুতি দিয়ে চলেছে অবিরাম।

পিছু হটে হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। 'কি মনে করো তুমি?'

মাথা নাড়লো সলোমন। 'মোটেও ভালো মনে হচ্ছে না।'

তবু সাহস করে বোট নিয়ে এগোলো সলোমন। পাঁচিলের গোড়া যখন পঞ্চাশ গজ দূরে, মনে হলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে গোল্ডেন সান। তীব্রগতি ঢেউগুলো সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে দিক বদলালো সে। গোড়ালির ওপর ঘুরে গিয়ে হাত লম্বা করলো রানা, পাথরের মাঝখানে ঘোড়ার পায়ের নাল আকৃতির একটা জায়গা দেখালো সলোমনকে, সেটার পিছনে নুড়ি ছড়ানো সরু একটা জায়গা। 'ওটা দেখে কি মনে হয়?'

আবার মাথা নাড়লো সলোমন। 'এখনো সেই একই কথা বলি আমি, ওই ফেনার মধ্যে পাঁচ মিনিটও টিকবে না ডিঙ্গি।'

'কিন্তু আমি যদি অ্যাকুয়ালাং পরে থাকি?'

ঝট্ করে ঘুরলো সলোমন। 'একটা নতুন কথা বললে বটে। তবে, ফিফটি ফিফটি চান্স—হাতটার কথা ভুলছি না।'

হেসে উঠলো রানা। 'বুঝলাম, তুমি যেতে পারছো না, আমিই

নির্বাচিত হয়েছি।'

নিচে নেমে এসে সেলুনের লকার থেকে স্কিন-ডাইভিং ইকুইপ-মেন্ট বের করলো রানা। অনেকগুলো বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে ও, তার মধ্যে একটা অবশ্যই ঠাণ্ডা। ব্যস্ত হাতে প্যান্ট-শার্টের ওপর কালো রাবারের ডাইভিং স্যুট পরে নিলো, পকেটে রইলো এড নিকলসের পিস্তল, চেইন টেনে বন্ধ করলো পকেটের মুখ, অ্যাকুয়ালাং হাতে বেরিয়ে এলো ডেকে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দ্রুত হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এলো সলো-মন। 'যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করবে। কিছু টের পাবার আগেই স্রোতের ধাক্কায় পাথরে আছাড় খেতে পারে বোট।'

'ঘণ্টাখানেক সময় দিয়ো আমাকে,' বললো রানা। ডেভিডস থেকে ডিঙ্গিটা নামালো ওরা। 'তারপর ফিরে এসে আমাকে দেখে যেয়ো। যদি নুড়ির ওপর দেখো, বুঝে নেবে আমি চাইছি জেটিতে গিয়ে নোঙর ফেলো তুমি। আর যদি ফেনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো…,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা,…'বুঝতে হবে প্ল্যানটা মাঠে মারা গেছে। তোমার ঘড়িটা বরং আমাকে দাও।'

ঘড়ি খুলে রানার হাতে দিলো সলোমন। 'তখন তুমি কি করবে?'

'চেষ্টা করে দেখবো সাঁতরে বোটে ওঠা যায় কিনা।'

কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সলোমন। 'চেষ্টাটা দেখার মতো হবে। মা-বাপের দোয়ায় আমাকে যেতে হচ্ছে না! এসো, ডিঙ্গি নামাই।'

ফাইবার গ্লাসের তৈরি ডিঙ্গিটা খুবই হালকা। পানিতে সেটা

নামাবার পর লাইন ধরে থাকলো সলোমন, ব্যস্ত হাতে অ্যাকুয়ালাঙের স্ট্র্যাপ লাগালো রানা। মুখের ওপর ভাইজর নামালো, এয়ার ফ্লো অ্যাডজাস্ট করলো, তারপর নেমে পড়লো ডিঙ্গিতে। রেইলের ওপর ঝুঁকে হাত নাড়লো সলোমন, ঢিল পড়লো লাইনে। হাত বাড়িয়ে বৈঠা ধরতে যাবে রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ডিঙ্গিটাকে বোটের পাশ থেকে ছিনিয়ে নিলো একটা ঢেউ।

আধ ঘণ্টা ধরেই বাতাসের গতিবেগ বাড়তে শুরু করেছে। উঁচু ঢেউগুলোর মাথায় সাদা ফেনা। তৃতীয় বারের চেষ্টায় বৈঠার নাগাল পেলো রানা।

ধক ধক আওয়াজের সাথে জ্যান্ত হয়ে উঠলো এঞ্জিন, গোল্ডেন সান নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। জলোচ্ছ্বাসের পর্দা ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে আছে পাহাড়-প্রাচীর, কর্কশ পাথুরে গোড়ায় টগবগ করে ফুটছে রাশি রাশি ফেনা। ডিঙ্গির খোল থেকে ফাঁপা একটা আওয়াজ পেলো রানা, বার কয়েক পাক খেলো সেটা। বিপদটা টের পেতে খুব বেশি সময় লাগলো না। ডুবো-পাথরের ক্ষুরের মতো ধারালো ডগায় ঘষা খেয়েছে ডিঙ্গির খোল, প্রায় দু'ফাঁক হয়ে গেছে ফাইবার গ্লাস।

তবু প্রাণপণ চেষ্টা করলো সে ডিঙ্গিটাকে ভাসিয়ে রাখতে। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। চিরে যাওয়া খোল থেকে হু হু করে পানি উঠছে, তবে ডিঙ্গিটা একদিকে কাত করে রাখলে পানি কম ওঠে। এদিকে রানা শুধু ডান হাতটা পুরোপুরি ব্যবহার করতে

পারছে। আরেকটা বিপদ এসে সম্পূর্ণ অসহায় করে দিয়ে গেল ওকে। তীব্র স্রোতের টানে হাত থেকে খসে গেল বৈঠা। ডিঙ্গির কিনারা আঁকড়ে ধরে পাটাতনের ওপর পড়ে থাকলো রানা। নিজেকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

পাঁচিলগুলো এখন খুব কাছে চলে এসেছে। বিশাল আকারের কার্নিশের ওপর বিকট শব্দে আছাড় খাচ্ছে সাগর, সাদাটে নোংরা ফেনায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাঁচিলের গোড়া অনেক উঁচু পর্যন্ত। দোতালা সমান একটা ঢেউ সেদিকেই ঠেলে নিয়ে চললো ডিঙ্গিটাকে।

কখন যে পানিতে পড়লো রানা বলতে পারবে না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পানির তলায় ডুবে থাকলো ও। মাথা তোলার পর দেখার সুযোগ হলো প্রথম সারি পাথরের ওপর আছাড় খাচ্ছে ডিঙ্গিটা। আরেকটা ঢেউ এসে অনেক ওপরে, শূন্যে তুলে নিলো ওটাকে। রিফ-এর গায়ে আরো দু'বার আছাড় খেলো প্রাণপ্রিয় বাহন, তারপর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পাথরগুলোর ডান দিকে প্রায় সমতল খানিকটা পানি দেখলো রানা। পিছনে আরো একটা ঢেউ মাথাচাড়া দিচ্ছে দেখে সেদিকে ডাইভ দিয়ে পানির তলা দিয়ে দ্রুত সাঁতার কাটতে শুরু করলো ও। রাবারের লম্বা পা ছুঁড়ে প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়িয়ে চললো।

চারদিকে বিপুল আলোড়ন। ফুটন্ত ফেনা, ছুটন্ত বুদবুদ, ধেয়ে আসা বালির পাহাড়, ঝমঝম কাঁকর বৃষ্টি, ইত্যাদির মাঝখানে পড়ে গেছে রানা। তারপর, যেন একটা দানবের হাত ওকে ধরে

ওপর দিকে তুলতে শুরু করলো।

সমতল পানির ওপর মাথা তুললো রানা। ওর দু'পাশে কালো পাথরের চকচকে গা। পরমুহূর্তে রানা দেখলো, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ও, ওর নিচে আড়মোড়া ভাঙছে সচল বালি আর জ্যান্ত নুড়ি পাথর।

দানবের একটা হাত আবার সাগরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোলো রানা। পানির সবুজ পর্দায় আবার একবার চাপা পড়লো ও, ডুবে গেল শরীরটা। পানি সরে যেতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, হোঁচট খেতে খেতে এগোলো সামনের দিকে। এক মুহূর্ত পর পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় সরু সৈকতে পৌছুলো ও।

পাহাড়-প্রাচীর থেকে চারশো গজ দূরে সরে এলো গোল্ডেন সান। তিন নট স্পীডে আরো দূরে সরে আসছে, অটোমেটিক পাইলট অন করে ডেকে এসে দাঁড়ালো সলোমন, চোখে বায়নোকিউলার তুলে রানার দিকে তাকালো।

ক্ষুদে, সরু সৈকতে কালো একটা মূর্তি, মাথার ওপর হাত তুলে একবার মাত্র নাড়লো। পরমুহূর্তে ধোঁয়াটে কুয়াশার গাঢ় পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেল রানা।

চোখ থেকে বায়নোকিউলার নামিয়ে বিড়বিড় করে উঠলো সলোমন, 'মরুকগে!' কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে এগোলো সে, নিচে নেমে এসে রোয়েনাকে খুঁজলো। কেবিনে নেই দেখে প্যাসেজে বেরিয়ে এসে ডাকলো সে, গ্যালি থেকে জবাব দিলো

রোয়েনা। আরো কফি বানাচ্ছে মেয়েটা।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় ঘুমাচ্ছো,' রোয়েনার চওড়া নিতম্বের দিকে চোখ রেখে বললো সলোমন।

মাথা নাড়লো রোয়েনা। 'ঘুম আসেনি—মাথায় অসহ্য ব্যথা।'

হাত দুটো নিয়ে কি করবে ঠিক করতে না পেরে দুই তালু এক করে ঘষতে শুরু করলো সলোমন। গায়ের কোট খুলে ফেলেছে রোয়েনা, ছোটো গাউন আর আঁটসাঁট ব্লাউজ পরে আছে। 'ডিঙ্গি নিয়ে সৈকতে নেমেছে নাহিদ, বোট ভেড়ানো যায় কিনা দেখে সিগনাল দেবে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা না করে উপায় নেই।' কাছে চলে এলো সে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো রোয়েনা। তার কাঁধে একটা হাত পড়লো।

'না,' বিড়বিড় করে বললো সে।

'কেন,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলো সলোমন, 'বলছিলে না মাথা ধরেছে? এরচেয়ে ভালো দাওয়াই আর আছে?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো রোয়েনা। 'ছাড়ো।'

রোয়েনার মসৃণ গলায় হাত দিলো সলোমন। হাতটা চেপে ধরতে গেল রোয়েনা, কিন্তু তার আগেই সলোমন সেটা তার কাপড়ের ভেতর গলিয়ে দিলো।

'মাগো!' যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো রোয়েনা। সলোমনের গা ঘেঁষে এলো সে, আবার যাতে ব্যথা পেতে না হয়। 'তুমি এমন নিষ্ঠুর কেন, জো? আমার বুঝি লাগে না?'

'এই দাগাই অনেকে পছন্দ করে, তুমি করো না?' খিকখিক করে হাসলো সলোমন। রোয়েনার শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হাত।

চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকলো রোয়েনা, বন্ধ পাতার কোণে চিকচিক করছে পানি, মাঝে মধ্যে টলছে সে। এভাবে কিছুক্ষণ সহ্য করার পর মৃদু কণ্ঠে বললো সে, 'হয়েছে?'

'শেষ না শুরু?' রোয়েনাকে ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো সলোমন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সরে যাবে রোয়েনা, তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলো সে। কোলের ওপর পড়লো রোয়েনা।

'হ্যাঁ, শুরু হয়েছে,' বলে কাঁপা হাতে রোয়েনার জামা খুলতে শুরু করলো সলোমন।

'জো,' আবেদনের সুরে বললো রোয়েনা, 'এখন না। মাথায় এতো ব্যথা, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবো। প্লিজ, এখন না।'

'এ-সব কাজে বাধা পেলে মাথায় খুন চেপে যায় আমার,' বলে কনুই দিয়ে রোয়েনার পাঁজরে গুঁতো মারলো সলোমন। ওঁক করে একটা আওয়াজ বেরুলো রোয়েনার গলা থেকে।

'ডার্লিং, ওহ্ ডার্লিং!' আনন্দে আর উল্লাসে চোখ ছোটো ছোটো হয়ে এলো সলোমনের। 'কেউ বলবে না কাপড়ের তলায় তুমি কুৎসিত।'

পাঁজর আর মাথার ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলো রোয়েনা। হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে। 'জো, এরপর কি হবে বলো তো?'

'এরপর কি হবে মানে?' হাসতে হাসতে রোয়েনাকে কাছে টানলো সলোমন। 'এরপর এই হবে।'

'ঠাট্টা নয়, জো,' কাপড় খুলতে সলোমনকে সাহায্য করলো রোয়েনা। 'আমি জানতে চাইছি, এরপর কোথায় যাবো আমরা? ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে তোমার দরকার নিরাপদ একটা ঠিকানা, আর আমার দরকার তোমার বুকে একটু আশ্রয়।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল সলোমনের ব্যস্ত হাত। 'যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে,' বললো সে।

কিন্তু রোয়েনা নাছোড়বান্দা। 'প্ল্যানটা করে রাখতে দোষ কি, বলো? একটা কথা মনে রেখো, কোনো মেয়ে তোমাকে যদি সুখী করতে পারে তো সে আমি। জানি, দেখতে ভালো নই, কিন্তু আমি তোমার এমন সেবা করবো···।'

'ডার্লিং, আমাকে বেঈমান ভেবো না,' রোয়েনার দৃষ্টির আড়ালে চোখ মটকালো সলোমন। 'অসহায় নারীকে আমি বঞ্চিত করতে পারি না। এই মুহূর্তেও কি তার প্রমাণ পাচ্ছো না?' নিজের পাশে রোয়েনাকে জোর করে শোয়ালো সে।

শেষ কেবিনটার দেয়ালে কে যেন ঘুসি মারছে। তারপরই জনির চিৎকার শোনা গেল, 'এই যে, বুড়ো খোকা, এদিকে আসার একটু সময় হবে নাকি? আমার কাছে একটা খবর আছে, আবার তোমার স্ট্রোক হবার জন্যে যথেষ্ট।'

'কি বলে বানচোতটা?'

সলোমন কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার চিৎকার করলো জনি, 'নিজের ভালো চাও তো তাড়াতাড়ি শুনে যাও

হে।'

রোয়েনাকে ছেড়ে উঠে পড়লো সলোমন। উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এরপর আর পড়ে থেকে কোনো লাভও হতো না। রোয়েনা কাপড়গুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। তালা খুললো শেষ কেবিনটার। 'শালার দেখছি একেবারেই সময়জ্ঞান নেই। কি বলতে চাস?'

'নাহিদ কোথায়?'

'তীরে গেছে।'

'উদ্যোগী লোক, সন্দেহ নেই। তা না হলে কাউন্টের পরিচয় জানতে পারে!'

সলোমনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'কি বলছো?'

'কাউন্ট মাভো বুয়ার্দ,' বললো সলোমন। 'বুড়ো খোকা, নাহিদ তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। ওর সাথে আধ ঘন্টা আগে কথা হয়েছে আমার, তুমি জানো?'

খপ্ করে জনির বুকের কাছে জ্যাকেট খামচে ধরলো সলোমন, হিড় হিড় করে টেনে বের করে আনলো প্যাসেজে, সেখান থেকে সোজা সেলুনে। ধাক্কা দিয়ে একটা চেয়ারে বসালো তাকে, চোখে আগুন নিয়ে জানতে চাইলো, 'একটা ফালতু কথা বললে জানে মেরে ফেলবো। সত্যি করে বল, নাহিদ তোর কাউন্টের পরিচয় জানে?'

'নিয়মই এই, মানুষের ভালো করতে চাইলে ভূতে কিলায়,' সলোমনের হুমকি সত্ত্বেও মিটিমিটি হাসছে জনি। 'হ্যাঁ, সলোমন, তোমার বন্ধু কাউন্টের নাম-ধাম সবই জানে। এমনকি

লণ্ডন ফ্রন্ট সম্পর্কেও জানে সে—ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট। আমার তো মনে হলো, কিছুই তার অজানা নেই।'

জনিকে ছেড়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সলোমন, চেহারা কালো হয়ে গেছে।

কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করলো জনি, 'তোমাকে সে অবিশ্বাস করে—নাহ্, তা কি করে হয়!'

কথাটা সলোমন শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কপালের পাশে একটা রগ বার-বার কেঁপে উঠলো। অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে। কম্প্যানিয়নওয়েতে তার পায়ের আওয়াজ হলো, ডেকে উঠে যাচ্ছে।

সশব্দে হাসতে শুরু করলো জনি, বাঁধা হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ানো, এই সময় গ্যালি থেকে কফি হাতে ভেতরে ঢুকলো রোয়েনা।

'প্যাঁচ লেগে গেছে, ঘুড়িতে ঘুড়িতে প্যাঁচ লেগে গেছে,' রোয়েনার দিকে তাকিয়ে বললো জনি। 'কোনটা কাটবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। কি গো, তোমার কি মনে হয়?'

পিছু হটে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রোয়েনা, চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ডেকে উঠে গেল সে।

সাথে সাথে হাসি থামালো জনি। ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে গ্যালিতে চলে এলো সে। সিঙ্কের পাশে কাটলারি ড্রয়ার, ভেতর থেকে দু'হাতে ধরে রুটি কাটার ছুরিটা বের করলো। উল্টো করলো ছুরিটা, হাতলটা দেরাজের ভেতর খাড়া করে রাখলো, তারপর

বন্ধ করলো দেরাজ। ফলাটা খাড়া হয়ে থাকলো, তার ওপর হাতের বাঁধন ঠেকিয়ে ঘষতে শুরু করলো সে। মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে এক করা কব্জি দুটো আলাদা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেলুনে ফিরে এলো সে। মেঝেতে হাঁটু রেখে নিচু হলো, বেঞ্চের নিচে হাত গলিয়ে লকার খুললো, লকারের পিছনের দেয়াল হাতড়ে ক্ষুদে বোতাম টিপে খুলে ফেললো গোপন কমপার্টমেন্ট। আবার যখন সিধে হলো, হাতে একটা স্টার্লিং সাব-মেশিন-গান রয়েছে। অ্যাকশন চেক করে হন হন করে এগোলো সে, কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এলো ডেকে।

রেইলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সলোমন, চোখে বায়নোকিউ-লার নিয়ে তীরে খুঁজছে রানাকে। হাতে কফির কাপ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোয়েনা।

'মিঃ নাহিদকে দেখতে পাচ্ছো, জো?'

মাথা ঝাঁকালো সলোমন। 'এখনো তীরে রয়েছে সে। সম্ভবত ওপরে ওঠার পথ খুঁজছে।'

স্টার্লিং কক করলো জনি, পরিষ্কার ক্লিক আওয়াজ হলো। ঝট্ করে ঘুরলো সলোমন।

'চাইলে বীরত্ব দেখাতে পারো, বুড়ো খোকা,' মিটিমিটি হাসলো জনি। 'তবে বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

ছোট্ট একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ করে হাতের কাপটা ছেড়ে দিলো রোয়েনা, সলোমনের আস্তিন খামচে ধরলো।

'সর মাগী, সরে যা!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রোয়েনাকে ধাক্কা দিলো সলোমন। ডেকের ওপর আছাড় খেলো রোয়েনা।

'বেশ্যাটা আমাকে খালিয়ে মারলো!'

'মেজাজ খারাপ করো না, বুড়ো খোকা। লক্ষ্মী ছেলের মতো হুইলহাউসে চলো, বোট ঘোরাতে হবে।'

'কোথায় যাবো আমরা?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'সোজা হারবারে। বাড়িতে যখন তোমার বন্ধু উঠবে, ওখানে আমি হাজির থাকতে চাই। শ্রেফ চেহারাটা কেমন হয় দেখার জন্যে।'

ডাইভিং ইকুইপমেন্ট খুললো রানা, পা থেকে রাবার ফিন নামালো, সবগুলো এক করে গুঁজে দিলো পাথরের একটা উঁচু ফাটলে। এতোটা উঁচুতে সাগর নাগাল পাবে বলে মনে হয় না।

টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে আছে পাহাড়ের গা, মাথার দিকটা কুয়াশায় ঢাকা। পাঁচিল কোথাও সবুজ, কোথাও কালচে সবুজ, বৃষ্টি আর পানির ঝাপটায় ভিজে চকচক করছে। ওর সামনের পাঁচিল একেবারে খাড়া, গা বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সরু সৈকত ধরে এগোলো ও, বোল্ডারগুলোকে পাশ কাটালো, টপকে গেল কোনো কোনোটা। এক জায়গায় কোমর সমান পানিতে নেমে পৈত্রিক প্রাণ রক্ষার জন্যে পাথর ধরে ঝুলে থাকতে হলো, আবার একবার ওকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো সাগর। এভাবে পনেরো মিনিট এগোবার পর এক জায়গায় থামলো রানা। এখানে পাঁচিলের গায়ে অনেক খাঁজ, গর্ত, আর সরু ফাটল রয়েছে, ওগুলোয় হাত-পা আটকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে।

উঠতে শুরু করার পর আর কোনো অসুবিধে হলো না। সরু একটা কার্ণিশ পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো মন। প্রায় খাড়া, তবে পাথরের খাঁজে হাত রেখে দ্রুত প্রায় অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলো রানা। দম নেয়ার জন্যে এখানে থামলো ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সাগরের দিকে।

গোল্ডেন সান আছে কিনা বোঝা গেল না, গাঢ় কুয়াশায় সাগর ঢাকা পড়ে আছে।

আবার উঠতে লাগলো রানা। বৃষ্টি, বাতাস, শীত সত্ত্বেও আঁটসাট রাবার স্যুটের ভেতর ঘামছে ও। বাঁ হাতের ব্যথাটা খুব একটা বাড়েনি, তবে বিরতিহীন হয়ে উঠেছে। দু'একটা সেলাই কেটে যেতে পারে, রাবার কাফ-এর নিচে রক্তের একটা ধারা দেখতে পেলো ও। এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই।

পাঁচিলের কিনারা টপকে এসে ভিজে ঘাসে পড়ে থাকলো রানা। এক মিনিট পর ঘড়ি দেখলো। সাড়ে আটটা বাজে। আগে ভাবেনি এতো সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ও। ঘাস মোড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

মাথায় উঠে এসে হঠাৎ পিঠ বাঁকা করে নিচু হলো রানা। ওর নিচে পঞ্চাশ ফিট গভীর আর দুশো ফিট ব্যাসের একটা গর্ত, ঠিক মাঝখানে একটা হেলিকপ্টার। গর্তের আরেক প্রান্তে সার সার পাইন গাছ, তবে বাড়িটা কোন্ দিকে বোঝা গেল না। তারপর মনে পড়লো রানার। ম্যাপে দেখেছে, দ্বীপের আরেক দিকে নামার সময় ঢালের গায়ে একটা গর্তের ভেতর রয়েছে বাড়িটা।

গর্তে নেমে এক ছুটে হেলিকপ্টারের কাছে চলে এলো রানা। পাশে লাগানো মই বেয়ে তর তর করে উঠলো, স্ক্রু ঘুরিয়ে খুলে ফেললো এঞ্জিনের ঢাকনি।

এঞ্জিন নষ্ট না করেও হেলিকপ্টার অচল করা সম্ভব, কিন্তু তাতে সময় অনেক বেশি লাগবে। ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে বড় একটা পাথর নিলো রানা, আবার মই বেয়ে উঠলো, তারপর ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে যে-ক'টা পার্টস ভাঙা সম্ভব সব ভাঙলো। বিশেষ করে ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেমটা চুরমার করে দিলো ও।

গর্ত থেকে উঠে পাইন বনে ঢুকলো রানা। ঢাল বেয়ে দুশো গজ নামার পর আরেকটা গর্ত দেখা গেল। শেষ গাছটার আড়ালে থেকে উঁকি দিয়েও কোনো লাভ হলো না, গর্তের ভেতর বাড়িটা কোথাও দেখা গেল না। সরু একটা পথ বাঁ দিকে চলে গেছে, তারপর ঢাল বেয়ে নেমেছে গর্তের দিকে। সেটা ধরে ছুটলো রানা। গর্তের মুখে পৌঁছে দেখতে পেলো বাড়িটা।

এদিকের ঢালেও সার সার পাইন গাছ, এখানে সেখানে ঘন ঝোপ। অনেকটা নেমে এসে ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে থাকলো রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে অটোমেটিক। বাড়ির পিছনে লন, অনেক দিন যত্ন নেয়া হয়নি। একটা পাথুরে টেরেস, পাশাপাশি কয়েকটা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। সামান্য একটু খোলা রয়েছে একটার দরজা, লাল ভেলভেট পর্দার নিচের কোণ বাতাসে উড়ছে। ঝোপের আড়ালে থেকে খোলা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে এগোলো রানা। পর্দার জন্যে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে

না। নিঃশব্দে টেরেসে উঠলো ও। পর্দাটা ধরে আস্তে করে সরালো একপাশে।

অন্ধকার কামরা। ভেতরে ঢুকলো রানা। তারপরই উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। পরমুহূর্তে ওর মাথার পাশে শক্ত, ধাতব কি যেন ঠেকলো।

পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওটা আমি নিচ্ছি, বুড়ো খোকা,' রানার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলো জনি।

ধীরে ধীরে আলোটা সয়ে এলো চোখে। রানা বাদে আরো পাঁচজন লোক রয়েছে কামরায়। ডান দিকে জনি, তার হাতে স্টার্লিং সাব-মেশিন গান। দরজার কাছে রয়েছে সলোমন আর রোয়েনা, ওদের পাহারা দিচ্ছে লম্বা, বাদামী, একহারা গড়নের এক যুবক। হাতে রিভলভার।

ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো একজন লোক। কালো হ্যাটের চওড়া কার্ণিশে পুরো কপালটাই তার ঢাকা। চোখে গাঢ় রঙের চশমা, আকারে এক একটা কাঁচ প্রায় পিরিচের মতো, প্রকাণ্ড মুখের বেশিরভাগটাই আড়াল করে আছে। হ্যাটের নিচে ঝুলে আছে চকচকে লম্বা কালো চুল—কান, ঘাড়, গলার দুই পাশ সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে। একটা কান থেকে সরু এক জোড়া তার বেরিয়েছে, সাদা, নেমে এসে ঢুকেছে ধূসর রঙের স্যুটের বুক পকেটে। চশমার কাঁচ এতো গাঢ় আর পুরু যে চোখ দেখার কোনো উপায় নেই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলো রানা। ফ্রেমের এক কোণ থেকে সরু একটা অ্যান-টেনা কাত হয়ে আছে কানের দিকে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। দৈহিক কাঠামোর সাথে মিলে যাচ্ছে, হ্যাট খুলে নিলে বেরিয়ে পড়বে মাথা ভর্তি এলোমেলো, ঝাঁকড়া চুল। হাঁটলে?

লোকটা রানার দিকে এগোলো।

হ্যাঁ, একটু খোঁড়াচ্ছে। একে অবশ্য ঠিক খোঁড়ানো বলে না, একটা পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে। তবে কি···? কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব! কবীর চৌধুরী হয় কি করে!

'হ্যালো, মিঃ মাসুদ রানা,' পরিচিত কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো কামরার ভেতর, 'নাকি তোমাকে আমি মিঃ নাহিদ শাহ বলেই ডাকবো?' ভারি গলায় হাসলো লোকটা। 'স্বাগতম, স্বাগতম! ব্যাবিলনে স্বাগতম!' পরিষ্কার বাংলা।

এগারো

ভিড় ঠেলে সামনে বাড়ার চেষ্টা করলো সলোমন, বিমূঢ় চেহারা ঃ 'এ-সবের মানে কি ?'

'হ্যাঁ,' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কবীর চৌধুরী, 'তোমার বিস্মিত হবারই কথা। তুমি যাকে আফগান যুবক নাহিদ শাহ বলে চেনো সে আসলে নাহিদ শাহও নয়, ভাড়াটে সৈনিকও নয়, ডাকাত তো নয়ই। পুলিশ বললে ওকে চিনতে সুবিধে হবে তোমার, যেহেতু তুমি চোর। ফ্রাইডেথর্পে তোমার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিলো ওর ওপর। শুধু তাই নয়, আবার তোমাকে জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও ওর দায়িত্বের একটা অংশ।'

'পুলিশ ?' হাঁ হয়ে গেল সলোমন। 'ও ?' বেসুরো গলায় হাসলো সে। 'অসম্ভব। পুলিশের গন্ধ আমি এক মাইল দূর থেকে পাই। ও যদি পুলিশ হয় আমি তাহলে গিরিগিটির লেজ।'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হলে খুশি হও ? কিংবা এসপিওনাজ এজেন্ট ?' সলোমনের চেহারায় দিশেহারা ভাব ফুটে উঠছে

দেখে ভরাট গলায় হাসলো কবীর চৌধুরী। তারপর লম্বা, ঋজু যুবকের দিকে ফিরলো সে। 'হরি, মাই ডিয়ার বয়, সলোমন আর মেয়েটাকে নিচে সেলারে নিয়ে যাও। আমি চাই তারপর তুমি হেলিকপ্টার রেডি করে খবর দেবে। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।'

'কিন্তু শুনুন…,' শুরু করলো সলোমন, এমনি সময়ে তার দিকে এক পা এগিয়ে হাতের রিভলভারটা বুক বরাবর তাক করলো হরি।

'হরিকে মাফ করতে হবে,' বললো কবীর চৌধুরী। 'আমাকে একটা এক্সপেরিমেন্টে সাহায্য করতে গিয়ে বেচারা তার বাক, স্মৃতি, বিবেক, এবং বিবেচনা শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। শুধু আমাকে চেনে ও, আমার কথা শোনে। যদি বলি নিজের মাথায় গুলি করো, এখুনি তা করবে ও। ও যে বিপজ্জনক, তা কি আরো ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার আছে? তোমার জায়গায় আমি হলে ও যা বলে শুনতাম।'

তিনজন বেরিয়ে গেল কামরা থেকে, তাদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'এতো হৃদয়হীন হও কি করে, জনি?' মৃদু হেসে বললো কবীর চৌধুরী। 'দেখছো না, রানা কেমন টেনশনে রয়েছে? ওকে একটা সিগারেট তো অন্তত দাও।'

'এই যে, বুড়ো খোকা,' বলে রানার দিকে লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলো জনি।

সিগারেট ধরালো রানা, লক্ষ্য করলো হাত দুটো একটু একটু

কাঁপছে ওর। কাছ থেকে দেখার পর ওর মনে হলো, কবীর চৌধুরীর মুখের রঙ একটু যেন বেশি মসৃণ, রঙটাও কেমন যেন উজ্জ্বল। সম্ভবত অতি সূক্ষ্ম কৃত্রিম কোনো চামড়া দিয়ে গোটা মুখ আড়াল করা হয়েছে।

'আমরা প্রফেশনাল, তাই না, রানা?' জিজ্ঞেস করলো কবীর চৌধুরী। 'কাজেই এসো কাজের কথাগুলো চটপট সেরে ফেলি। তার আগে তোমার একটু প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। জেলে ঢোকার কৌশলটা সত্যি সুন্দর ছিলো। ডাকাতিটা একেবারে নিখুঁত হয়েছিল।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা। 'কিন্তু তোমার কৃতিত্বের কাছে আমারটা ছেলের হাতের মোয়া। আমি হয়তো অনেক কিছু পারি, কিন্তু মরে গিয়ে ফিরে আসতে পারি না।'

'আসলে আমার তেমন কোনো কৃতিত্ব ছিলো না, অ্যাণ্ড দ্যাটস আ ফ্যাক্ট। সব কথা জানলে তুমিও আমার সাথে একমত হবে।'

অকপটে স্বীকার করলো রানা, 'জানার জন্যে আমি মরে যাচ্ছি।'

ঘুরে চেয়ারে গিয়ে বসলো কবীর চৌধুরী। রানা লক্ষ্য করলো,

খানিক আগে পৌঁছায়নি। তাহলে একটা হাত, চোখ, মুখের একটা পাশ, ইত্যাদি আমাকে হারাতে হতো না।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'তুমি বলতে চাইছো…!'

'তবে লাভও কম হয়নি,' বললো কবীর চৌধুরী। 'চোখ হারিয়ে আমি বেশি দেখতে পাচ্ছি, যে-কোনো মানুষের চেয়ে অনেক বেশি,' চশমার ফ্রেমে আঙুল তুললো সে। 'এটা আশ্চর্য একটা ক্যামেরা। আমার সামনে যা যা আছে তার কিছুই আমি দেখতে পাই না, দেখতে পাই ওগুলোর রঙিন ছবি। টেকনিক্যাল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলবো: অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের সাথে দেহের ইন্দ্রিয়গুলোর সংযোগ ঘটানো সম্ভব হওয়ায় বিস্ময়কর রেজাল্ট পাচ্ছি। চামড়ার চোখ অনেক জিনিস দেখেও না দেখতে পারে, কিন্তু একটা ক্যামেরা কিছু বাদ না দিয়ে সমস্ত কিছুর ছবি তোলে। কৃত্রিম কানে আমি যা শুনি তোমরা তা শোনো না। বর্তমানে সারা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসম্যান কে বলো তো? আমি। কারণ আমার কৃত্রিম ডান হাত শুধু কাঁপে না তাই নয়, ওটার সাথে ক্যামেরা, রাডার, টেলিস্কোপ ইত্যাদি ফিট করা আছে।

গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলো রানার। তাছাড়া, কবীর চৌধুরী যে বেঁচে তা তো আর মিথ্যে নয়। তবু ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিলো ও। বললে, 'কংগ্রাচুলেশন!'

রবারের মতো প্রসারিত হলো কবীর চৌধুরীর পুরু ঠোঁট। 'ধন্যবাদ।' চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না, তবে পরিতৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

'তোমার অর্গানাইজেশনটা কিন্তু বেশ শক্তিশালী, ব্যবসাও বেশ ভালো ফেঁদেছো,' বললো রানা।

হা হা করে হাসলো কবীর চৌধুরী। বিনয়ের সাথে বললো, 'ও কিছু না। আমরা আমাদের মক্কেলকে বেস্ট সার্ভিস দেয়ার চেষ্টা করি, এই আর কি।'

'সার্ভিসই বটে,' ব্যঙ্গ করলো রানা। অপেক্ষা করছে হাসানের প্রসঙ্গ কখন তুলবে কবীর চৌধুরী। 'জন হেরিক আর রিড কোয়েনের মতো কতো বোকা যে তোমার বেস্ট সার্ভিস পেয়ে অকালে স্বর্গে গেল। এমন লোভে ফেলো ওদের, টাকার হদিশ অগ্রাম জানিয়ে দিতে কেউ একটুও আপত্তি করে না।'

'ভাবতে অবাক লাগে, প্রফেশনাল ক্রিমিনালদের মতো হাবা-গোবা লোক হয় না। মিথ্যে গল্প বিশ্বাস করার ব্যাপারে ওদের জুড়ি মেলা ভার। অল্প জলের মাছ—শুধু টোপ নয়, হুক, লাইন, সীসা, ফাতনা পর্যন্ত সব গিলে ফেলে।'

'আর যাদের অন্য দেশে পাচার করো?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'রাশিয়ায়? ইসরায়েলে? দেশ বদলের পর তারাও কি অকালে মারা যায়?'

'ওরা বেশিরভাগই নিজেরা বিক্রি হয়ে যায়,' বললো কবীর চৌধুরী। 'আমার কাজ হলো নতুন মালিকের কাছে ওদের পৌঁছে দেয়া। সময়, কৌশল, বাহন, ইত্যাদি ঠিক করি আমি। তারপর

কি হয় না হয় আমি কি করে বলবো।'

'বোঝাই যায়, আমি আসছি এ খবরটা তুমি দেরি করে পেয়েছো, নাকি আমার ধারণা ভুল?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'জানতাম আসবে,' ভরাট গলায় হাসলো কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু নাহিদ যে মাসুদ রানা সেটা বুঝতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তবে যখন শুনলাম হাসপাতাল থেকে দু'জন পালিয়েছে, তখনই আন্দাজ করলাম ওদের একজন তুমি।'

তিক্ত একটু হাসলো রানা, কথা বললো না।

'তুমি ভাবছো, তোমার জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করিনি কেন। করিনি, কারণ জানতাম, কোনো স্টেশনেই ওরা তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না। এই সুযোগে স্টেশনগুলোর শক্তি পরীক্ষাও হয়ে গেল। হোফার টুইড, রুথ ব্র্যানশি, এড মিকলস বা জনি তোমার ব্যবস্থা করতে পারেনি, কিন্তু আমি পারবো।'

প্রসঙ্গটা নিজেই তুললো এবার রানা, 'কিন্তু হাসানকে এখান পর্যন্ত আসতে দেয়ার পিছনে কি কারণ ছিলো?'

'জেল থেকে বের করা হলো তাকে, তারপরই ধরা পড়ে গেল। জনিকে নির্দেশ দিলাম তাকে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কৌতূহল বলতে পারো, আবার ফাঁদও বলতে পারো।'

'কি রকম?'

'কৌতূহল ছিলো, রানা এজেন্সি আমার সম্পর্কে সব কথা জানে কিনা। ফাঁদ এই জন্য যে জানতাম হাসান নিখোঁজ থাকলে তার পথ ধরে আসবে তুমিও। তোমাকে হাতে পাওয়া আমার দরকার ছিলো। ছোট্ট একটা হিশেব মেলানো বাকি আছে...

'কোথায় রেখেছো তাকে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আশ্চর্য, দেখেও চিনতে পারোনি? সত্যিই পারোনি? তাহলে তো নিজের খানিকটা প্রশংসা করতে হয়।'

ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। 'হাসানকে দেখেছি? কোথায়?'

'কেন, এখানে। ওর নাম অবশ্য বদলে দিয়েছি আমি। হরি—ছোটো নামই আমার পছন্দ।'

ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার বুক। প্রচণ্ড অবিশ্বাসে বোবা বনে গেল ও। প্রায় ষাট সেকেণ্ড পর চিৎকার করে উঠলো, 'অসম্ভব! হাসান...' হাসানের চেহারা...

'প্লাস্টিক সার্জারী, রানা,' তৃপ্তির হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'এ তো কিছুই নয়, চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছি আর কি কি করেছি তা তো তোমাদের আগেই বলেছি।'

'অসম্ভব!' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'আমি বিশ্বাস করি না। হরি—হাসান? মাই গড, নো!'

'ইয়েস।'

যেন ধমক খেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র রানা হেড স্যারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো।

'এবং জানো, কেন ওকে হরি বানিয়েছি?' গমগম করে উঠলো কবীর চৌধুরীর ভারি কণ্ঠস্বর। 'প্রতিশোধ নেবার জন্যে। তুমি আমার শিক্ষক, রানা। তোমার শিষ্যকে দিয়েই তোমার ভবলীলা সাঙ্গ করাবো আমি।'

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো রানা।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো কবীর চৌধুরী। 'কেমন মজা হবে ভাবতেও আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। কানে শোনে, কিন্তু বিবেক নেই, দেখতে পায়, কিন্তু চিনতে পারে না। হাসান-হাসান করে যতোই চেঁচাও, কিছু মনে করতে পারলে না। দুটো মাত্র শব্দ—ব্রেন ওয়াশ, কিন্তু কি ভয়াবহ তার তাৎপর্য, তাই না? হ্যাঁ, আমি ওর ব্রেন ওয়াশ করেছি। ও শুধু আমাকে চেনে। আমি যা বলবো তাই করবে। এবং আমি ওকে বলবো, হরি, মাসুদ রানা লোকটা আমার প্রাণের শত্রু, ওকে তুমি খতম করো।'

গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। 'তুমি একটা পাগল! তু-তুমি একটা উ-উন্মাদ…,' প্রচণ্ড উত্তেজনায় তোতলাতে শুরু করলো রানা।

'এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে,' শান্ত গলায় বললো কবীর চৌধুরী। 'কিছু প্রস্তুতি নেয়া বাকি আছে, এখুনি না সারলে রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে,' জনির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'ওকে তুমি ওদের কাছে নিচে নিয়ে যাও, জনি। তারপর এখানে ফিরে এসো।'

'সলোমন আর রোয়েনা, ওদের কি হবে?' পিঠে সাবমেশিন-গানের স্পর্শ নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওদেরও ব্যবস্থা হবে, কথা দিলাম।'

রানার পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে এসে জনি বললো, 'মনটা শক্ত করো, বুড়ো খোকা। কথা দিচ্ছি, ওরা বেশি ব্যথা পাবে না।'

ঠেলে রানাকে সেলারের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো জনি। প্রায় অন্ধকারই বলা যায়, উল্টো দিকের একটা ফোকর থেকে এক ফালি আলো ঢুকেছে। ওটা দিয়ে একটা বিড়াল ঢুকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রানার পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সামনে খস খস আওয়াজের সাথে কি যেন নড়ে উঠলো। তারপর সলোমনকে দেখতে পেলো ও, এগিয়ে আসছে সে। 'কে ওখানে?'

'আমি—রানা।'

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল সেলার, আচমকা একটা ঘুসি আসার অপেক্ষায় থাকলো রানা। কিন্তু এলো না। বিষণ্ণ সুরে কথা বললো সলোমন, 'কাউন্ট লোকটা তোমার সম্পর্কে যা যা বললো, সব সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

রানার দিকে পিছন ফিরলো সলোমন। তারপর বিস্ফোরিত হলো সে। 'আমি, জো সলোমন, ব্লাডি একটা পুলিশের ফাঁদে পড়েছি!'

রানা বলতে পারে, সাথে ও না থাকলে ওয়াইকেহেড ফার্মহাউসের কুয়ায় পটল তুলতো সলোমন। কিন্তু বলে কোনো লাভ নেই।

'সত্যি যদি জানতে চাও তো শোনো,' বললো রানা। 'আমি পুলিশ নই। জন হেরিক, রিড কোয়েন, বা তোমার ব্যাপারেও আমার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। স্লিপ হটনের ব্যাপারে আছে। কারণ স্লিপ হটন জেল থেকে বেরোয়নি, তার বদলে

বেরিয়েছে আমার এজেন্সির একজন এজেন্ট। আমি তাকে উদ্ধার করতে এসেছি। আর কাউন্টের কথা যদি বলো, জেলখানা থেকে কয়েদী বের করে মেরে ফেলাই তার একমাত্র কাজ নয়, ইংল্যাণ্ডের টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট অন্য দেশে বিক্রি করে যে, বিশ্বাসঘাতকদের পাচার করে নিরাপদ আশ্রয়ে। তার ঠিকানা আর পরিচয় জানার জন্যেই তোমার সাথে ভিড়তে হয়েছিল আমাকে।'

'তারমানে আমাদের সরকারও তোমাকে সাহায্য করছে,' বললো সলোমন। 'তার অর্থই হলো, আবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ফ্রাইডেথর্পে, নাকি তোমার ইচ্ছে আমাকে ছেড়ে দেবে?' আবার রানার দিকে ফিরলো সে।

'এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি নই।'

'মাই গড, তোমার জন্যে এতো কিছু করার পর শেষ পর্যন্ত এই কথা শুনতে হচ্ছে!' রাগে কাঁপতে শুরু করলো সলোমন। এক কোণ থেকে এগিয়ে এসে তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো রোয়েনা।

'শান্ত হও, জো, শান্ত হও... ।'

হিংস্র আক্রোশে রোয়েনার দিকে ফিরলো সলোমন, দু'হাত তুলে সজোরে ধাক্কা দিলো বুকে, ছিটকে দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়লো মেয়েটা। 'বেশ্যা মাগী! কাছে আসবি তো মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবো।'

ব্যথায় উ-আঁ করতে করতে বেঞ্চে উঠে বসলো রোয়েনা। সিগারেট ধরালো রানা। 'ওকে মারধর করলে কি সমস্যার

সমাধান হবে ?'

'এতোই যদি দরদ, কোলে তুলে আদর করো, যাও।' ক্ষুদে জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সলোমন। তারপর হঠাৎ ঘুরলো। 'কি ঘটবে এখন ? তোমাকে কোনো আভাস দিয়েছে ?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো রানা। 'আভাস দেয়ার দরকার আছে কি ? আর সবাইকে নিয়ে যা করে এসেছে, আমাদের নিয়েও তাই করবে।'

'আমি হয়তো কাউন্টের সাথে একটা চুক্তিতে আসতে পারি,' ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে বললো সলোমন।

'কি দিয়ে ? তোমার ডায়মণ্ডগুলো তো তার হাতে। কি তোমার দেয়ার আছে তাকে ?'

'নিশ্চয়ই কোনো একটা সমাধান বের করা যাবে।' উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলো সলোমন।

সলোমনকে পাশ কাটিয়ে গেল রানা, জানালার কার্নিশ ধরে উঁচু করলো মাথা, উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো। উঠন দেখা গেল। হঠাৎ পাইন গাছের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখলো হরি—অর্থাৎ হাসানকে। চোখের পলকে বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মেঝেতে নেমে মৃদু হাসলো রানা। 'কিছুটা অ্যাকশন দেখার সুযোগ হবে বলে মনে হচ্ছে।'

তিন কি চার মিনিট পর পায়ের আওয়াজ পেলো ওরা। পর-মুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। এক ঝলক আলোর সাথে জনিকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। মেশিনগান রেখে পয়েন্ট থ্রি,

এইট রিভলভার নিয়ে এসেছে সে। আশ্চর্য, তার চেহারায় কৌতুকের হাসি। 'এই যে, বুড়ো খোকা, তোমার কি একটু সময় হবে?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো সে। 'মহামান্য কাউন্টের সাথে দেখা করলে কৃতার্থ হবেন তিনি। তবে খুব সাবধান—মহামান্য বড় অস্বস্তির মধ্যে আছেন।'

চট্ করে একবার ঘড়িটা দেখে নিলো রানা। প্রায় ন'টা বাজে দেখে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো ও। 'আমার সময় মানে তোমাদের সময়। এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু করারও নেই আমার। এতো করে যখন বলছো, চলো যাই, দেখি মহামান্যের কি বলার আছে।' সলোমনের দিকে ফিরলো রানা, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে না ফিরলে ছেড়ে দিয়ো কুকুরগুলোকে।'

কিন্তু রানার অসময়োচিত রসিকতায় সাড়া দিলো না সলোমন, ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজের সাথে ঘুরে দাঁড়ালো সে। অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে সেলার থেকে বেরিয়ে এলো রানা। পিছু পিছু এলো জনি আর তার রিভলভার।

ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে হাসানের সাথে কথা বলছে কবীর চৌধুরী। রানাকে নিয়ে জনি ঢুকতেই ঝট্ করে ঘুরলো সে। মানুষটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী। 'হরির কাছে শুনলাম হেলিকপ্টারের এঞ্জিন ভেঙে ফেলা হয়েছে। কাজটা নিশ্চয়ই তোমার?'

'বলো কৃতিত্বটা।'

'কাজটা তুমি ভালো করোনি, রানা,' ঠাণ্ডা গলায় বললো কবীর চৌধুরী।

কামরার এক কোণে ছোট্ট একটা বার, কারো অনুমতির ধার না ধেরে সেদিকে এগোলো রানা। জনির হাতে রিভলভারের মাজ্‌ল্ ধীরে ধীরে ঘুরে গেল। বারের সামনে দাঁড়ালো রানা, সরু একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেললো। তারপর এগিয়ে এসে আবার নিজের জায়গায়, কবীর চৌধুরীর সামনে দাঁড়ালো। 'এখনো বুঝতে পারছো না?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'মানে?'

হাসলো রানা। 'কোথাও তুমি যাচ্ছো না, কবীর চৌধুরী। তোমার যাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তুমি শেষ হয়ে গেছো। কাল রাতে আপটন মাগনা থেকে রওনা হবার আগেফোনে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথে কথা হয়েছে আমার। লয় পিয়েরের কথা বললাম ওদের, চেক করলো ওরা, বেরিয়ে এলো তোমার পরিচয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সবার টনক নড়লো। তোমার লণ্ডন ফ্রন্ট ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে দেখো না—কেউ সাড়া দেবে না। অফিস আজ খোলাই হয়নি।'

জনির দিকে ফিরলো কবীর চৌধুরী। 'তোমার ধারণা ও সত্যি কথা বলছে?'

'সম্ভাবনা খুব বেশি।'

'তারমানে ওর বন্ধুরা যে-কোনো মুহূর্তে হাজির হতে পারে।'

'ঠিক,' স্মিত হেসে বললো রানা। 'কার্টসি অভ দ্য রয়্যাল নেভী।'

কবীর চৌধুরী শ্রাগ করলো। 'পরিস্থিতি সত্যিই ঘোলাটে। কিন্তু গুরুতর নয়। অত্যন্ত স্পীডি বোট রয়েছে হাতে। রওনা হবার দশ মিনিটের মধ্যে ফ্রেঞ্চ সমুদ্র-সীমায় পৌঁছে যাবো আমরা।'

ধ্বক করে উঠলো রানার বুক। শয়তানটা বুঝি আবার আঙুল গলে পালাবে। মাথার ভেতর ঝড় বইতে শুরু করলো। জনি বোট চালাতে জানে না, সি-সিকনেসে কাহিল হয়ে পড়ে। হাসান-ও বোট সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। কিন্তু কবীর চৌধুরী পাকা নাবিক। বার-এর দিকে আবার একবার এগোলো রানা।

'টেনশন বেড়ে গেল নাকি?' হেসে উঠলো কবীর চৌধুরী।

গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ঘুরলো রানা, বললো, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো, কিন্তু লাভ হবে না। ফ্রেঞ্চ কোস্টগার্ড এবং পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।'

'কোথাও কোনো ফাঁক রাখোনি দেখছি,' বলে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে এগোলো কবীর চৌধুরী। আহত বাঁ হাতে গ্লাস নিয়ে রানাও সেই মুহূর্তে এগোলো। দু'জনের একজনকে থামতে হবে, তা না হলে ধাক্কা লাগবে গায়ে গায়ে। রানাই থামলো, পর-মুহূর্তে ওর ডান হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কবীর চৌধুরীর চশমাটা ধরে সজোরে টান দিলো ও, টিং টিং আওয়াজের সাথে ছিঁড়ে গেল কয়েকটা তার। মেঝেতে আছড়ে ফেলে পায়ের চাপে ভেঙে চুরমার করে ফেললো। ধীরে ধীরে সিধে

হলো রানা, পাঁজরে জনির রিভলভার চেপে বসে আছে। ওদিকে ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠেছে কবীর চৌধুরী, দু'হাতে চোখ ঢেকে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে।

'আমার চশমা···!'

'দেবো শেষ করে, মহামান্য কাউন্ট?' হিসহিস করে জানতে চাইলো জনি।

'আমার চশমা···!' হুংকার ছাড়লো কবীর চৌধুরী।

'শয়তানটা ভেঙে ফেলেছে, স্যার,' বললো জনি। 'একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল কবীর চৌধুরী। ঝাড়া পনেরো সেকেণ্ড এক চুল নড়লো না সে। তারপর ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে, আঙুলের ফাঁকে ঠোঁট জোড়া প্রসারিত হতে দেখলো রানা।

'তুমি চাও না আমি বোট চালাই,' হাসতে হাসতে বললো কবীর চৌধুরী। 'তারমানে ফ্রেঞ্চ কোস্টগার্ড বা পুলিশকে সতর্ক করা হয়নি, তাই না?' জনির উদ্দেশে বললো, 'ডাকাত-টাকে নিয়ে এসো এখানে, জনি। জলদি। নষ্ট করার মতো সময় নেই। হরি, রানার ওপর নজর রাখো।' পকেট থেকে রিভলভার বের করে রানার দিকে তাক করলো হাসান।

মনে মনে নিদারুণ হতাশ হলো রানা। কাজটায় কোনো লাভ হলো না। কবীর চৌধুরী এখন বোট চালাতে পারবে না, কিন্তু সলোমন পারবে। তবু জোর গলায় বললো ও, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো, কিন্তু তোমার পালাবার কোনো উপায় নেই।'

তিন মিনিট পর কামরায় ঢুকলো সলোমন, পিছনে জনি। সলোমনকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখালো।

'সলোমন, এইমাত্র আমি জানতে পারলাম রানার লোকজন যে-কোনো মুহূর্তে দ্বীপে হানা দিতে পারে,' বললো কবীর চৌধুরী।

'আপনার মন্দ কপাল।'

'তোমারও—নাকি ফ্রাইডেথর্পে ফিরে গিয়ে আরো পনেরো বছর কাটাতে চাও?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সলোমন জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে ডেকে পাঠাবার কারণ কি?'

'আমি জানি, এক সময় টর্পেডো বোটে পেটি অফিসার ছিলে তুমি,' বললো কবীর চৌধুরী।

'তো কি হয়েছে?'

'দুর্যোগের মধ্যে গোল্ডেন সানকে নিরাপদে ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এসেছো তুমি, এতে তোমার যোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। চেষ্টা করলে বোটটা তুমি পর্তুগালে নিয়ে যেতে পারবে না?' রানার দিকে ফিরলো কবীর চৌধুরী। 'আমি জানি, বোটটা লাইবেরিয়া-য় রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। কাজেই রয়্যাল নেভি গোল্ডেন সানে উঠতে চেষ্টা করলে সেটা সম্পূর্ণ বেআইনী একটা কাজ হবে।'

'গোল্ডেন সানের রেঞ্জ মাত্র ছশো মাইল,' বললো সলোমন। 'বাকি দুই কি তিন শো মাইলের জন্যে অতিরিক্ত ফুয়েল লাগবে।'

'বিশ গ্যালনের কয়েকটা ড্রাম রয়েছে জেটির পাশে, চলবে?'

'তা চলবে—কিন্তু আমার কি লাভ? আমি কি পাবো?'

'পাবে মুক্তি, পাবে ডায়মণ্ডের অর্ধেক ভাগ। তাঞ্জিয়ার্সে নতুন একটা অর্গানাইজেশন গড়ছি আমি, সেখানে লোভনীয় একটা চাকরিও পেতে পারো। বলো, আর কি চাও? তোমাকে সাথে পেলে ব্যবসা আমার তুঙ্গে উঠবে, কোনো সন্দেহ নেই।'

'ওর কথা শুনো না, সলোমন,' বললো রানা। 'এরকম একটা বোট নিয়ে বে অভ বিসকে পেরোনো অসম্ভব। অন্তত বছরের এই সময়টায় কোনোমতেই পারবে না।'

'কে বললো পারবো না?' রানার দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, ফ্রাইডেথর্পে ফিরে যাবার চেয়ে বোট নিয়ে সাগরে ডুবে যাবো।' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরলো সে। 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করবো কিভাবে?'

মুখ থেকে ডান হাতটা নামিয়ে স্যুটের পকেটে ভরলো কবীর চৌধুরী। হাতটা বেরিয়ে এলো একটা ল্যুগার নিয়ে। সেটা বাড়িয়ে ধরে বললো সে, 'এটা কি বিশ্বাসের একটা সন্তোষজনক নমুনা হতে পারে না?'

ল্যুগারটা নিয়ে ফায়ারিং মেকানিজম পরীক্ষা করলো সলোমন, সন্তুষ্টচিত্তে ঘাড় ঝাঁকালো। 'ঠিক আছে, তাহলে আর দেরি কিসের? ড্রামগুলো তুলতে হবে না?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালো কবীর চৌধুরী। তারপর রানাকে বললো, 'চশমা ভেঙে আপাতত আমাকে অন্ধ করে দিয়েছো,

কিন্তু তুমিও জানো আরেকটা বানিয়ে নিতে পারবো। কোনো লাভ হলো কি?' রানা কিছু বলার আগেই জনিকে বললো সে, 'ওকে মেয়েটার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, জনি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, ঘরটা খালি করার জন্যে তোমাকে এখানে দরকার হবে। সলোমনের সাথে হরি যাক, ড্রাম তুলতে সাহায্য করবে।'

'আমাদের নিয়ে কি করা হবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মিটিমিটি হেসে জনি বললো, 'ভেবেচিন্তে কিছু একটা ঠিকই বের করে ফেলবো, বুড়ো খোকা।'

পিঠে ধাক্কা খেয়ে দরজার দিকে এগোলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে সলোমনের দিকে একবার তাকালো ও। বললো, 'ওরা আমাদের খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে, সলোমন। তুমি জানো।'

'সে তোমাদের মন্দ কপাল।'

'রোয়েনার ব্যাপারে তোমার কিছু বলার নেই?'

'আমাদের সাথে তার আসাই উচিত হয়নি। আমি সেধেছিলাম?'

'এই তোমার শেষ কথা?'

রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়ালো সলোমন, একটা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। তার পিছু নিলো হাসান।

রানা ডাকলো, 'হাসান, দাঁড়াও!'

হাসান ফিরেও তাকালো না, যেন রানার ডাক শুনতেই পায়নি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কবীর চৌধুরী। হাত দিয়ে

এখনো চোখ ঢেকে আছে সে। 'দুঃখজনক, তাই না?' হাসলো সে। 'কিন্তু একেই বলে কঠিন বাস্তবতা, মেনে না নিয়ে উপায় নেই।'

'কিন্তু তারও চেয়ে দুঃখজনক, আসলে মানুষ যা বোনে তাই তোলে ক্ষেত থেকে,' বলে ঘুরলো রানা, বেরিয়ে এলো কামরা থেকে। রিভলভার হাতে পিছনে থাকলো জনি।

বারো

রানার পিছনে দরজা বন্ধ হতেই আলুথালু বেশে ছুটে এলো রোয়েনা। 'জো কোথায়? তাকে কেন আটকে রাখলো ওরা?'

'সলোমন ভালো আছে,' বললো রানা। 'জেটিতে গেছে ও।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রোয়েনা। 'কি বলছেন?'

রোয়েনাকে ধরে বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দিলো রানা। 'ওরা চলে যাচ্ছে, রোয়েনা। ওদের সাথে সলোমনও যাচ্ছে। বোট চালাবার জন্যে তাকে ওদের দরকার।'

'কিন্তু আমার কি হবে?' অস্থির হয়ে উঠলো রোয়েনা। 'আমাকে নিশ্চয়ই ও ফেলে যাবে না! বলেছে আমাকে নিয়ে যাবে?'

'তোমাকে তো আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছি, শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেয়ার কি মানে!'

সটান উঠে দাঁড়ালো রোয়েনা। 'ওরা ওকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না?' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো সে। 'এখন

তাহলে কি করা যায়, মিঃ নাহিদ? কিছু তো একটা করতেই হবে, তাই না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকলো রানা। ঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বেঞ্চে বসলো ও।

একটু পরই জনি আসবে। নাকি হাসানকে পাঠাবে কবীর চৌধুরী? হ্যাঁ, তাই বলেছে সে। কিংবা হাসান এবং জনি দু'জনেই আসবে। জানা কথা, ওদের খুন করতে আসবে ওরা। অথচ এই মুহূর্তে কিছুই ওর করার নেই। গোটা ব্যাপারটা হিম-শীতল দক্ষতার সাথে সারবে ওরা, কোথাও এক চুল ভুল করবে না। ব্রেন ওয়াশের পর হাসানকে আর সুস্থ মানুষ বলা যায় না, কবীর চৌধুরীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে। আর জনি তো বরাবরই একটা বিবেকহীন পশু, প্রফেশনাল খুনী। কিন্তু এ-সব কথা রোয়েনাকে বলার কোনো মানে হয় না।

বিশ মিনিট পর আওয়াজ। বোল্ট খোলার শব্দ। কবাট উন্মুক্ত হলো। দোরগোড়া থেকে অনেকটা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে হাসান। হাতের রিভলভার নেড়ে ওদেরকে বাইরে বেরুতে ইঙ্গিত করলো সে।

সামনে এগোলো রানা, সাথে সাথে ওর বুক লক্ষ্য করে রিভল-ভার তুললো হাসান। 'আমাকে তুমি চিনতে পারছো না, হাসান?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা। লক্ষ্য করলো, হাসানের চেহা-রায় কোনো ভাব নেই। পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্য স্থির করছে হাসান, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল,

আঙুলের ডগা সাদা হয়ে গেছে।

মাথার ওপর তাড়াতাড়ি হাত তুলে রানা বললো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, উত্তেজিত হয়ো না। কিন্তু আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো কিনা বলো। আমি মাসুদ রানা, রানা এজেন্সির মাসুদ ভাই, তোমার বস। মনে পড়ে, তোমার স্ত্রীকে ডেলিভারির সময় গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম? রক্ত পাওয়া যাচ্ছিলো না, আমি রক্ত দিয়েছিলাম?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো হাসান, কিন্তু চোখ বা চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না। ট্রিগারে তার আঙুলের দিকে চোখ রেখে মনে মনে প্রমাদ গুণলো রানা। যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে পারে গুলি।

'ঠিক আছে, চলো কোথায় যেতে হবে।'

পিছন থেকে রানার কাঁধ খামচে ধরলো রোয়েনা, ব্যথা পেলো রানা। 'এসব কি ঘটছে, মিঃ নাহিদ? ও আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?'

রিভলভার নেড়ে আবার ওদেরকে কামরা থেকে বেরুবার ইঙ্গিত করলো হাসান।

'জানি না,' বললো রানা। 'এসো, দেখা যাক কি হয়।'

বেসমেন্ট থেকে ওপরে উঠে এলো ওরা। ওদের বেশ খানিকটা পিছনে থাকলো হাসান। রানার মনে হলো সব কিছু যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘটতে দেখছে ও। হাসান, ওর প্রিয় সহকারীদের একজন, ওকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না, কিন্তু বাস্তব সত্য। যাকে বাঁচাতে এতো কষ্ট করে এতদূর এসেছে,

তারই হাতে খুন হতে হবে ওকে!

'তুমি জানো, তোমাকে রেখেই ওরা চলে যাবে। না?' ঘাড় ফিরিয়ে হাসানকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

হাসান নির্লিপ্ত, যেন কানেও কিছু শোনে না সে।

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। এখনো গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। লন পেরোলো ওরা। সার সার পাইন গাছ আর ঝোপগুলো কেমন স্থির, যেন শোকে মুহ্যমান। বৃষ্টি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। দূর থেকে ভেসে আসা সাগ-রের গর্জন ভোঁতা লাগছে কানে। জঙ্গলে ঢুকলো ওরা। নিচে নেমে আসা শাখা-প্রশাখা এড়িয়ে এগোলো ছোট্ট দলটা। এক-জন মারবে, দু'জন মরবে।

রোয়েনা ফোঁপাচ্ছে। বারবার হোঁচট খেলো সে। কপালে কি আছে টের পেয়ে গেছে। সান্ত্বনা দেয়ার ইচ্ছে জাগলো মনে, কিন্তু উৎসাহ পেলো না রানা। তার পিছনে রয়েছে ও। সবশেষে হাসান, হাতে রিভলভার রানার পিঠের দিকে ধরা।

মোটা একটা ডাল ধরে সরালো রোয়েনা, ভিজে ঘাসে সাব-ধানে পা ফেলে এগোলো। ডালটা ধরে ফেললো রানা, এক সেকেণ্ড ধরে রাখলো, তারপরই নিচু হলো। সপাং করে ছুটে গিয়ে হাসানের বুকে আঘাত করলো ডালটা। চোখের পলকে ধরাশায়ী হলো সে, আহত পশুর মতো দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে। দেখার জন্যে থামেনি রানা, রোয়েনাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে ঢালের ওপর ফেলে দিলো ও। দেখলো, গড়াতে শুরু করেছে রোয়েনা। তারপর ঝেড়ে দৌড় দিলো

সামনের দিকে।

গর্জে উঠলো রিভলভার রানার পাশের একটা গাছের ছাল ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। পরবর্তী বুলেট দুটো মাথার ওপরের একজোড়া শাখা চিরে বেরিয়ে গেল। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রানা, আরেকটা বুলেট চোখে মুখে কাদা ছিটিয়ে দিলো। গড়ান দিয়ে চিৎ হলো ও, হাতের সেলাই কেটে যাওয়ায় তীব্র ব্যথায় অন্ধকার দেখলো চোখে। গুড়িয়ে উঠলো।

টলতে টলতে উঠলো রানা, ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে বাঁ হাতের ক্ষতটা। গোটা বাঁ হাতের আস্তিন লাল হয়ে উঠেছে তাজা রক্তে। ঝোপ ভেদ করে ছোটো একটা ডোবার কিনারায় বেরিয়ে এলো ও। ঝর্ণা থেকে নেমে এসে একটা বড়গর্তে জমেছে কাঁচের মতো স্বচ্ছ পানি।

আরো দুটো গুলির আওয়াজ হলো, কানের কাছে মৌমাছির গুঞ্জন শুনলো রানা। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে পানিতে পড়লো ও।

পানি থেকে মাথা তুললো রানা। ঝোপ বিস্ফারিত হলো, ডোবার কিনারায় বেরিয়ে এলো হাসান। হাঁপাচ্ছে সে, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। রানাকে ডোবায় দেখে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করলো সে। রিভলভার ধরা হাতটা তুললো, লক্ষ্য স্থির করলো সাবধানে, প্রচুর সময় নিয়ে।

গুলি করলো হাসান। খালি চেম্বারে আঘাত করলো হ্যামার, ক্লিক করে আওয়াজ হলো। রানার দিকে তাকিয়ে থেকেই রিভলভার পকেটে ভরলো হাসান, কোমর থেকে বের করলো একটা ছুরি। হাতটা তুললো সে, ক্লিক করে বেরিয়ে এলো

ফলাটা। ধীরে ধীরে পানিতে নামলো হাসান। রানার দিকে এগোলো।

ডোবার তলা থেকে একটা পাথর তুললো রানা। মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে দিলো হাসানের দিকে। আধ সের ওজনের পাথর, সবেগে ছুটে গিয়ে হাসানের বুকে লাগলো। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো হাসান। টলতে টলতে পিছু হটলো সে, ছুরিটা হাত থেকে পড়ে গেছে।

এক কি দেড় গজ দূরে পানিতে পড়েছে ছুরিটা। স্বচ্ছ পানি, পরিষ্কার দেখা গেল। পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে ডিগবাজি খেয়ে ওটার দিকে হাত বাড়ালো রানা। ছুরির হাতলটা মুঠোয় পেয়ে আবার এক পাক ঘুরতে শুরু করলো, এই সময় হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়লো হাসান। ঘ্যাঁচ করে তার পেটে ঢুকে গেল ধারালো ফলা।

ধীরে ধীরে সিধে হলো হাসান, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। ছুরিটা কোমরে গুঁজলো রানা, এগিয়ে গেল একটু, যেন হাসানকে সাহায্য করতে চায়। দুম করে তার কানের নিচে একটা ঘুসি মারলো ও, ঝপাৎ করে পানিতে পড়লো হাসান।

পানি থেকে অজ্ঞান দেহটা ডাঙায় তুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করলো রানা। ফড় ফড় করে হাসানের শার্ট ছিঁড়ে বেঁধে ফেললো গর্তটা, বন্ধ হয়ে গেল রক্ত। ক্ষতটা খুব গভীর না হলেও, চিকিৎসা পেতে দেরি হলে হাসানকে বাঁচানো কঠিন হবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে অসহায় বোধ করলো রানা।

রোয়েনাকে কোথাও দেখা গেল না। তাগাতা ডান কাঁধে হাসানকে তুলে নিলো ও। বাঁ হাতটা কোনো কাজে আসছে না, একটু ঝাঁকি লাগলেই মনে হচ্ছে নতুন করে আগুন জ্বলে উঠছে।

জঙ্গলের প্রায় কিনারায় চলে এসেছে রানা, একটা ঝোপের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতে দেখলো রোয়েনাকে। কাদা-পানি লেগে ভূতের মতো চেহারা হয়েছে তার। রানাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো সে। 'হায় হায়! মিঃ নাহিদ, ওঁকে আপনি আবার কাঁধে করে বয়ে আনছেন কেন?'

'আমার ভাই,' বললো রানা। 'ব্রেন ওয়াশ করে কাউন্ট ওর সর্বনাশ করেছে। চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলালো রোয়েনা। রানার হাত ধরে ঝাঁকি দিলো সে, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো রানা।

'তাড়াতাড়ি, মিঃ নাহিদ, তাড়াতাড়ি! বোঝাটা নামান। জেটিতে পৌঁছুতে হলে···।'

রোয়েনার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। 'জেটিতে? কেন?'

'ওরা চলে যাচ্ছে যে! আপনিই তো বললেন জো-কে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদের বাধা দিতে হবে না?'

ডান হাত দিয়ে রোয়েনার কাঁধ ছুঁলো রানা। 'সলোমন স্বেচ্ছায় যাচ্ছে, রোয়েনা। কাউন্টকে সে পর্তুগালে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। বিনিময়ে স্বাধীনতা আর ডায়মণ্ডের অর্ধেকই নয়, চাইলে চাকরিও পাবে।'

হেসে উঠলো রোয়েনা—এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলো রানা। 'কি বলছেন! ও তো নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যায়নি। আমাকে ফেলে যেতেই পারে না ও!'

'বোকার স্বর্গে বাস করছো তুমি, রোয়েনা,' কঠিন স্বরে বললো রানা। 'সলোমন জানে এখানে আমাদের খুন করা হবে। সব জেনেশুনেই চলে যাচ্ছে ও। তার জীবনে তোমার কোনো জায়গা ছিলো না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই সহজ সত্যটা বুঝতে পারছো না কেন?'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন!' চেহারায় মরিয়া একটা ভাব নিয়ে বললো রোয়েনা। 'আমি আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।' কাঁধ থেকে রানার হাতটা ঝাপটা দিয়ে ফেলে দিলো সে। 'যেতে দিন আমাকে। আপনি না পারেন, আমি ওকে সাহায্য করবো।'

'পৃথিবীর কোনো লোক তো সলোমনকে আর সাহায্য করতে পারবে না এখন।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল রোয়েনা। রানার গলায় এমন কিছু একটা রয়েছে, স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে সে। চোখের সামনে হাত-ঘড়িটা তুললো রানা।

'লিমপেট মাইন, রোয়েনা। আমি মিথ্যে বলেছিলাম, ওটাকে নিউট্রাল করিনি। ম্যাক্সিমাম টাইমে সেট করেছি—বারো ঘণ্টায়। ওটার কথা মনে রেখেই এতোক্ষণ এতো কিছু সহ্য করার শক্তি পেয়েছি আমি।'

ধীরে ধীরে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রোয়েনা। তার

চেহারায় রাজ্যের আতংক ফুটে উঠলো। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। দু'হাত দিয়ে রানার পাঁজরে ধাক্কা দিলো সে, কাঁধে হাসানকে নিয়ে দড়াম করে ভিজে ঘাসের ওপর পড়ে গেল রানা। ঘুড়ে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটলো রোয়েনা।

কয়েক সেকেণ্ড নড়ার শক্তি পেলো না রানা। চোখ মেলার পর মনে হলো, কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর জ্ঞান ছিলো না। উঠে বসে হাসানকে পরীক্ষা করলো ও। পালস মোটামুটি স্বাভাবিক। বাঁধনটা আবার শক্ত করে বাঁধার পর নতুন করে রক্ত পড়াও বন্ধ হলো।

দাঁড়ালো রানা, মনে হলো টলে পড়ে যাবে। হাঁটতে গিয়ে দেখলো, খোঁড়াচ্ছে। ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে, মাটিতে পা ফেললেই স্যাঁৎ করে পাঁজর পর্যন্ত উঠে আসছে ব্যথা।

আশ্চর্য, তবু ছুটতে লাগলো রানা। মুখ বিকৃত হয়ে আছে, ব্যথায় পানি বেরিয়ে আসছে চোখ ফেটে, খোঁড়াচ্ছে, গোঙাচ্ছে।

ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। তবে কুয়াশা আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেছে। বাড়ির উল্টো দিকের ঢাল বেয়ে গর্তের মাথায় উঠে এলো রানা। দূরে দেখা গেল ক্ষুদে হারবার। জেটির সাথে এখনো বাঁধা রয়েছে বোটটা।

গোল্ডেন স্যানের বো-তে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবীর চৌধুরী, পাশে সলোমন। এক দুই করে গুণলো রানা—ছ'টা ড্রাম। সবগুলোকে এক করে মোটা রশি দিয়ে বাঁধছে জনি, মুখে সেই অর্থহীন হাসি।

পাহাড় থেকে অর্ধেক পথ নেমে গেছে রোয়েনা। এখনো প্রাণপণে ছুটছে সে, জীবনে বোধহয় এতো জোরে আর কখনো ছোটেনি। মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় নেই, কারণ ওর নাগাল পাবে না রানা। তবু দাঁতে দাঁত চেপে ঢালু পথ বেয়ে নামতে শুরু করলো ও।

সলোমনের নাম ধরে একবার ডাকলো রোয়েনা। পরিষ্কার, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। বোট থেকে তিনজনই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। পথের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল রোয়েনা। চিৎকার করছে, হাত নাড়ছে, ছুটছে। ল্যুগার তুললো সলোমন, তাক করলো ওর দিকে।

জেটিতে পা দিলো রোয়েনা। ঠিক এমনি সময় বিকট আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো গোল্ডেন সান। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বজ্রপাতের মতো ফিরে এলো প্রতিধ্বনিগুলো। এক সেকেণ্ড পর টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে উঠলো আগুন, পেট্রল ড্রামগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। আগুনের শিখায় ভর করে ধীরগতি ছবির মতো আকাশের দিকে উঠে গেল খোলের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ।

মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে উড়ে গেল আগুন ধরা আবর্জনা, মাথা নিচু করে আত্মরক্ষা করলো রানা। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলো ও।

'রোয়েনা!' চিৎকার করলো রানা। 'রোয়েনা, তুমি কোথায়?'

কোনো সাড়া এলো না। লেলিহান আগুনের শিখা চড়চড়

করছে, কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে জেটি। তেলের পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। তিনজনকে নিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে গোল্ডেন সান। ইস্পাতের কিছু অংশ, আর সুপার-স্ট্রাকচার বাঁকা হয়ে কিম্ভুতকিমাকার চেহারা পেয়েছে। শুধু ওগুলো দেখেই বোঝা যায়, একটু আগে ওখানে একটা বোট ছিলো।

তবে রোয়েনা আছে। জেটির মাঝামাঝি জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বেচারি। আশ্চর্য, আঁচড়ের একটা দাগ পর্যন্ত লাগেনি তার গায়ে কোথাও। শুধু হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা গুলির ফুটো।

রোয়েনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে। পালস নেই। তার বুকে মাথা রাখলো রানা।

হার্ট চলছে না।

'বোকা মেয়ে!' বিড়বিড় করে বললো রানা। ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের কাছ থেকে পানি মুছলো সে।

রোয়েনার লাশের পাশেই বসে রইলো রানা।

রোয়েনার জন্যে সব শেষ হয়ে গেছে। তার কাউকে ভালো-বাসতে হবে না। কারো ওপর নির্ভর করতে হবে না। কারো আশ্রয় পাবারও দরকার নেই তার। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গেছে সে। ওর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু রানার কাজ ফুরোয়নি।

যে-কোনো মুহূর্তে রয়্যাল নেভির এম. টি. বি. এসে পড়বে। প্রথম কাজ স্ট্রেচারে করে হাসানকে তাতে তোলা। যতো তাড়া-তাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ওকে।

এক এক করে আরো কাজের কথা মনে পড়লো রানার। রোয়েনাকে কবর দিতে হবে। ফ্রাইডেথর্পের প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকারের কথা বলতে হবে বি. এস. এস. চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেডকে। ঢাকা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে হবে—কবীর চৌধুরী মারা গেছে।

এবার আর কোনো সন্দেহ নেই, মরে গিয়ে সবাইকে বাঁচিয়েছে লোকটা।

দূরে কোথাও থেকে ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এলো। চারপাশে তাকালো রানা।

এম. টি. বি.-র ক্যাপটেন জেটিতে পা দিয়ে রানাকে ওখানেই দেখতে পেলো। রোয়েনার একটা হাত ধরে বসে আছে চুপচাপ। চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি।